বন্ধনহীন-গ্রন্থি

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

দেবশ্রী সাহিত্য-সমিধ
৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা।
শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়

দেবশ্রী সাহিত্য-সমিধ
৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা।

অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৫৩

দাম তিন টাকা

স্নেহময়ী মাতা—

শ্রীযুক্তা সুকুমারী দেবীর

শ্রীচরণে

শান্তি

বাঙ্গালীর গর্ব্বের বস্তু তাহার সাহিত্য—সে সাহিত্য শিল্প-সুষমায় অনুপম, মানবতার আদর্শে উজ্জ্বল এবং জাতীয়তার উদ্দীপনায় গৌরবান্বিত। বাঙ্গালী তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে শতদলের মত বিকশিত করেছেন কিন্তু বিলসিত হন নি—কারণ বাঙ্গালী সাহিত্য-সাধক তাঁর সাধনাকে গ্রহণ করেছেন ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের অনিবার্য্য উপকরণ রূপে। তাই আজ বাংলার তরুণ সাহিত্যের মধ্যে যে সুর, যে মূর্চ্ছনা অবিরত অনুরণিত হচ্ছে, তার আশ্বাস-বাণী শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতের জাগরণগান।

দেবশ্রী সাহিত্য-সমিধ থেকে প্রকাশিত প্রত্যেকখানি পুস্তক জাতীয় চেতনাকে ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়—এই আশীর্ব্বাদ পাঠক সাধারণের কাছে প্রার্থনা করে উদীয়মান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শান্তিকুমার দাশগুপ্তের এই 'বন্ধনহীন-গ্রন্থি' প্রকাশিত হোল,—বাংলার সুধী পাঠকের শুভদৃষ্টি এর উপর পতিত হোক।

বিনীত

প্রকাশক

দেবশ্রী সাহিত্য-সমিধ

প্রচ্ছদপট—শিল্পী শ্রীপ্রভাত কর্ম্মকার কর্ত্তৃক অঙ্কিত। বন্ধনহীন-গ্রন্থির রূপায়নে এই শক্তিমান শিল্পী যে বিচিত্র পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন—তার রসবোধ, আশাকরি গুণী-জনের প্রীতিবর্দ্ধক হবে; সর্ব্ববন্ধন বিমুক্ত একটী নারীর ভাবব্যঞ্জনায় শিল্পী কতখানি কৃতকার্য্য হয়েছেন—শিল্প-রসিক তার বিচার করবেন।

প্রকাশক

বন্ধনহীন-গ্রন্থি

পশ্চিমের একটি ছোট ষ্টেশনে সতীশ নামিয়া পড়িল। সাহিত্য জগতের সে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং ভবিষ্যৎ যে তাহার জন্য আরও উজ্জ্বল হইয়া আছে, তাহাও অবধারিত সত্যরূপেই সবাই জানিত। তাহার চেহারা ছিল ছিপছিপে লম্বা ধরণের, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু কোন কিছু গ্রাহ্য না করিয়া সে কলম আর কাগজ লইয়া সময় কাটাইয়া দিত।

বন্ধুরা বাধা দিতে আসিলে বলিত, এই লেখাই যে আমি ভালবাসি, চোখ যদি যায়-ই ত' যা ভালবাসি তার জন্যই যাক্। হাসিয়া কথা বলিলেও বন্ধুদের তাহারই মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া যাইত।

এমনি সময় একদিন সকলের অজ্ঞাতে পশ্চিমের একটি শহরের একান্তে টিকিয়া থাকা ষ্টেশনে আসিয়া সে নামিয়া পড়িল।

বাংলো তাহার ঠিক করাই ছিল। সে শুধু একাই থাকিবে সেখানে, দূরের পাহাড়ের দিকে চাহিয়া আশা মিটিবে না, কাগজের উপর কলম চালাইতে চালাইতেই তাহার সময় কাটিয়া যাইবে, আর সর্ব্বাপেক্ষা মজা হইবে রান্নার সময়। কি দিয়া যে কি রাঁধিবে এবং আহারে বসিয়া মুখের অবস্থা যে কেমন হইয়া উঠিবে তাহা ভাবিতেই তাহার মন খুসিতে ভরিয়া ওঠে। সকল সময়ের সঙ্গী রান্না করিতে ওস্তাদ পুরাতন ভৃত্য রামহরিকেও আজ সে বাদ দিয়া আসিয়াছে। নিজেকে লইয়াই সে কাটাইয়া দেখিতে চায় কেমন করিয়া দিন চলে।

স্যুটকেশ আর বিছানাটা নামাইতেই ঝমঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। কি-ই-বা করিবে সে? এই অন্ধকারে বিশেষ করিয়া এই অজানা দেশে কাহারও সাহায্য ব্যতীত তাহার বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করা প্রায় অসম্ভব ত' ছিলই এখন সে প্রায়েরও বিশেষ কিছু আশা রহিল কিনা তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। ছোট ষ্টেশনের একপাশে ছাউনির মধ্যে কতকগুলি কুকুরের সঙ্গেই স্থান ভাগ করিয়া তাহাকে কোন মতে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে হইল। ঘরটি অন্ধকার, হয়ত বা পূর্বে আলো জ্বলিতেছিল বাতাসে নিভিয়া গিয়াছে এবং নিভিয়া যখন গিয়াছেই তখন জ্বালাইবার আর প্রয়োজনও কেহ বোধ করে নাই। অন্ধকারে সভয়ে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দড়ির মত এক প্রকার চলন্ত জীবের কথা মনে হইতেই সে শিহরিয়া উঠিল। টর্চ একটা সঙ্গে আনিয়াছে বটে, কিন্তু সেও স্যুটকেশের কোন্ একধারে পড়িয়া আছে, বাহির করিতে হইলে সমস্ত কিছুই নামাইতে হইবে মনে হওয়ায় সে চুপ করিয়াই রহিল।

অকস্মাৎ অন্ধকার যেন কথা কহিয়া উঠিল, একটা আলো নিয়ে এলে না কেন? কতক্ষণ বসে আছি বলত'।

একলাফে সতীশ ঘরের বাহিরে আসিয়া হাজির হইল; কিন্তু বাহিরেও কিছু চোখে পড়ে না, হয়ত' সমস্ত আলোই নিভিয়া গিয়াছে, হয়ত' মাষ্টার মহাশয় দুর্যোগ দেখিয়া কাজ-কর্ম্ম বন্ধ করিয়া নিজের বাসায় ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীকে নিশ্চিন্ত করিয়া পুত্র-কন্যাদের ভরসা দিতেছেন। হয়ত বা জানাইতেছেন অতীত জীবনের আরও বড় বড় ঝড়ের কথা; কিন্তু সতীশের তাহাতে কি আসে যায়! ঘর ও বাহির একাকার হইয়া গিয়াছে দেখিয়াই যেন সে তাহার লুপ্ত সাহস ফিরিয়া পাইল। ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, কে কথা কইলেন? ভয় নেই, কি বলছিলেন বলুন!

সমস্ত শব্দই যেন নিঃশেষে মরিয়া গিয়াছে, কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না। ও অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, সাড়া দিন, আমার নিজের খুবই দরকার। এখানকারই কোন লোক এখানে আছেন কিনা তাই আমি জানতে চাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবার শব্দ শোনা গেল, কে যেন ধীরে ধীরে বলিল, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

সতীশ চমকিয়া উঠিল, ইহা যে বাঙালী মেয়ের গলা তাহা বুঝিতে তাহার মুহূর্ত্তমাত্রও দেরী হইল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল, আপনি বাঙালী এবং মহিলা তা বেশ বুঝতে পারছি; কিন্তু এখানে এই অন্ধকারে কেন সেইটেই বুঝতে পরছিনে।

নিকটেই অনেক লোকের গলা শুনিতে পাওয়া গেল, বোধ হয় কাহারা ষ্টেশনে আসিতেছে। এই অন্ধকার ঘরের দুইটি মানুষের বুকেই আশার স্পন্দন খেলিয়া গেল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, কতক্ষণ বসে আছেন আপনি?

জবাব আসিল, তা কয়েক ঘণ্টা হবে।

'একা কেন?' সতীশ প্রশ্ন করিল।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মেয়েটি জবাব দিল উনি বেরিয়ে গেছেন কিন্তু এখনও যে ফিরলেন না কেন তাই বুঝতে পারছিনে।

গরুর গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। কাহারা যেন ষ্টেশনে আসিয়াছে। মুখ বাড়াইয়া সতীশ দেখিতে পাইল কয়েকটি লোক তিন চারিটা লণ্ঠন এবং একটা গরুর গাড়ী লইয়া আসিয়াছে—এই ঝড়-জলে কাহার যে কি প্রয়োজন হইতে পারে তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও মনে মনে সে আশান্বিত হইয়া উঠিল।

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

লোকগুলি এই অন্ধকার ঘরের মধ্যেই আসিয়া হাজির হইল। মেয়েটির মুখে আলো পড়ায় সতীশ সেই দিকে চাহিয়া দেখিল, সাহিত্য লইয়াই তাহার দিন কাটিয়াছে অনুভূতি তাহার কম নয়; কিন্তু সে মুখ দেখিয়া এই প্রথম সে বুঝিল যে নারীর রূপ শুধু মানুষকে মুগ্ধই করে না, অবশ করিয়াও দেয়, এবং সেই রূপের মধ্যে, চোখের দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে যাহা মানুষের মন কেবলমাত্র মানুষটিকে ছাড়াইয়া আরও বহু দূরে লইয়া যায়।

আগন্তুকরা অশিক্ষিত গেঁয়ো লোক, তাহারা ইঁহাদের সম্বন্ধে সহজ ধারণাই করিয়া লইল। একজন বলিল কাঁহা যায়েগা বাবু? বর্ষা ত' বহুত মুস্কিল কিয়া।

উহাদের মনের ভাব সতীশ চক্ষের নিমিষে বুঝিয়া লইয়া বলিল, তোমাদের সঙ্গে ত' গাড়ী আছে, আমাদের পৌঁছে দিয়ে একটু উপকার কর না বাপু।

অপর একজন উত্তর করিল, ও বাত ত' ঠিকই হায় বাবু, গাঁ-পর যায়কে আউর একঠো গাড়ী ভেজ দেঙ্গে। হামলোক দোস্‌রা এক বাবুকো বাস্তে আয়া হায়।

মিনিট কয়েক পরেই একটি ট্রেন আসিয়া থামিল। লোকগুলি ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল, কিন্তু কেহই নামিল না দেখিয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া প্রথম ব্যক্তি বলিল, উ বাবু ত' নেহি আয়া, আপহি আইয়ে।

মেয়েটি সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন বলিতে গেল। সতীশ কিন্তু এ সুযোগ ছাড়িতে রাজী ছিল না, সে ইঙ্গিতে মেয়েটিকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিল।

সমস্ত মালপত্র গাড়ীতে তুলিয়া একটা লণ্ঠন সতীশের হাতে দিয়া একজন বলিল, দেখকে আইয়ে বাবু নেহিত' গীর পড়েঙ্গে।

মেয়েটিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া সতীশ এইবার চিন্তিত হইয়া পড়িল, বৃষ্টি তখনও থামে নাই, অথচ গাড়ীর ওই স্বল্প পরিসর স্থানে সে-ই বা কেমন করিয়া যায়! শেষ পর্য্যন্ত আর কোন উপায় না দেখিয়া সে হাঁটিতেই আরম্ভ করিল।

লোকগুলি যে যাহার টোকা মাথায় দিয়া বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিল। সতীশকে লক্ষ্য করিয়া একজন বলিল, গাড়ীপর চড়িযে বাবু নেহি ত' ভিজ যাযেগা, আউর বেমারী ভি হো শেক্তা। রাস্তা ভি আচ্ছি নেহি হায, মাজীকো ডর লাগেগা। সতীশ চম্‌কাইযা উঠিয়া গাড়ীর ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; কিন্তু অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেল না। শাদা কাপড়ে আবৃত নারী মূর্ত্তিটিকে একদিকে সরিযা যাইতে দেখা গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা বলিল না এবং আরও খানিকক্ষণ পরে সুমিষ্ট নারীকণ্ঠ ভাসিযা আসিল, মিছি মিছি ভিজে লাভ কি, ভেতরে যথেষ্ট যায়গা আছে।

আর কোন কথার প্রয়োজন ছিল না। সতীশের সমস্ত কিছুই ভিজিযা গিয়াছিল, আর বেশী ভিজিবার ভরসা তাহার ছিল না, বিশেষত বৃষ্টির জল পড়িয়া তাহার চশমাকে সম্পূর্ণ অকেজো করিয়া দেওযায সে রীতি মত ভীত হইযাই উঠিযাছিল। শরীর তাহার মোটেই ভাল বলিযা মনে হইতেছিল না। প্রথম হইতেই যে বিপদ সুরু হইয়াছে, তাহা ক্রমে বিরাট হইয়া দেখা দিবে বলিযাই তাহার কানে কে যেন বারংবার ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিতেছিল। আর কোন কথাই না বলিযা সে গাড়ীতে উঠিযা বসিল।

গাড়োযানকে বাড়ীর কথা বলা হইযাছে, সে চেনে, অতএব সেদিক হইতে আর কোন ভয় নাই। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে সতীশের চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিযা উঠিল—স্পষ্টই সে বুঝিতে

পারিল বসিয়া থাকা হয়ত' তাহার আর হইয়া উঠিবে না। প্রাণপণ চেষ্টায় খানিকক্ষণ পরে সে যেন স্বপ্নে দেখিতে পাইল কে যেন তাহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছে। এমনি যত্ন এমনি স্নেহ সে যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল, অত্যন্ত তৃপ্তিতে সে আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িল।

কোথা দিয়া এবং কেমন করিয়া কয়েকটা দিন যে কাটিয়া গেল তাহা সতীশ জানিতেও পারিল না। দুইটি সেবা পরায়ণ হস্ত যে নিরন্তর তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহা টের না পাইলেও অচেতন অবস্থায়ও সে বেশ নিশ্চিন্ত এবং শান্ত হইয়াই ছিল।

সেদিন গভীর রাত্রে চেতনা ফিরিয়া পাইয়া মিটমিটে লণ্ঠনের আলতেও সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল কে যেন তাহারই বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে এবং তাহারই মাথার লম্বা কয়েকগাছা চুল তাহার মুখের উপর পড়িয়া যেন কোন মায়ারাজ্যের সুমধুর গন্ধ বহিয়া আনিয়া সমস্ত দেহ মন অবশ করিয়া দিতেছে। ধীরে ধীরে একটা হাত তুলিয়া কয়েকগাছা চুল সে হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল, একবার ইচ্ছা হইল সযত্নে তাহাকে চেয়ার হইতে তুলিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেয়; কিন্তু পারিল না। পাশ ফিরিয়া তাহার চুলের মধ্যে মুখ রাখিয়া সে স্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিল।

আরও কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। বারান্দায় সতীশেরই কাছে আর একটা চেয়ারে সেই মেয়েটি বসিয়াছিল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, স্বামীর নাম ছাড়া আর কিছুই তুমি জান না?

অলকা মাথা নীচু করিয়া রহিল।

সতীশ বলিয়া চলিল, তাঁর কে কে আছেন এবং কোথায় তাঁদের দেশ

তাও জাননা বুঝলাম—কিন্তু তোমার মামা মামীর খবর জান নিশ্চয়ই, তাঁরাই ত' বিয়ে দিয়েছেন ?

হ্যাঁ তাঁরাই আমাকে মানুষ করেছেন, আমার সবই করেছেন তাঁরা, আমার বিয়ে দিয়ে আমাদেরই সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন তাঁরা ভাগ্য খুঁজে নিতে। অবস্থা তাঁদের ভাল নয়, তাই সেই ভাঙ্গা ঘর আর তাঁদের বেঁধে রাখতে পারে নি। চোখের জল চেপে আমার মাথায় হাত রেখে মামা বলেছিলেন, যদি কোন দিনও দাঁড়াতে পারি তবেই খবর দেব। তাই তাঁদের খবর আর আমার জানা নেই। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অলকা নিজেকে সংযত করিল। দুর্ভাগ্য তাহার চিরসঙ্গী, তাই আজও সে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই।

'তারপর ?'

সম্মুখ দিকে উদার দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অলকা বলিল, দেশে উনি যেতে চাইলেন না, টিকিট কেটে গম্ভীর মুখে বসে রইলেন তারপর হঠাৎ নামতে ব'ললেন এখানে। নেমে পড়লাম, আমাকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়তে চাইলেন গাঁয়ের উদ্দেশ্যে—ভয় হ'ল কিন্তু উপায় নেই দেখে গয়নার বাক্সটা তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, 'এটা কাছে রাখবার সাহস আমার নেই'। আমার মুখের দিকে চেয়ে কি ভেবে সেটা হাতে করে নিয়ে গেলেন ; কিন্তু আর ফিরলেন না। তারপর আর কিছুই নেই।'—

'কিন্তু তারপর আর কিছু নেই বলেই ত' যত গোলমাল, যত ভয়। এবার কি করা যায় সেইটেই ত' ভাববার বিষয়। সতীশ উত্তরের আশায় অলকার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

আর কোন কথাই হইল না, একটা অত্যাশ্চর্য্য নিস্তব্ধতা যেন তাহার গভীরতা প্রচার করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কাহারও মুখে কথা নাই—

প্রকৃতি দেবীই যেন সব। দূরের নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া কোন আশাই পাওয়া যায় না, অথচ না চাহিয়াও উপায় নাই। অলকার মনে হইল, এই যে লোকটি তাহার পাশে বসিয়া আছে তাহাকেও ওই দূরের নক্ষত্রের সহিত তুলনা করা যায় হয়ত'। দেখিলে আশা হয় অথচ ভরসা করিবার কিছুই নাই। একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া সে উঠিয়া গেল।

অলকা বাহির হইতে চায় না। সকাল, সন্ধ্যা, সতীশ ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারই মত কলিকাতার সহস্র সুবিধা হইতে ছিট্‌কাইয়া আসা দুই চারিটি ভদ্র পরিবারের সহিত তাহার আলাপ হয়। হাতের কাছে সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল রত্নটিকে দেখিয়া কেহই অন্যদিকে মুখ ফিরাইতে পারে না। সতীশ ইহারই ফাঁকে ফাঁকে অলকার স্বামীর খোঁজ করিতে ছাড়ে না। কিন্তু তাহার কোন সংবাদই জানা যায় না। সতীশের দৃঢ় বিশ্বাস সেই লোকটি অলকাকে ফাঁকি দিয়াছে, তাহা না হইলে দেশে না লইয়া গিয়া এখানেই বা আসিবে কেন? হয়ত' গহনার বাক্সটি হাতে পাইয়া অলকাকে বসাইয়া রাখিয়াই অন্য দিক দিয়া সেই ট্রেনেই সরিয়া পড়িয়াছে। ইহা অসম্ভব নয়, কিন্তু কি করিয়া যে মানুষ ইহাকেই সম্ভব করিয়া তোলে তাহা ভাবিতেও তাহার মাথা ঘুরিয়া ওঠে। ইহা তাহার বিশ্বাস হইলেও সন্ধান না করিয়া সে কিছুতেই পারে না।

আরও দিন সাতেক এমনি করিযাই কাটিয়া গেল। সাঁওতালদের কি একটা উৎসব উপলক্ষে আজ তাহাদের নাচ গান হইবে। জোর করিয়া অলকাকে লইয়া সতীশ আজ বাহির হইয়া পড়িল। উৎসবের মাঝে গিয়া অলকা নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইতে পারিবে মনে করিয়াই সতীশ খুশী হইয়া উঠিল।

নাচ সুরু হইয়া গিয়াছে। সাঁওতাল রমণীরা একে অন্যের হাত ধরিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে একবার আগাইয়া একবার পিছাইয়া, কথনও বা ডাইনে কথনও বা বাঁয়ে সরিয়া নাচের সঙ্গে সঙ্গেই গান গাহিতেছে। পুরুষেরা মহুয়ার রসে মাতিয়া মাদল লইয়া তালে তালে বাজাইয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিতেছে। ভীড়ের চাপে অলকা একেবারে সতীশের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া এই বিচিত্র নৃত্য উপভোগ করিতেছিল।

কে যেন হঠাৎ পাশে আসিয়া বলিল, কি সতীশ বাবু, আপনারা দু'জনেই যে এখানে আছেন তা' ত কই জানতাম না—সস্ত্রীক বেড়াতে আসা অবশ্য ভালই।

অলকা চম্‌কাইয়া উঠিল, তাহা টের পাইয়া মহা অপ্রস্তুত হইয়া সতীশ বলিল, না, না কি বলেন, এই নাচ দেখতে এসেছিলাম একটু। কিন্তু আর নয়, অন্য কাজও ত' আছে—চল অলকা বাড়ী যাই।

উপেনবাবু বলিলেন, কিন্তু এর মধ্যেই ফিরবেন ?

উপেনবাবুর স্ত্রী বলিলেন, উনি ত' আর তোমার মত উকীল নন যে এমনি বাজে জায়গায় সময় নষ্ট করবেন, তার চেয়ে বরং—। বলিয়াই হঠাৎ অলকার মুখ তুলিয়া ধরিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেন, লজ্জা কি বোন, স্বামীর কাছে লজ্জা ক'রলে চলে কি ? কাল কিন্তু তোমার ওখানে যাব, তোমার সংসার দেখে আসব আর দেখে আসব কেমন তুমি গোছাতে পার অগোছাল সাহিত্যককে—অতিথি যাবে মনে থাকে যেন।

অলকাকে লইয়া সতীশ ভীড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল। অনেক দূরে আসিয়াও কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না।

রাস্তার পাশের অন্ধকারের ভিতর হইতে একটা কাতর ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। তাহারা দু'জনেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। রাস্তার পাশে আবর্জ্জনার উপর একটি সাঁওতাল বৃদ্ধ অর্দ্ধ অচেতন

অবস্থায় শুইয়াছিল আর তাহারই মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া ছিল একটি বৃদ্ধা। মহুয়ার রসের মাহাত্ম্য—বুঝিতে সতীশের একটুও দেরী হইল না। আপনা আপনিই সে বলিয়া উঠিল, হতভাগ্য স্ত্রী, স্বামীকে ফেলে যাওয়াও অসম্ভব অথচ করেই বা কি? মাতাল—সতীশ নিজেই আগাইয়া গিয়া বৃদ্ধার হাতে দুইটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, যাও, গাড়ী ডেকে ওকে বাড়ী নিয়ে যাও।

সতীশ বসিয়া পড়িয়া বৃদ্ধের মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। তাহাকে দেখিয়া কেহই বিশ্বাস করিবে না যে এই সেই কলিকাতার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, অথচ পরের মনের দুঃখ দেখিয়া দুঃখ হয় বলিয়াই না সে রসের সন্ধান পাইয়াছে।

অলকা নিকটে আসিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বৃদ্ধ আস্তে আস্তে বলিল, কে-রে বুড়িয়া? তুই বাড়ী যানা, আজ আমি আর যেতে পারব না রে, কিছুতেই পারব না।

সতীশ বৃদ্ধকে ভাল করিয়া জাগাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, বুড়িয়া গাড়ী আনিতে গেছে বুড়ো, তুমি চুপ করে পড়ে থাক।

তাহারই মস্তক কোন বাবুর ক্রোড়ের উপর রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধ যেন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না।

সতীশ বলিল, না, উঠে তোমার কাজ নেই, কিন্তু এত বুড়ো বয়সেও অত রস খেলে কি চলে বুড়ো। বুড়িয়ার কষ্টটা একবার ভেবে দেখ দেখি।

হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া সে বলিল, কি করব বাবু, উপায়ই বা কি? আজ চারবছর আগে ঠিক এই উৎসবের দিনে মাদল বাজাতে এসেছিল ছেলেটা, একটা মেয়েকে সে খুব ভাল বাসত বাবু, সেও এসেছিল তার সঙ্গে। তারপর রস খেয়ে সবাই মিলে মাতামাতি সুরু করে দিল, আমাদের গাঁয়ের সবচেয়ে জোয়াল ছেলেটার সঙ্গে ছিল তার

রেষারেষি ওই মেয়েটাকে নিয়েই, কি করে জানি না বাবু হঠাৎ মারামারি সুরু হয়, রক্তে জায়গাটা লাল হয়ে যায়—ওই কালো চেহারার ভেতরেও লাল রক্তই থাকে বাবু তারপর আমার সুখন—। বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকে। তাহারই চোখের জলে সতীশের কাপড় ভিজিয়া যায়।

অনেকক্ষণ সবাই চুপ করিয়া রহিল। বৃদ্ধ আবার বলিল, তারপর প্রত্যেক উৎসবেই বুড়িয়া এখানে আস্‌তে চায়, জোর কমে গেলেও না এসে ত পারি না বাবু, ও লুটিয়ে কাঁদে, আমার কিন্তু বাবু চোখ জ্বালা করে, চারদিক লাল হয়ে যায়—ছেলের রক্ত যেন আমায় পাগল করে দেয়, খুব বেশী করে রস খেয়ে চুপ করেই থাকি। আজ তিন বৎসর এ দিনটিতে এমনি করেই আমি পড়ে থাকি, আর বুড়িয়া বসে থাকে আমার মাথা কোলে নিয়ে কিছুতেই ফেলে যেতে পারে না। ও ও পাগল হয়ে যাবে বাবু। বৃদ্ধ যেন কোন্ এক বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া যায়। অলকার অজ্ঞাতসারেই তাহার অন্তর মথিত করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল—সতীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল ; কিন্তু গাছের ছায়ায় অন্ধকার গভীরতর হওয়ায় সে কিছুই দেখিতে পাইল না।

বাড়ী ফিরিয়াই অলকা বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। বৃদ্ধের শেষ কথাটা যেন কেবলই তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। স্ত্রী স্বামীকে ফেলিয়া যাইতে পারে না ইহা যে স্বতঃসিদ্ধ সত্য তাহা সে ত' ছেলেবেলা হইতেই আপনা আপনি শিখিয়াছে। অথচ এ কোথায় পড়িয়া সে কাহার ঘর গুছাইয়া রাখিতেছে ? ওই যে লোকটা যে এতটুকু ইতস্তত না করিয়া বৃদ্ধের কাজে লাগিয়া গিয়াছিল, তাহার মন যে সত্যই বড় তাহা বুঝিতে পারিলেও তাহার নিজের সম্বন্ধে তাহাকে উদাসীন দেখিয়া সমস্ত মন তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তাহার

নিজের সম্বন্ধে ওই লোকটা যেন ইচ্ছা করিয়াই কোন কথা বলে না, হয়ত' নিজের সমস্তরকম সুবিধার জন্যই তাহাকে সে আটকাইয়া রাখিয়াছে।

কাছে আসিয়া সতীশ বলিল, চুপ ক'রে শুয়ে থাকলে ত' চ'লবে না অলকা, তোমার না পেলেও আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে—একটা কিছু ব্যবস্থা কর।

বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া তীব্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অলকা বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমাকে খেতে দিচ্ছেন কি সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেবার জন্যেই ? আমি পারব না, আমাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না আপনার। মিথ্যে ভদ্রতার মুখোস প'রে না থেকে নিজেকে স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরলেই ত' হয়। যা' ভেবেছেন তা' হবে না, কিছুতেই না।

অতি বিস্ময়ে সতীশ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

অলকা বলিয়া চলিল, আপনাকে বিশ্বাস ক'রে এসেছিলাম আপনার সঙ্গে, কিন্তু মানুষ যে এত শঠ হতে পারে তা' তখন জানতাম না। আজ অপমান করবার জন্যে আমাকে সঙ্গে নেবার কি দরকার ছিল ? কিন্তু মেয়েমানুষের এ যে কি সর্ব্বনাশ তা' বুঝবার শক্তি আপনার নেই।

অশ্রু আর বাধা মানিল না—সে আবার বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। সতীশ এতক্ষণ একটা কথাও বলিতে পারে নাই। কে যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল। এইবার আস্তে আস্তে সে বলিল, কিন্তু কে তোমার মনে এসব কথা এনে দিয়েছে ? আমি ত' তোমায় কোন অপমানই করিনি অলকা।

একবার কথা সুরু হইয়া গেলে আর তাহা থামে না।—সমস্ত বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়াই সে তখন আগাইয়া চলে।

আবার উঠিয়া বসিয়া অত্যন্ত কঠিনভাবে অলকা বলিল, কিন্তু আমার নাম ধ'রে ডাকবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে শুনি ? আপনার

মনের সমস্ত কিছুই স্পষ্ট হ'য়ে গেছে আমার কাছে—আপনার বন্ধুকে ব'লবেন কাল যেন তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসে না অপমানিত হন।

'সময় থাকলে তাই ক'রতাম, কিন্তু কাল খুব ভোরেই হয়ত' তাঁরা এসে প'ড়বেন। উপেনবাবুর কোন অপমানই হবে না আমার কাছে তবে তাঁর স্ত্রীর কথা—নিজের ইচ্ছায়ই তিনি যাঁর কাছে আসবেন তাঁর কাছ থেকেই তাঁর পাওনা নিয়ে যাবেন, আমি কোন কিছুই ব'লতে আসব না।—' সতীশ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা বিশ্রী রূপ ধরিয়া এইবার অলকাকে লজ্জিত করিয়া তুলিল। এক দিককার তীব্রতা আর এক দিককার শান্ত কথার কাছে যেন অত্যন্ত ছোট হইয়া গেল। সতীশের অভুক্ত মুখের কথা মনে করিয়া অলকা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

পরদিন খুব ভোরে উঠিয়াই সতীশ কাজে লাগিয়া গেল। আজ সে নিজেই সমস্ত ব্যবস্থা করিবে। যাহা করিবে মনে করিয়াই অকস্মাৎ সকলের অজ্ঞাতে তাহার এই বিদেশযাত্রা তাহাই যে কাহার মধুর স্পর্শ পাইয়া লোপ পাইতে বসিয়াছিল, যেন আজ নূতন করিয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল।—কিন্তু উনুন্ জিনিষটা যে এত বে-কায়দা ধরণের, শত চেষ্টায়ও যে সেটা জ্বলিতে চাহে না তাহা সে জানিত না, জানিবার প্রয়োজনও কোনদিন অনুভব করে নাই। কেবলমাত্র কয়লা, কেরোসিন এবং আগুন হইলেই যে তাহা জ্বলিতে আরম্ভ করে না তাহা আজ মিনিট পঁচিশেক ফু' এবং বাতাস দিয়াই সে বুঝিতে পারিল। চাকরটা আজ আসে নাই, কিন্তু না আসিয়া যে এতটুকুও ভাল করে নাই তাহা সে বেশ ভালরকমই টের পাইল। নিতান্ত হতাশ হইয়াই সে নূতন কোন বুদ্ধি বাহির করিবার জন্য সেখানেই বসিয়া পড়িল।

পিছন হইতে অলকা বলিয়া উঠিল, স'রে যান, আপনি সত্যি মানুষ নন, এত অপমান ক'রেও কি আশা আপনার মেটেনি? মিনিট দশেক হ'ল পেছনে এসে দাঁড়িয়েছি অথচ এক মুহূর্ত্তও পেছন ফিরে তাকাবার দরকার হ'ল না আপনার, আশ্চর্য্য! সরুন, চাকরটা আসেনি, জল তুলে নিয়ে আসুন বরং—ও কূয়ো থেকে জল আনা আমার সাধ্য নয়।

অবাক বিস্ময়ে সতীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিষ্টি একটু হাসি হাসিয়া অলকা বলিল, অবাক হ'য়ে গেলেন যে? আমি অলকা, ভূত নই। কিন্তু আবার ভূত ঘাড়ে চাপতেও ত' পারে, স'রে পড়ুন নইলে বিপদ হতে পারে।

উঠিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে সতীশ বলিল, বাঁচা গেল, এসব অসম্ভব কাজ যে সম্ভব হয় কেমন ক'রে তা এর আগে বুঝতামও না, আজ কিন্তু একটু আলো দেখতে পাচ্ছি—যারা নিজেরাই অসম্ভব, তাদের কাছে অসম্ভব কিছু থাকতে পারে কি?

তাহার গমন পথের দিকে অলকা চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল, অকস্মাৎ সমস্ত বুক তোলপাড় করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিতে চাহিল—সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল।

বাহিরের বারান্দায় চা-পান করিতে করিতে সতীশ অন্য মনস্ক হইয়া পড়িল। অলকা টের পাইয়া বলিল, কি ভাবছেন বলুন ত?

ম্লান হাসি হাসিয়া সতীশ বলিল, ভাবছি, অলকা, আমার ভবিষ্যৎ জীবনের দুঃখের কথা। আমার সাহিত্যের সেদিন কি হবে! কি হবে আমার বেঁচে থেকেই বা? অথচ মৃত্যু কত কঠিন।

অলকার সমস্ত মুখে কে যেন কালী বুলাইয়া দিল। বলিল, মৃত্যুর কথা থাক। ভবিষ্যৎ দুঃখের কথাই বা কেন?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সতীশ বলিল, ডাক্তারদের কি মত জান অলকা? আমাকে অন্ধ হতেই হবে, পৃথিবীর এতটুকু আলোও আর সেদিন আমার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে না—সমস্ত বৈচিত্র্যই এক নিমিষে যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে নিভে যাবে। জান, সেদিন মৃত্যু হবে আমার আরও লোভনীয়, আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। আচ্ছা অলকা, মরতে চাইলেই মরা যায় না কেন ব'লতে পার?

আর কিছুই অলকা শুনিতে চাহে না, সে চীৎকার করিয়া উঠিল, ভুল, সমস্ত ডাক্তারদেরই ভুল হয়েছে—অন্ধ হ'তে কিছুতেই পারবেন না আপনি।

একটা হাসির বিদ্যুৎ সতীশের মুখের উপর খেলিয়া গেল, সে বলিল, আমি তাই শুধু লিখিতে চাই, আমার সাহিত্যকে বড় ক'রে তুলতে চাই, ওরা কিন্তু বলে 'বেশী লিখলে অথবা প'ড়লে আরও তাড়াতাড়ি আমার চোখ হারাতে হবে।' হয়ই যদি ত' হ'ক, কি বল তুমি?

অলকা কোন কথাই বলিতে পারিল না। মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়াই সে বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সতীশ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, সামর্থ্য যেখানে আছে সেখানে ইচ্ছা থাকে না, আর ইচ্ছে থাকলে সামর্থ্যের অভাব কেন হয় ব'লতে পার? স্থষ্টির এ নিয়ম যে কেন তা' কেউ জানে কি?

অলকা তেমনিভাবেই পড়িয়া রহিল, কোন কিছু জবাব দিবার জন্ম মাথা তুলিবার শক্তিও যেন আর তাহার নাই।—

উপেনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী আসিয়া পড়িলেন।

মালতী দেবী বলিলেন, একেবারে চায়ের টেবিলে যে, আতিথ্যের ত্রুটি কিন্তু হ'তে দেবনা বোন্।

উপেনবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, হ্যাঁ, ওই জন্যে চা-ও পাইনি আজ। সবই নাকি এখানে মিলবে। আমার অদৃষ্ট মন্দ বুঝলেন বৌদি, নিজের বাড়ীতে লক্ষ্মী থাকলে কি আর পরের বাড়ীতে ছুটতে হয়? কথাটা বলিয়াই তিনি স্ত্রীর মুখের দিকে পলকের জন্য চাহিয়াই মুখের এমন একটা ভঙ্গী করিলেন যে সতীশ পর্য্যন্ত সহজ সুন্দরভাবে হাসিয়া উঠিল।

অলকা চা ঢালিয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া দিল।

হাসিয়া মালতী দেবী বলিলেন, কাল এই নিয়েই ঝগড়া হ'য়ে গেছে। বললাম ওখানে গিয়েই চা খাবে, সকালটা আমার ছুটী—কিন্তু তা' হবে না এ হাতের চা না খেলে—।

মালতী দেবী হাসিয়া উঠিলেন, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

এতটুকু অপ্রস্তুত না হইয়া উপেনবাবু বলিলেন, ঠিকই ত' দু'বার চা খেতে আর আপত্তি কি? আর ওই সতীশ ভায়াকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না ওই সুন্দর হাতের চা না খেয়ে কোন কাজেই তার মন বসে কি না, বসতেই পারে না যে—তার সাহিত্যও অসম্ভব তা-ও আমি জোর ক'রেই বলতে পারি।

অলকার সমস্ত মুখ লাল হইয়া উঠিল। কেমন করিয়া যে এতবড় মিথ্যাটা সত্য বলিয়া আত্মপ্রকাশের সুবিধা পাইয়াছে, তাহা সে বুঝিতেও পারিল না অথচ তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া সত্যকে চাপা দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই যে নাই। ইহাকে গ্রহণ করাও চলে না অথচ সরাইয়া ফেলিবারও কোন উপায় নাই।

সতীশ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দূরের গাছগুলির দিকে চাহিয়া থাকে, উহাদেরই ফাঁক দিয়া একটা পাহাড় দেখা যায়। মনে হয় যেন গাছগুলি পাহাড়টাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু সে যে কতদূর মিথ্যা তাহা

সবাই জানে। কিন্তু এই যে মিথ্যা চক্ষের সম্মুখে ধীরে ধীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে তাহাকে প্রকাশ করিয়া সবাইকে জানাইবার লজ্জা ত' কম নয়। হয়ত' সত্যই লজ্জার কিছুই নাই, কিন্তু নাই যে তাহা বুঝিবে কয়জন?

মালতী দেবি অলকাকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। এই ভয়ই সতীশ এতক্ষণ করিতেছিল, কিন্তু বাধা দিবারও উপায় নাই। সকাল-বেলাকার ঘটনার পর উদ্বেগ তাহার কমিয়াছিল সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত সে হইতে পারে নাই। কোন্ কথায় কি করিয়া যে আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিবে নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া আর একবার নাম ধরিয়া ডাকিতে নিষেধ করিয়া দিবে কে জানে? তথাপি সমস্ত কিছু চাপিয়া রাখিয়া বন্ধুর সহিত আলাপ করিতে হইল।

ভিতরে লইয়া গিয়াই মালতী বলিলেন, একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনি বোন, সতীশবাবু এত বই লিখেছেন, কিন্তু কোন বই-ই ত' আপনার নামে উৎসর্গ করা হয়নি, এ যে কি ক'রে হতে পারে, আমি কিন্তু অনেক ভেবেও বার করতে পারিনি।

এই প্রশ্নকারিণীর তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণের সম্মুখে কতক্ষণ নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে, তাহাই ভাবিয়া না পাইয়া অলকা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সত্য কথা বলিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু প্রথম দিনের সেই ব্যবহারের পর সমস্তই যে তাহা হইলে একান্ত বিসদৃশ হইয়া উঠিবে তাহাই বুঝিতে পারিয়া সে নিরস্ত হইল। মুখে একটা হাসির ভাব ফুটাইয়া বলিল, একথা আমাকে জিজ্ঞাসা না করে বাইরে করলেই কিন্তু উত্তর মিলতো। আচ্ছা আপনারা এখানে আছেন কতদিন?

তাহার এই কথা ঘুরাইবার চেষ্টা দেখিয়া মালতী দেবী বিস্মিত হইলেন। হয়ত ইহাদের দাম্পত্য-জীবন তেমন সুখের নয়, হয়ত কোন

একটা ব্যবধান আছে তাহাদের মধ্যে। অথচ ইহাদের কেহই ত' মন্দ নহে। অপর কোন প্রশ্নই না করিয়া তিনি বলিলেন, আছি আমরা এখানে মাসখানেকের ওপর। আর বেশীদিন থাকব না কিন্তু—একটু ভয়ও যে না হয়েছে তা' নয়, ষ্টেশন থেকে তোমাদের বাড়ীটাই একটু বেশী দূরে, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হ'লেও ভয়টা কিন্তু এদিকেই একটু বেশীহবার কথা।

অলকা বলিল, ভয় কিসের? ভয়ের কিছু আছে ব'লে ত' জানি না।

মৃদু হাসিয়া মালতী দেবী বলিলেন, আমরাও ত' জানতাম না। এই কিছুদিন আগে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে, ছেঁড়া জামা কাপড় পরা ভদ্রলোকটিকে দেখে সত্যিই আশ্চর্য্য হয়েছিলাম আমরা। তিনিই ত' ভয় দেখিয়ে দিয়েছেন।

অলকার বুকে কে যেন হাতুড়ীর ঘা মারিতেছিল, সে কোনমতে বলিল, তারপর?

'তারপর?' তিনি ব'ললেন, 'রাত্রে একটা গাড়ীর খোঁজ ক'রতে বেরিয়ে ষ্টেশন থেকে গাঁয়ের দিকে আস্‌বার পথে তাঁর মাথায় কে যেন লাঠি মারে—তাঁর কাছে একটা ছোট হাত-বাক্স ছিল আর সেটাই নাকি ওই আঘাতের কারণ। জ্ঞান হ'লে তিনি নিজেকে এখানকার এক সাঁওতালের বাড়ীতে ছেঁড়া মাদুরের ওপর প'ড়ে থাকতে দেখতে পান। দিনকয়েক পর আমাদের এখানে এসে দশটা টাকা চেয়ে নিয়ে তিনি চ'লে যান—অবশ্য সে টাকা ফেরত পেয়েছি ক'লকাতা থেকে।

কথা শেষ করিয়াই তিনি সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, অলকার মুখের সমস্ত রক্ত কে যেন নিমেষের মধ্যে নিঃশেষে শোষণ করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি চীৎকার করিয়া অলকাকে ধরিয়া ফেলিলেন—অলকাও তাহার হাতের মধ্যে ক্ষণকাল পড়িয়া থাকিয়া উঠিয়া বসিল। মালতী দেবী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এ মেয়েটির চলিবার যেন

কোন নির্দ্দিষ্ট ধারা নাই, যেন কেহ কোন পথ তাহাকে বাঁধিয়া দেয় নাই। সতীশ বাবুর কথা বলিলেও সে খুশীতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে না, অথচ অপরের আঘাতের কথা শুনিয়া চেতনা হারাইতে তাহার মুহূর্ত্ত মাত্র সময়ও লাগে না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল এমন তিনি পূর্ব্বে দেখেন নাই, এমন যে হইতে পারে তাহাও শোনেন নাই।

তাঁহার চীৎকার শুনিয়া উপেনবাবু ও সতীশ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অলকার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, ভয় নেই বোন, একটুতেই ভয় পেলে কি সংসার করা চলে? তারপর সতীশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আপনিই সামলান এবার, যার জিনিষ তার হাতে ছেড়ে দেওয়াই মঙ্গল। আমরা চলি, রোদ উঠে যাচ্ছে।

তাঁহারা বাহির হইয়া গেলেন।

সতীশের দিকে চাহিয়া অলকা বলিল, আপনি কি শোনেন নি তিনি এখানে কি বিপদে পড়েছিলেন?

ঘাড় নাড়িয়া সতীশ বলিল, প্রথমে আমি তাঁর সম্বন্ধে খারাপ ধারণাই করেছিলাম কিন্তু উপেনবাবুর কাছে ঘটনাটা শুনে আমি সমস্তই বুঝতে পারি।

অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া অলকা বলিল, খারাপ লোকে খারাপ ধারণাই ক'রে থাকে চিরকাল, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই; কিন্তু তাঁর অত বড় বিপদের কথা জেনেও আমাকে তা' বলেন নি কেন?

'ব'লে ত' লাভ কিছু হ'ত না। শুধু শুধু মন খারাপই হ'ত তোমার।'

'কিন্তু আমার ওপর অতটা সদয় না হ'লেই ভাল হয়। আমার লাভ হ'ত কি না হ'ত সে আমি বুঝতাম। আপনার মত লোকের যাতে লাভ—আমার তাতে ক্ষতি সে-কথা আপনি ভুললেও আমি কিন্তু ভুলিনি। ক'লকাতায় আমায় নিয়ে যেতে পারেন কি?'

'বেশ তাই হবে।' সতীশ বাহির হইয়া গেল।

অলকা তখনও শান্ত হইল না, ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

* * *

জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শরীরের অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিয়া সুধীর অস্থির হইয়া উঠিল। এ তাহার কি হইল, কেনই বা হইল ? কোথায় কিভাবে সে পড়িয়া আছে, তাহাও সে বুঝিতে পারিতেছিল না। মাথার কাছে কে একজন বসিয়া আছে মনে হওয়ায় আস্তে আস্তে সে বলিল, আমি কোথায় ?

একটি মেয়ে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, হেথায় বাবু, আমাদের ঘরে।

'আমাদের ঘরে' বলিলে কিছুই বোঝা যায় না—সুধীরও বুঝিতে পারিল না। এতটুকু নড়িবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না, শুইয়া শুইয়াই যতদূর সম্ভব সে তাহার দৃষ্টি প্রসারিত করিল। কিন্তু কিছুই যেন পরিচিত নয়—ওই যে বাঁশের আলনার উপর শাড়ী প্রভৃতি টাঙান রহিয়াছে, কুলুঙ্গীর ভিতর ওই যে বাঁশী দুইটা সে কোনদিনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। অথচ জানিবার আগ্রহও তাহার কম নয়, কেমন করিয়া এমনি অপরিচিত স্থানে সে আসিয়া পড়িল!

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি ? কাদের বাড়ী ?

মেয়েটি তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, আমি_বাবু, আমাদের বাড়ী।

তাহার কালো মুখের কালো চোখের দিকে চাহিয়া সুধীর কি যেন ভাবিবার চেষ্টা করিল। কে এ ? ইহাকে কোথাও দেখিয়াছে কি ? কালো পাথরে খোদাই করা ওই চমৎকার মুখের পানে বিস্মিত দৃষ্টি লইয়া সুধীর চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি কি যেন একটু ভাবিয়া বলিল, একটু খাবে বাবু ?

সুধীর বলিল, না, কিন্তু কি করে আমি এখানে এসেছি ?

মেয়েটির মুখে হাসি খেলিয়া গেল, বলিল, না খেলে সে সব শুন্‌তে পাবে না।

সুধীরকে এক বাটী দুধ পান করিতেই হইল।

মেয়েটি বলিল, রাতে বাবুদের বাড়ী থেকে কাজ ক'রে ফেরবার সময় তোমাকে প'ড়ে থাকতে দেখি একটা ঝোপের মধ্যে—মাথা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। একলা নিয়ে যেতে পারব না দেখে মঙ্গরুকে ডেকে নিয়ে তোমাকে আমরা নিয়ে আসি, সে আজ দু'দিনের কথা।—আচ্ছা খুব রস খেয়েছিলে বুঝি বাবু ? মঙ্গরু বলে—পাহাড়ী রস বাবুদের হজম হয় না।

সুধীরের মাথা পরিষ্কার হইয়া গেল। ঠিক সমস্ত মনে পড়িতেছে এখন। কিন্তু অলকা ? তাহার কি হইল—আজ দুইদিন তেমনিভাবে সে কি একলা পড়িয়া আছে ? কিন্তু কোথাই বা আছে আর আছেই যদি তাহারই জন্য ব্যস্ত হইয়া তাহার অন্বেষণ করিতেছে কি ? আর যদি—সে আর কিছু ভাবিতে পারে না, পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার তাহার চোখের উপর নামিয়া আসে—হয়ত বা আবার তাহাকে জ্ঞান হারাইতে হইবে।

এমনি সময় সুগঠিত দেহ বলিষ্ঠ একটি যুবক ঘরে প্রবেশ করিল। মেয়েটি বলিল, বাবুর ঘুম ভেঙ্গেছে মঙ্গরু।

লোকটা সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, সুন্দর চকচকে সাদা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, দুধ খাইয়ে দিয়েছিস ত' ?

'সে কথা কি বল্‌তে হবে রে ?' মেয়েটি সুন্দরভাবে হাসিয়া উঠিল।

কোন কথাই সুধীরের কানে আসিতেছিল না। এমনি সুগঠিত সুন্দর দেহ তাহার হইল না কেন ? এমনি করিয়া সহজ-সরল হাসি তাহার মনের সমস্ত কিছুই ভাসাইয়া লইতে পারে না কি ?

কত রস খেয়েছিলে বাবু, মঙ্গরু বলে এক ভাঁড়। মেয়েটি সুধীরের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল।—

'রস আমি খাইনি, কে যেন লাঠি মেরেছিল আমার মাথায়।' অতি কষ্টে সুধীর উত্তর করিল। কালো পাথরে খোদাই যুবকের সমস্ত শরীর ফুলিয়া উঠিল, বলিল, লাঠি? কার লাঠি বাবু, কারা তারা? ঘরের কোণ হইতে শক্ত একগাছা লাঠি লইয়া সে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

অতিকষ্টেও সুধীরের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। চোখের দৃষ্টি কোমল হইল, দুই-এক ফোঁটা জলও হয়ত গড়াইয়া পড়িল—কি বলিবার চেষ্টা করিয়াও সে বলিতে পারিল না, ঠোঁট কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।—

'তুই বস্ টুম্নী, আমি চলি'। যুবক বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

'কোথা যাবে?' আস্তে আস্তে সুধীর জিজ্ঞাসা করিল।

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া যুবক বলিল, সেই যারা—।

তেমনি হাসি হাসিয়াই সুধীর বলিল, তাদের তুমিও চেন না, আমিও চিনি না। আর সে যে দু'দিন আগেকার কথা।

যুবক কথাটা বুঝিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু তাই ব'লে অমন ক'রে মাথা ফাঠিয়ে দেবে?

না হাসিয়া সুধীর কি করিতে পারে? মানুষ এত সরল অবুঝ হয় কেমন করিয়া? বলিল, কি ক'রতে পার তুমি?

'তাদের খুঁজে বার করতেই হবে'। মঙ্গরু জোর দিয়া বলিল।

সুধীর বলিল, তার চেয়ে আর একটা কাজ ক'রতে পার মঙ্গরু? একটি মেয়ের খোঁজ এনে দিতে পার? সে কোথায় আছে,—কার বাড়ীতে?

মঙ্গরু অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মেয়েটিও ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল।

সুধীর আস্তে আস্তে সমস্ত কিছুই বলিয়া চলিল। ট্রেন হইতে নামিয়া স্ত্রীকে ষ্টেসনেই বসাইয়া রাখিয়া গাড়ীর খোঁজে বাহির হইয়া কিছুদূর আগাইয়া আসিয়া সে যখন একটা ঝোপের পাশ দিয়া চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ কেমন করিয়া যে কি ঘটিযা গেল, তাহা সে ঠিক বুঝিতেও পারে নাই। মাথায় আঘাত লাগায় সে পড়িয়া যায়—কাহারা যেন তাহার হাত হইতে বাক্সটা টানিয়া লয়, কিন্তু আর কিছুই সে জানে না,—জানিবার শক্তিও তাহার ছিল না।

শুনিতে শুনিতে ক্রোধে মঙ্গরুর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, কি যে করিবে, সে তাহা ভাবিতেও পারিল না। তাহার একটা হাত হাতের মধ্যে লইয়া সুধীর বলিল, শুধু রেগে উঠ্‌লেই ত' চ'লবে না মঙ্গরু, এ কাজটা তোমায় ক'রতেই হবে।

মেয়েটি বলিল, আমিও খোঁজ ক'রব বাবু, যে বাবুদের বাড়ীতে কাজ করি, সে বাড়ীতে অনেকে বেড়াতে আসে। আমি ঠিক জান্‌তে পারব বাবু।

উহারা দুইজনেই খোঁজ করিবে ঠিক হইয়া গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুধীর যেন কতকটা শান্ত হইল।

সন্ধ্যার সময় সাঁওতাল যুবক-যুবতী দরজার বাহিরে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বাঁশী বাজাইতে থাকে। সে তন্ময় হইয়া শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়ে। সে বাঁশী যেন তাহাদের দুইটি মনকে এক করিয়া বাঁধিয়া ফেলে, কোন কথা না কহিয়াও তাহারা যেন পরস্পরের সহিত মিশিয়া যায়—শুনিতে শুনিতে সুধীরের মন যেন কোথায় ঘুরিয়া মরে। কি যেন ছিল, কি যেন হারাইয়াছে—চক্ষু মেলিয়া দেখা যায়, চক্ষু বুজিয়া ভাবা যায়, কিন্তু হাত বাড়াইয়া ধরা যায় না। সুধীর অস্থির হইয়া ওঠে, বুকের উপর নিজের দুই হাত চাপিয়া কি যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়া সে ঘুমাইয়া

পড়ে। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে—কে যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে, সে ছুটিয়া চলে পিছু পিছু, কাছে-দূরে কোথাও সে নাই—হঠাৎ দেখা যায় তার মুখ—অলকা। ঘুম ভাঙিয়া যায়, কোথাও কাহাকে দেখা যায় না, মঙ্গরুর বাঁশী তখনও যেন কাহাকে ডাকিয়া চলিয়াছে, আর তাহারই কোলে মাথা রাখিয়া সেই মেয়েটি অপলক-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে তাহার মুখের দিকে। তাহাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখ জলে ভরিয়া যায়, তবুও না চাহিয়া সে পারে না।

এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছিল। কোন খবরই আজ পর্য্যন্ত সে পায় নাই, আর পাইবে বলিয়া আশাও সে করে না। তাহার দুঃখে উহারা সহানুভূতি জানায, হয়ত বা সকলেই জানাইবে, কিন্তু সময় তাহাকে গ্রাহ্য করে না। দিন বসিয়া থাকিতে পারে না, আগাইয়া চলে। কত যে দীর্ঘশ্বাস তাহার বুকের মধ্যে জমা হইয়া উঠিল, কত যে বাহির হইয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু নাই বলিয়াই যে সব কিছু মিলিয়া যাইবে, তাহাও ত হইতে পারে না। সুধীর অস্থির হইয়া পড়িল, কিন্তু কিছুই করিবার শক্তি তাহার ছিল না বলিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকা ছাড়া কোন উপাযই তাহার রহিল না।

আরও দিন সাতেক কাটিযা গেল। সে সুস্থ হইয়া উঠিল, কিন্তু স্বাস্থ্য তখনও ফিরিয়া পাইল না। আর দেরী করিতেও ইচ্ছা হইতেছিল না বলিয়া সে উহাদের কাছে বিদায় লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। মেয়েটি তাহাকে ছাড়িতে চাহে নাই, যুবকও ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সমস্ত স্নেহ-বন্ধনই ছিন্ন করিয়া তাহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইযা সে বাহির হইযা পড়িল। নিজেই একটু খবর লইবে, হয়ত বা ভোরে যাহারা স্বাস্থ্যলাভের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদেরই মধ্যে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে—কিন্তু আশা তাহার সফল হইল না,

কোথাও তাহার দেখা মিলিল না, খবর মিলিবে বলিয়াও মনে হইল না। পথেই উপেনবাবুর সহিত তাহার আলাপ হইল—তাহারই বাড়ীতে অসিয়া দশটা টাকা ধার লইয়া সে কলিকাতার পথে রওনা হইয়া গেল।

হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়াই তাহার চক্ষু যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঠিক ওই জায়গায়ই আজ কয়েকদিন আগে নব-বধূকে লইয়া সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; ঠিক ওইখানে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কথা কহিয়াছিল, হয়ত বা তাহাদের পায়ের ধূলা আজিও সেখানে পড়িয়া আছে —হয়ত বা আজিও তাহার স্পর্শ পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু আসল যা তাহা ত কোথাও নাই, নকল সব কিছুই আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে--- চক্ষু তাহার জলে ভরিয়া উঠিল, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সে আগাইয়া গেল।

দেশ হইতে কিছু টাকা আনাইয়া উপেনবাবুর ঋণ পরিশোধ করিয়া সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে, তাহার হাতে আর কোন কাজই নাই। কি যে করিবে, তাহা সে ভাবিয়াও পাইল না। চুপ-চাপ ঘরের মধ্যে বসিয়া বসিযা দিন যেন আর কাটে না, অথচ বাহিরে যাইয়া লোকের ভীড় দেখিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার ইচ্ছাও তাহার ছিল না।

মেসের জগদীশ বলিল, অমন মনমরা হ'য়ে আছেন কেন? আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই শুধু এই ভেবে যে জোয়ান বযসে মানুষ এমনি ক'রে চুপ ক'রে থাকে কি ক'রে? কি হ'য়েছে কি আপনার?

কোন কিছুই সে বলিতে পারিল না, শুধু হতাশভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া জগদীশ বলিল, চলুন খানিক গান শুনে আসা যাক্। গান জিনিষটা মনের সমস্ত কিছু দুর্ব্বলতা সরিয়ে দেয়, তা জানেন ত?

'ও দুর্ব্বলতা আমার থাকলেই ভাল।' সুধীর তাহার চোখের দিকে চাহিয়া বলিল। এক টুক্‌রা হাসি দাঁতের পাশ দিয়া অতি সন্তর্পণে বাহির করিয়া জগদীশ বলিল. আচ্ছা তা সে দুর্ব্বলতা না হয় পরে আবার ঠিক ক'রে নেবেন, এখন উঠুন, শুনলে বুঝতে পারবেন সত্যিকার দাম তার কত।

কি ভাবিয়া সুধীর বলিল, কোথায় কতদূর যেতে হবে?

তেমনিভাবেই সে বলিল, সে ভাবনা আপনার কেন? আমি নিয়ে যাচ্ছি চলুন একবার না হয় আত্মসমর্পণই ক'রলেন, বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, আসুন।

সুধীর উঠিয়া বসিল, মনের অবস্থা তাহার ভাল নয়, জামা হাতে লইয়া কি যেন সে ভাবিতে লাগিল।

জগদীশ তাড়া দিয়া বলিল, আপনি ত' কম নন, জামা হাতে নিযেও ভাবতে পারেন দেখ্‌ছি। যুবক হ'লেও সত্যিকার যুবক ব'লে মনে হয় না আপনাকে। কাজ ক'রতে আরম্ভ করবার আগেই এত চিন্তিত হওয়া যৌবনের ধর্ম্ম নয়। যদি অসুবিধা হয়, ভাল না লাগে চ'লে আসবেন, বাধা দেবে না কেউ।

আর এতটুকুও ইতস্তত না করিয়া সুধার তাহার সহিত গাড়ীতে গিয়া উঠিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। কয়েকটা রাস্তা পার হইয়া একটা মাঝারি গোছের রাস্তা ধরিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। গ্যাসের আলোকগুলি জ্বলিতেছিল আর তাহাদেরই আলোয় পথিপার্শ্বের বাড়ীগুলির দরজার সম্মুখে সজ্জিতা নারীদের দেখা যাইতেছিল, কেহ বা গল্প করিতেছে, কেহ বা গান গাহিতেছে, কেহ বা অকারণেই হাসিতেছে। দূরে কোন এক গৃহের কোন এক কক্ষ হইতে হারমোনিয়ামের আওয়াজের সাথে বেতালা গান শোনা যাইতেছিল। অন্যমনস্ক সুধীরের কান সেদিকে

ছিল না, চক্ষুও বোধ করি কোন অদৃশ্য জিনিষ দেখিবার জন্য আকুল আগ্রহে কোন্ এক অদৃশ্য জগতে চলিয়া গিয়াছিল। তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া জগদীশ গাড়ী থামাইতে বলিল।

হাত ধরিয়া তাহাকে নামাইয়া লইয়া সিঁড়ি বাহিয়া সে উপরে উঠিয়া আসিল। একটি ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া মৃদু হাসিয়া সে বলিল, আসুন ভেতরে, এ আমার ঘর ব'ল্লেও হয়, কোন কিছু দেখেই আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন না যেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে দেখিতে পাইল, সিগারেট হাতে একটি যুবতী অর্দ্ধশায়িতা অবস্থায় সোফার উপর শুইয়া আছে। তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল—অলকা ভাসিয়া আসিল চক্ষের সম্মুখে। বুঝিবার শক্তি তাহার যথেষ্টই আছে, এতক্ষণ যে কেন সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই, তাহা ভাবিয়াই তাহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। অলকা, তাহারই অলকা হয়ত আজিও তাহার জন্য চক্ষু চাহিয়া আছে, পথের দিকে চাহিয়া দিন গুণিয়াও হয়ত আজিও সে হতাশ হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু তাহার সম্মুখে ওই যে একজন বসিয়া সেও ত নারী, কিন্তু নারীর নারীত্ব কতটুকু তাহাতে আছে? হঠাৎ কে যেন তাহাকে সজোরে ধাক্কা দিল—কোন্ অদৃশ্য জগৎ হইতে একটা অগ্নিকণা ছিট্‌কাইয়া আসিয়া যেন তাহাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পিছনে ভাসিয়া আসিল কাহাদের তীব্র হাসি—তাহার চতুর্দ্দিকেই সে হাসির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইল। দুই হাতে কান চাপিয়া ধরিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

মেসে ফিরিয়া কাহারও সহিত তাহার দেখা হইল না, সে ইচ্ছাও তাহার ছিল না—সোজা বিছানার উপর নিজেকে এলাইয়া দিয়া সে স্তব্ধ

হইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে তাহার চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিল। পাশের চৌকির দিকে চাহিয়াই মন তাহার কাঁপিয়া উঠিল। হয়ত ঘণ্টাকয়েক পরেই জগদীশ ফিরিয়া আসিবে, হয়ত তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিবে—সেই হাসির কথা মনে হইবামাত্র রক্ত তাহার জল হইয়া যাইতে চাহিল। আর কোন কিছুই না ভাবিয়া সেই রাত্রেই দেশে যাইবার জন্য সে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবেন বাবু এ সময় ?

সুধীর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি একটু ভাবিয়া বলিল একটু দেশে যাব রে, হয়ত আর আসব' না, এই টাকা কটা নে—ছেলেকে খাওয়াস্ আর একটা গাড়ী ডেকে দে শীগগির, এখনি না বেরোলে দেরী হ'য়ে যাবে।

সেই দিনের ট্রেণেই সুধীর দেশে রওনা হইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। *

কলিকাতায় আসিয়াই অলকাকে লইয়া সতীশ মহা বিপদে পড়িয়া গেল। বাড়ীতে তাহার আত্মীয় স্বজন কেহ নাই, হয়ত' বা কোথাও নাই, কিন্তু রামহরি এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে সে তাহাকে কি বলিয়া পরিচিত করিবে ? এই যে এতগুলি দিন সে ওই অতি সুন্দর মেয়েটির সহিত একা কাটাইয়া দিল তাহাকে কেহই নয় বলিয়া বিশ্বাস কি ওই বৃদ্ধ রামহরিও করিবে ? তাহার বন্ধুবান্ধব, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকেরা হয়ত' ইহাকে অন্যায় বলিয়াই মনে করিবে আর তাহার শত্রুপক্ষ যে এই চমৎকার ব্যাপারকে অধিকতর রহস্যময় করিয়া কাগজে কাগজে তাহাকে বিরাট পুরুষ বলিয়া প্রচার করিবে না তাহাও বুঝিতে তাহার এতটুকুও দেরী হইল না। কিন্তু পিছাইয়া পড়িবার মত মূর্খতা তাহার নাই, সরিয়া দাঁড়াইবার মত ভীরুও সে নহে।

ট্যাক্সিতে উঠিয়া অলকাকে লইয়া যখন সে বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল তখন বেশ ভোর হইয়া গিয়াছিল। মহানগরীর বিরাট প্রাসাদগুলি হইতে নিদ্রাদেবী হয়ত' তখনও সরিয়া যান নাই কিন্তু তাই বলিয়া পথে লোকেরও বিশেষ অভাব ছিল না। নানা রাস্তা ঘুরিয়া ট্যাক্সি আসিয়া থামিল ছোটখাট সুন্দর একটি বাড়ীর সম্মুখে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় কে যেন একখানা ছবি আঁকিয়া রাখিযাছে, কাছে আসিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, চমৎকার—এমনি শান্ত গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে না।

নামিতে নামিতে অলকা সতীশের মুখের দিকে চকিতে একবার চাহিয়া দেখিল। তাহার অন্তরের ভাষা পড়িবার সাধ্য তাহার ছিল না।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল, এই আমার বাড়ী, কিন্তু তারপর?

অলকা মাথা নীচু করিয়া বলিল, পরের কথা এখন থাক, কাউকে ডাকুন, এখানেই কি দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি সব কিছু নিয়ে?

দূরে রামহরিকে দেখা গেল, তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া সে বলিল কোন খবর না দিয়েই যে খোকাবাবু? বুড়ো ব'লে গ্রাহ্য বুঝি আর হয় না, তা বেশ। অলকার দিকে ফিরিয়া সে কেবলি দেখিতে লাগিল, কে এ? খামখেয়ালী খোকাবাবুকে সে জানে—হয়ত' বা বিবাহ করিয়াই আসিযাছে, রামহরিকে গ্রাহ্য করিবার দিন ত' আর তাহার নাই। থাকিবেই যদি ত' তাহাকে ফেলিয়া সে যাইবে কেমন করিয়া? কিন্তু খোকাবাবুর পছন্দ আছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চমৎকার মেয়ে, বাড়ীর বধূ করিয়া সাজাইয়া রাখা চলে। রামহরির মন খুশীতে ভরিয়া উঠিল, মনে মনে সে বলিল, এইবার দেখব' রাত জেগে কেমন লেখা পড়া চলে—নির্জ্জন ফাঁকা বাড়ীতে লক্ষ্মী এবার পায়ের ধূলো দিয়েছেন।

তাহাকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অলকার দিকে বারে বারে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া সতীশ বলিয়া উঠিল, তবে তুই দাঁড়িয়ে থাক আমি বাক্স বিছানা কাঁধে ক'রে নিয়ে যাই, দে ওটা আমার কাঁধে চাপিয়ে।

চমক ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় রামহরি নিজের কান মলিয়া বলিল, তোমাদের আসতে দেখে যে অবাক হ'য়ে গেছি আমি, বুড়ো হ'য়েছি কি না—আনন্দ হ'লে অমন হয়। তোমরা এগোও আমি সব ঠিক ক'রে নিয়ে যাচ্ছি—যাও আর দাঁড়িয়ে থেক'না, রামহরির কাঁধে যথেষ্ট জোর আছে এখনও, তোমাকে কাঁধে নিয়ে অনেকদিন আগেই সে জোর ক'রে রেখেছি।

অলকাকে লইয়া সতীশ গৃহে প্রবেশ করিল—পাশের ঘরটা তাহাকে দেখাইয়া দিয়া নিজের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে সে বলিল, নীচে বাথরুমে গিয়ে স্নান সেরে এস, দেরী কর'না যাও। সারা রাত ত' আর কম কষ্ট হয়নি—আমিও ঠিক হ'য়ে নিচ্ছি। এ বাড়ীতে আর কেউ নেই, একটু অসুবিধে হ'তে পারে কিন্তু উপায় নেই অলকা, সব কিছু নিজেকেই দেখে নিতে হবে তোমার।

সতীশ বাহির হইয়া গেল।

অলকা চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল, ওই যে লোকটার এত স্নেহ মমতা তাহার কি কোন মূল্যই নাই? কেবল তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কষ্ট দেওয়াই কি উচিত! প্রায় সারা রাত রেলে সে জাগিয়া কাটাইয়াছে—ওই লোকটার ঘুমন্ত মুখের দিকে না চাহিয়া সে পারে নাই, তাহার শান্ত ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া, তাহার মুখের হাসি দেখিয়া তাহার মন যেন কিসের আকর্ষণে উহারই দিকে আগাইয়া গিয়াছে। আজ কোন কিছু করিবার মত শক্তিই তাহার নাই, সে স্থির হইয়া অন্যমনস্কের মত বসিয়া রহিল।

স্নান সারিয়া অলকাকে কোথায়ও খুঁজিয়া না পাইয়া সতীশ সেই ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া সে বলিল, এমনি ক'রে ব'সে থাকলেই চলবে নাকি? ভবিষ্যৎ যাক, বর্ত্তমানকে ফেলে রাখা কিন্তু উচিত নয়। আমি কথা দিচ্ছি অলকা সে যদি ক'লকাতায় এসে থাকে ত' যে কোন উপায়ে তাকে খুঁজে বার করবই। তুমি এমনি ক'রে থাকলে ত' চ'লবে না। ব'লেছি ত' এ বাড়ীকে নিজের ক'রে নিতে হবে তোমাকেই।

অলকা তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল, দুই চক্ষু তাহার অশ্রুজলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল, নিজেকে গোপন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি সে অন্য দিকে ফিরিয়া চাহিল কোন কথাই বলিতে পারিল না।

অলকার ভাবান্তর সতীশের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, তা'হলে আজ কি আর আমাদের চা খাওয়া হবে না—রামহরি কিন্তু সত্যি রাগ করবে, আর রাগ করবে সে আমারই ওপর।

কোন কথা না বলিয়া বাক্স হইতে একটা সাড়ী বাহির করিয়া লইয়া অলকা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—সতীশ তাহার গমন পথের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল, তাহার দৃষ্টি তখন তাহাকে ছাড়িয়া হয়ত আরও দূরে চলিয়া গিয়াছিল।

রামহরি আসিয়া বলিল, খোকাবাবুর চা খেতেই কি আজ দিন কেটে যাবে নাকি? তারপর আরও কাছে সরিয়া আসিয়া চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, কার মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে এলে? আমাকে একবার জানাতে হয় ত।

বলে কি? সবারই কি একমত?—যুবকের কাছে যুবতী দেখিলে বিশেষ করিয়া সে যদি সুন্দরী হয় আর তাহার সিঁথিতে যদি সিন্দুর

থাকে তাহা হইলেই তাহাকে ওই যুবকেরই স্ত্রী হইয়া যাইতে হইবে—ইহা যে পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়া অপরিচিতরা একযোগে কি করিয়া ধারণা করিয়া লয় তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারে না। কিন্তু ইহাই যে মানুষের ধারণাশক্তির একমাত্র পরিচয় সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ করিবার অবকাশও তাহার নাই।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রামহরি বলিল, কিন্তু বৌ বেশ ভালই হয়েছে—দু'দিনেই আমি তাকে সমস্ত শিখিয়ে দেব, কিন্তু এতটুকু কাজ করতেও তাকে দেব না মনে থাকে যেন। রামহরি জোরে মাথা নাড়িয়া তাহার মতের দৃঢ়তার কথা জানাইয়া দিল।

এতক্ষণে সতীশ যেন জ্ঞান ফিরিয়া পাইল, বলিল, বলছিস কি তুই? আমার বৌ ত' ও নয়। সে অনেক কথা—পরে শুনিস, এখন দেখে আয় ত' কত দেরী আছে ওর।

রামহরি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিল, যাহার কেহ নাই তাহারই সহিত তবে কাহার বৌ আসিয়া উপস্থিত হইল, খোকাবাবু কি সত্যিই ঠাট্টা করিতেছে না? বেশ সুন্দরী—খোকাবাবুকে এতটুকু দোষও ত সে দিবে না, তবে এ আবার কি কথা বলিতেছে সে?

দাঁত বাহির করিয়া সে বলিল, হ্যাঁ ওসব তামাসার কথা ছেড়ে দাও লজ্জারই বা কি আছে এতে।—

সতীশ বলিল, বিশ্বাস না করলে আমি তা করাতে চাইনে তোকে, কিন্তু থাক সে-সব কথা, যা বললাম তাই দেখে আয় আগে। আর চা দিস আমাদের আমার ঘরেই।

সদ্যস্নাত অলকা চুলের গোছা এলাইয়া দিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সতীশের দিকে নজর পড়িবামাত্র মাথার উপর সে কাপড় তুলিয়া দিল—তাহার এ লজ্জা রামহরির দৃষ্টি অতিক্রম করিল না, বাহির হইয়া যাইতে

যাইতে কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল এ কেমন করিয়া সম্ভব হয় কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না যে?

সতীশকে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অলকা বলিল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমার কাজ যে কিছুই হবে না, আপনি যান ও ঘরে আমি আসছি—আর বেশী দেরী হবে না।—

তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কি যেন বলিতে গিয়া সতীশ থামিয়া গেল তারপর কি ভাবিয়া বলিল, হ্যাঁ একটু শীগগির করে নাও। আবার যেন তেমনি চুপ করে বসে থেক না।

পাশের ঘরে গিয়া সে সোফার উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অলকা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া গিয়া রামহরিকে বলিল, তুমি ত খুব ভাল রান্না করতে পার, আজ আমাকে ওই কাজটা দিয়ে দেখ দেখি আমি কি রকম পারি, যদি কোনটা খারাপ হয় ত তোমার কাছ থেকে শিখে নিতে পারব।

ব্যস্ত হইয়া রামহরি বলিল, না না তা হয় না, আগুনের তাপ তোমায় লাগতে দিতে পারব না মা, শেষে ওই রং কালো হয়ে যাক আর কি, বাস্‌রে সে আমি পারব না কিছুতেই।

হাসিয়া অলকা বলিল, আগুনের তাপ লেগে লেগেই তোমার রং বুঝি কালো হয়ে গেছে রামহরি? জোরে হাসিয়া উঠিয়া রামহরি বলিল, নিশ্চয়ই তাই – সাহেবদের চেয়েও ফর্সা ছিলাম আমি, কিন্তু কি করি মা, আমার হাতে খেতে যে খোকাবাবু ভালবাসে আর তাই ত আমার এ দশা।

অলকাও হাসিয়া বলিল, আমারও তাহলে ঠিক অমনি দশাই হবে দেখছি। কথাটা সে ভাবিয়া বলে নাই। শেষ হওয়া মাত্রই লজ্জায় তাহার সারা মুখ লাল হইয়া উঠিল।

রামহরি অতশত বুঝিল না, বুঝিবার প্রয়োজনও তাহার ছিল না, বলিয়া উঠিল, সে হবে না, খোকাবাবুকে আমি সে কথা বলে রেখেছি।

তাড়াতাড়ি অলকা বলিল, আচ্ছা বয়েসটা কত তোমার খোকাবাবুর ?

রামহরি ঠাট্টা বুঝিতে পারিল, বলিল, তা কি করব মা, অনেক মেয়ে পুরুষ এসে বাবুকে আমার কত প্রশংসা করে যায়, অনেক ভাল লেখাপড়া জানা হয়েছে কিনা সে, আমি কিন্তু মুখ্যু মানুষ সেসব কিছু বুঝি না— আমার কেবলই মনে হয় ওর মায়ের কথা। ও তখন খুব ছোট ওর বিধবা মা মারা যাবার সময় আমার হাতে ওকে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, ওকে দেখ রামহরি আর ত কেউ রইল না ওর, সেই থেকেই ত আমি ওকে নিয়ে আছি মা—ও খোকাবাবু নয়ত আমার মনিব নাকি ?

তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল কিন্তু এই নূতন মেয়েটির কাছে সে পুরাতন কথা প্রকাশ করিয়া চক্ষের জল বাহির করিতে ত কিছুতেই পারে না—অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া সে কোনমতে নিজেকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু এই তিক্ষ্ণদৃষ্টি মেয়েটিকে ফাঁকি দিবার কোন উপায়ই ছিল না। মুহূর্ত্তেই সমস্ত কিছু বুঝিয়া লইয়া সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ও সমস্ত আর এক সময় শুনব আমি এখন চল চা নিয়ে যাই তোমার বাবু হয়ত অস্থির হয়ে উঠেছেন—কাল সারা রাত ত' খাওয়া হয়নি বললেও চলে।

খোকাবাবুর আহারের কথা মনে হইবামাত্রই রামহরি নিজেকে সামলাইয়া লইল। চায়ের কেট্‌লী ও কাপ তাহার হাতে দিয়া ট্রের মধ্যে দুধ, চিনি ও আনুষঙ্গিক খাবার লইয়া অলকা উপরে উঠিয়া আসিল।

অলকা ভাবিতেছিল ওই লোকটির কথা, রামহরির স্নেহ ও যত্ন ব্যতীত আর কিছুই সে পায় নাই—উহাতে তাহার মনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা

যে মিটে নাই তাহা সে নিশ্চয় করিয়াই বলিতে পারে, হয়ত ঠিক এই সব কারণেই তাহাকে স্নেহ করা চলে, তাহার জন্য চিন্তিত হওয়া এতটুকু দোষেরও নহে। তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়া পৃথিবীর সমস্ত দুঃখের কথা তাহার মনের কোণ হইতে সম্পূর্ণরূপে সরাইয়া রাখাই একান্ত উচিত। অকস্মাৎ তাহার সারা মন খুশীতে ভরিয়া উঠিল, সারা দেহ যেন বাতাসের মত হাল্‌কা বোধ হইল।

রামহরি মনে মনে ভাবিতেছিল, ওই যে মেয়েটি তাহারই মত স্বচ্ছন্দ গতিতে তাহারই খোকাবাবুর জন্য ব্যস্ত হইয়া চলিয়াছে ইহার কি কোন মানেই নাই? উহাকেই বাড়ীর বধূ করিয়া সমস্ত কিছুকে ভরাইয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহাও হইবার নহে, কেমন করিয়া কাহার স্ত্রী হইয়া যে সে দূরে সরিয়া গিয়াছে রামহরি তাহা ভাবিয়াও পায় না। উহাকে যেন এ-বাড়ীর জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছিল কিন্তু ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতাও তাহাকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু কেমনই বা তাহার স্বামী—কেমন করিয়া সে তাহাকে দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছে! দেখিয়া দেখিয়া রামহরির আশা মিটে না, ভাবিয়া সে কোন কূল কিনারা পায় না।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই অলকা বলিল, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? গাড়ীতে ত' কম ঘুমোন-নি।

চক্ষু মেলিয়া সতীশ বলিল, না ঘুমোইনি, ভাবছিলাম।

সমস্ত কিছু নামাইয়া দিয়া রামহরি বাহির হইয়া গেল।

পেয়ালায় চা ঢালিয়া দিয়া অলকা বলিল, কি ভাবছিলেন?

সম্মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সতীশ বলিল, ভাবছিলাম তোমার কথাই, কলকাতায় ত আসা গেল, এবার কি করা যায়, তাকে খুঁজে বার করবই বলেছি কিন্তু করি কি করে? কোন পথইত' চোখে পড়ে না।

একটু ম্লানভাবে অলকা বলিল, সেটা ভাগ্যের কথা কিন্তু খুঁজে না পেলেও আপনাকে দোষ দিতে পারব না। আপনি যে উপকার করেছেন তা ভুলতে পারব না কোন দিন।

'কিন্তু সেকথা ভুলে যাওয়াই ভাল।' সতীশ বলিল।—

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অলকা বলিল, আমি কেবলই ভাবি আপনি যদি সেখানে ঠিক সেই সময়ে গিয়ে না পৌছুতেন ত' আমার উপায় কি হত? আজ আমাকে থাকতেই বা হত কোথায়? সেকথা মনে হওয়া মাত্রই সমস্ত শরীর আমার আজও কেঁপে ওঠে। ভগবানের আশীর্ব্বাদের মতই সেদিন আপনি আমার সব চেয়ে প্রয়োজনীয় যা তাই করেছিলেন।

তাহারা দুইজনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

আস্তে আস্তে অলকা বলিল, থাক সে সব চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, আবার গরম করে নিয়ে আস্‌তে পারবনা কিন্তু।

ম্লান হাসি হাসিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমক দিয়া সতীশ বলিল, কাগজে ছাপিয়ে দিলে কেমন হয়, হয়ত তার চোখে পড়তেও পারে তাহলে।

অলকা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বলিল, না, কাগজে না ছাপিয়ে যদি পারেন ত' খোঁজ করুন। কাগজে প্রকাশ করার পক্ষপাতী আমি নই।

সতীশ মাথা নীচু করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। অলকা তাহার দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া যাওয়ার পর সতীশ বলিল, যদি আমি ভাল করে খোঁজ না করতে পারি? আমার নিজের সমস্ত কাজই যে নষ্ট হতে বসেছে। আমি সবচেয়ে যা ভালবাসি অলকা, তা থেকে আমায় সরে থকতে ব'লো না। কিন্তু কি করি?

সতীশ উঠিয়া পড়িল। সমস্ত ঘরময় পায়চারী করিতে লাগিল, তাহার মুখে চোখে একটা চিন্তার রেখা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। এমনি করিয়া আর ত চলে না অথচ অন্য কি উপায়ই বা অবলম্বন করা যায়?

রামহরি অলকার কাছে আসিয়া কি বলিল। তাহারা দুইজনেই বাহির হইয়া গেল। সতীশের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না, সে আপন মনে সারা ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ থামিয়া পড়িয়া আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল, তা হয় না অলকা, আমি পারব না, সব কিছু ছেড়ে দিয়ে একাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

অলকা যেখানে বসিয়াছিল সেদিকে লক্ষ্য করিয়া তাহার যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল। কখন যে সে চলিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিতেই পারে নাই ত'। হয়ত' তাহার কথা সে শোনে নাই, হয়ত' ভালই হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে জানাইয়া রাখাই ভাল। সে ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য আগাইয়া চলিল।

ঠিক এমন সময় ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল প্রতুল।

ঘরে আসিয়াই সে বলিল, কিহে সাহিত্যিক, তুমি আবার বৈমানিক-দের মত হঠাৎ অদৃশ্য হতে আরম্ভ করেছ দেখছি। যাক্ তেমনি হঠাৎই যে ফিরেছ এই যথেষ্ট। আরে বস বস, এত অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছ কেন।

সে সতীশকে টানিয়া লইয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল। সতীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথাই বলিল না।

তাহার অবস্থা দেখিয়া প্রতুল হাসিয়া উঠিল, বলিল ব্যাপার কি হে, সাহিত্যিকের মুখ কোন্ দ্রোণাচার্য্য বন্ধ করে দিয়েছে? কার পূজোয় তোমার কলমের সাহায্যে ব্যাঘাত ঘটাতে গিয়েছিলে?

সতীশ এতক্ষণে সহজ হইয়া বলিল, নিশ্চয় তেমনি কিছু ঘটেছে—শব্দভেদী বাণ কিনা তাই কে সেই তীরন্দাজ তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। বন্ধুবর যদি সহায় হন্—

প্রতুল উঠিয়া পড়িল, ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বার দুই ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, না হে কোন বুদ্ধিই বার করতে পারছি না। না, আগে কিছু খেয়ে নিতে হবে—পেটের সঙ্গে মগজের একটা ঘোরতর সম্বন্ধ আছে। অনেকদিন ছিলে না এখানে তাই অনেকদিনের ক্ষিদে জমে আছে—বস, আসছি, রামহাবর কাছ থেকে কিছু আদায় করে।

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, সতীশ বাধা দিতে পারিল না। ঠিক আগের দিনের মতই সহজভাবে সে রামহরির কাছে যাইবে কিন্তু ঠিক সেই অবস্থা ত আর নাই, রামহরি আজ একা নহে, হয়ত' তাহারই কাছে বসিয়া অলকা গল্প করিতেছে—যাহা কিছু জানিবার তাহার সমস্তই হয়ত সে জানিয়া লইতেছে। এ-বাড়ীর অন্দরে কাহারও, বিশেষ করিয়া প্রতুলের গতিবিধির প্রশ্ন কোনদিনই উঠে নাই—অন্দর বলিয়া কোন কিছুই এ-বাড়ীতে এতদিন ছিল না, তাহার অনুপস্থিতিতেও প্রতুল স্বচ্ছন্দে এখানে আসিয়াছে, কোন কোন দিন হয়ত সমস্ত রাত কোন একটা ঘরে ঘুমাইয়া লইয়াছে। কোন প্রশ্ন উঠে নাই, আজিও উঠিল না কিন্তু আজই হয়ত সমস্ত কিছু ওলট-পালট হইয়া যাইবে—হয়ত বাহিরের সমস্ত লোকই শিহরিয়া উঠিয়া আজ হইতেই ছি ছি করিতে থাকিবে। কিন্তু তাই বলিয়া ওই লোকটার সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে বাধা দিবার শক্তি তাহার নাই, তাহাকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণও ছিল না।

রান্নাঘরের দরজার সম্মুখে বসিয়া রামহরি হাত মুখ নাড়িয়া কাহাকে কি যেন বুঝাইতেছিল। প্রতুল একটু বিস্মিত হইয়া উঠিল—আর কেহ

বা থাকিতে পারে, রামহরি বাঁচিয়া থাকিতে তাহারই খোকাবাবুর জন্য রান্না করিবার সাহসই বা অন্য কাহার হইতে পারে? প্রতুল ভাবিয়া পাইল না, ভাবিবার প্রয়োজনও সে বিশেষ অনুভব করিল না।

দরজার সম্মুখে আসিয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে অবাক হইয়া গেল। বাহিরে গিয়া সতীশ কি তবে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে নাকি? কিন্তু কই খবরটা ত আজিও সে পায় নাই,—তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই অমন করিয়া প্রথম হইতেই কেহ ভাবিতে বসে না।

উহারা কেহই তাহার আগমন টের পায় নাই।

তেমনি উৎসাহের সহিতই রামহরি বলিতেছিল, খোকাবাবু আমার ছোট হ'লে কি হবে ওইটুকু বয়েসেই সে যে কতবড় হয়ে উঠেছে তা তুমি ঠিক বুঝবে না মা, সে আমি বুড়ো হয়েও ঠিক বুঝতে পারি না যে—কত গাড়ী আসে, কত জায়গায় যেতে হয় তাকে, আমি ত অবাক হয়ে ভাবি। কত দাড়ীওয়ালা বুড়োও যে কি সব লেখা নেবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ ক'রে ব'সে থাকে তা যদি দেখতে!

উনুন হইতে কড়াটা নামাইয়া কি বলিতে গিয়া চক্ষু তুলিতেই অলকার দৃষ্টি আসিয়া পড়িল প্রতুলের উপর। সে বিস্মিত, জড়সড় হইয়া উঠিল। তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া রামহরি পশ্চাতে ফিরিয়া প্রতুলকে দেখিয়া উল্লাসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, এই ত প্রতুলবাবু এসেছেন, উনি কত খবর জানেন আমার বাবুর। সমস্ত খবর তুমি তার কাছেই পাবে মা। আমি মুখ্যু—কিই বা জানি।

লজ্জায় অলকার মাথা নীচু হইয়া আসিল। তাহারই খোকাবাবুর কথা সে শুনিতে চাহে সত্য, কিন্তু তাহা লোক-চক্ষুর সম্মুখে এমনি করিয়া ত নহে। ইহা শুনিবার কথা তাহার নয়, হয়ত' অধিকার নাই। কিন্তু

আগ্রহ ত নিয়ম অথবা অধিকার মানিয়াই চলে না, তাই সমস্ত কিছু গোপন করিয়া, নিজেকেও গোপন করিয়া সে শুনিতে চাহে, কিন্তু ওই সহজ সরল লোকটি যে এমনি করিয়া সাক্ষী ডাকিয়া নিজেকে মূর্খ বলিয়া দূরে সরিয়া গিয়া ওই সতীশেরই বন্ধুকে তাহার দিকে আগাইয়া দিবে তাহা সে ভাবিতেও পারে নাই।

কিন্তু এ-সবে প্রতুলের প্রয়োজন ছিল না—কাহারও প্রশংসা করিবার মত দুর্ব্বুদ্ধিও তাহার নাই। হাসিয়া ফেলিয়া সে বলিল, ও তুমিই ভাল পারবে রামহরি, আমার বুদ্ধি এমন কিছুই নয় যে তোমার চেয়ে ভালভাবে বলতে পারব। সে-সব থাক, কেন এসেছি এখানে বুঝতে পারছ নিশ্চয়।

রামহরিও হাসিয়া উঠিল, বলিল, হ্যাঁ খুবই সোজা কথা, কিন্তু শুক্‌নো রুটি যে।

'বটে! শুক্‌নো রুটি নিয়ে এস দেখি কি রকম?' প্রতুল বলিল।

রামহরি রুটি লইয়া আসিল, ইতিমধ্যে কোথা হইতে একটা প্লেট লইয়া আসিয়া প্রতুল বলিল, দিন দেখি কি রেঁধেছেন—খুব ভাল হয়েছে সার্টিফিকেট দিচ্ছি। হ্যাঁ, তরকারী হ'লেই চলিবে।

অলকা অবাক হইয়া গেল, কোন প্রশ্নই নাই, এতটুকু বিস্মিত দৃষ্টিও তাহার চোখে সে দেখে নাই যেন বহুদিন হইতেই সে তাহাকে দেখিয়া আসিতেছে—বহুদিনত যেন এমনি করিয়া চাহিয়া খাইয়াছে।

অলকার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই যে এতগুলি লোক যাহারা সতীশবাবুকে অভিনন্দন জানায়, যাহারা তাহার বন্ধু—তাহাকে দেখিয়া কি ভাবিবে, হয়ত সেই ভদ্রলোকটিকে পর্য্যন্ত তাহারা ধূলায় নামাইয়া আনিবে, এমনি অনেক কিছুই মনে করিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহাদেরই একজন অত্যন্ত সহজভাবে কোন প্রশ্নকেই সম্মুখে না আনিয়া কি করিয়া এমনি অনায়াসে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া কথা

কহিতে পারে, তাহা ভাবিয়া না পাইলেও শঙ্কা তাহার অনেকখানিই কমিয়া গেল।

হাসিমুখে সে বলিল, না খেয়েই সার্টিফিকেট ?

প্রতুলও হাসিয়া বলিল, এ সব হচ্ছে অনুভূতি। কিন্তু কথা বলেই থামিয়ে রাখতে চান নাকি, দিন। রেঁধেছেন ত সাতজনের মত, লোক কিন্তু মোটে তিনজন। আপনি নিজেই জন পাঁচেক নাকি ?

প্লেটে অনেকটা ঢালিয়া দিয়া অলকা বলিল আমি একা পাঁচজন হলে আপনি পনেরর কম হবেন না—তা বোঝেন ত ?

একটুকরা রুটি মুখে দিয়া প্রতুল বলিল, না আরও কিছু বেশী হতে পারি। সত্যি রেঁধেছেন ভালই—আজ আমার এখানেই নিমন্ত্রণ রইল, বুঝলেন ?

পিছন হইতে রামহরি বলিল, সেই ভাল, আপনি এখানে খেলে খোকনবাবুর খাওয়াও খুব ভাল হয়।

প্রতুল বলিল, থাম রামহরি, তোমাকে বলতে হবে না। নিমন্ত্রণ করবার ভার আমি নিজেই নিতে পারি। হ্যাঁ, ভাতটা একটু বেশীই রাঁধবেন।

রামহরি হাসিয়া বলিল, সে আমি জানি বাবু।

'ভাল কথা, আপনিও জেনে রাখুন বেশ ক'রে'।

হাসিমুখে অলকা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। নারীর সমস্ত স্নেহ মমতাই তাহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্রধারে যেন তাহারই উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া আসিতেছিল। এমনি করিয়া মুহূর্ত্তেই আপনার করিয়া লইতে সে কাহাকেও দেখে নাই, এমন যে হইতেও পারে, সে জানিত না, আর জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই ওই লোকটাকে দূরে রাখিবার কথাও যেন সে ভাবিতে পারিল না।

তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিয়া লইতে প্রতুলের এতটুকু দেরীও হইল না, কি একটু ভাবিয়া সে বলিল, একটা কিছু ঠিক ক'রে নেওয়া উচিত, যাতে ডাকার সুবিধে হয়, হ্যাঁ, বয়সে ছোট হলেও আজ থেক আমার দিদি হলেন আপনি। শুনেছি নিজের দিদি ছিল দু'টি কিন্তু কবে যে যুক্তি করে তারা পালিয়ে গেছে তা ঠিক জানিনা। মা-ও বছর ছয়েক হ'ল মাথায় হাত রেখে কি সব বল্‌তে-বল্‌তে তাদের দলে ভিড়ে প'ড়েছেন—এরা আছে ভাল, কি বলুন? ঠিক এ জন্যেই কিন্তু সতীশের সঙ্গে আমার বেশী বন্ধুত্ব। বেচারী লেখে কি না, তাই সে সব মনে করে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়, আর আমি হতচ্ছাড়া,– বুকে জল আসা দূরের কথা শুকিয়েই ওঠে।

তাহার কথা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও অলকার চক্ষু ভিজিয়া উঠিল—ইহারও মা নাই, কেহ নাই। মনের দুঃখকে সে কেমন করিয়া না জানি চাপিয়া রাখিয়া মুখে হাসি ছড়াইয়া বেড়ায়। ইহার সম্মুখে চক্ষের জলও ফেলা যায় না; আস্তে আস্তে সে বলিল, আমি আপনার দিদি হতে রাজী আছি কিন্তু তার বদলে আপনিও হলেন আমার দাদা। কান্না থামাইলেও নিজের মনের ভাব সে ওই লোকটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে লুকাইয়া রাখিতে পারিল না।

প্রতুল বলিল, তা দাদা হতে রাজী আছি আমি, কিন্তু তাঁরা সব মারা গেছেন বলে দুঃখ করবার কি আছে, এমনি সব দিদিদের সহজভাবে চিনে নেবার জন্যেই না তারা আমাকে রেখে গেছেন। কিন্তু যাই স্নান করে নি, আপনিও রান্না শেষ করতে থাকুন।

আর কোন কথা না বলিয়া সে উপরে উঠিয়া গল। সে বাহির হইবামাত্র অলকা বুঝিতে পারিল, দুর্ভাগ্য তাহার চিরসঙ্গী আর ঠিক তেমনি দুর্ভাগাদের কাছেই কে যেন তাহাকে বার বার টানিয়া

আনিতেছে। তাহার সারা অন্তর মথিত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

উপরে আসিয়াই প্রতুল তন্দ্রামগ্ন সতীশকে জোরে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, ওঠ হে, চিন্তা আর ঘুম বড় বেশী করে তুলছ দেখছি—লেখা বুঝি আর আসে না। ওসব ফেলে দিয়ে একটা কপড় দাও দেখি বার করে স্নানটা সেরে আসি। আজ এইখানেই খাওয়া হবে কি না।

সতীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না বোধ হয়। অনেক প্রশ্নই সে আশা করিতেছিল এবং তাহাদেরই জবাব ভাবিতে ভাবিতে কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহা সে টেরও পায় নাই। বন্ধুদের সমস্ত কথা জানাইয়া তাহাদের সাহায্য চাহিবে ইহাই ঠিক করিয়া সতীশ বলিল, বস, নীচে একটি মেয়েকেও দেখে এসেছ নিশ্চয়।

দেখে এসেছি ? গল্প করে এলাম বল। প্রতুল হাসিয়া উঠিল।

'সে কিন্তু আমার স্ত্রী নয়'। সতীশ বলিল।

প্রতুল উত্তর করিল, সে তোমার স্ত্রী কি না, একথাও আমি বলিনি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য. কাপড় কি তোমার সব ফুরিয়ে গেছে নাকি ? কোন্ মেয়ে কার স্ত্রী নয, আর কার স্ত্রী, তা' আমাকে জানাবার দরকার কি এমন হ'লরে বাপু ?

'কিন্তু তোমার শোনা উচিত।'

'বেশ, ব'ল, কিন্তু এখন থাক্, খেয়ে দেয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়ার পর বললে মন দিয়ে শুনব'। না খেলে কি এসব দরকারী কাজে মন বসে ? বিশেষ করে ওই তরকারীটা যা হয়েছে—এখনও যেন মুখে লেগে রয়েছে'। এই কথা বলিয়া একটা ঢোক গিলিযা প্রতুল তাহার রসাস্বাদন করিবার ক্ষমতার সম্বন্ধে তাহাকে নিশ্চিন্ত করিয়া দিল।

সতীশ কোন কথা বলিবার সুযোগ পাইল না।

আহারে বসিয়া প্রতুল বলিল, কইহে রামহরি, আমার জন্য বেশী ক'রে রান্না করনি নাকি, কি মুস্কিল শেষকালে কি আধপেটা থাকতে হবে? সতীশ তোমার মনিবটি ত' পয়সা বাঁচাতে শিখেছে কম নয়।

রামহরি কাছে আসিয়া দাঁত বাহির করিয়া বলিল, আজ্ঞে কি করি বলুন, মা ব'ললেন ভদ্রলোকের ছেলের বেশী খেতে নেই শরীর খারাপ হবে যে।

মাথা তুলিয়া প্রতুল বলিল, তবেই এ-বুড়া বয়েসে মরেছ রামহরি, মা জুটিয়েছ, ব্যাস্, আর খাওয়া হবে না কোনদিন—অসুখের ভয় এবার বেড়ে যাবে। ও-সব বালাই আমি আগেই কাটিয়েছি—মা, দিদি এদের সবাইকে নোটিশ জারী ক'রে পৃথিবী ছাড়া ক'রেছি। হ্যা ভাল কথা, নূতন দিদিটি কোথায়, নিয়ে আসতে বল তার ভাগটাই তা'হলে।

রামহরি বলিল, মরবার পক্ষে বুড়ো বয়েসটাই ভাল বাবু আর সে সময় মা যদি জুটেই যায় ত' ভগবানকে দু'হাত তুলে ধন্যবাদ জানাতে এতটুকু ইতস্ততও করব না সেই শেষের দিন।

প্রতুলের মুখে হাসি খেলিয়া গেল, পাশের দিকে চাহিয়া অলকাকে দেখিতে পাইয়া সে বলিল, এ বাড়ীতে আসাই এবার বিপজ্জনক হ'য়ে উঠবে দেখছি, সবাই যেন এক একটা কথা-সাহিত্যিক, দেখবেন দিদি আপনিও ওদের দলে ভিড়ে গিয়ে এ বেচারার পথ বন্ধ ক'রে দেবেন না যেন।

হাসিয়া অলকা বলিল, না আমরা পাঠকদের দল, সবাই সাহিত্য ক'রলে পড়বে কে? দু'টো লিখেই অন্যান্য লেখকের চেয়ে নিজেকে বড় ব'লে মনে হয় কি না অনেকের—আর ঠিক এমনি করেই পাঠক যায় কমে—কারণ যাঁরা লেখক তাঁরা পড়তে চান না আজকাল।

সহজ হাসি হাসিয়া প্রতুল বলিল, কিন্তু খোঁচা দিয়ে কথা বললে চলবে না, বন্ধুবর আমার হঠাৎ সাহিত্যিক নন। কি বলছে কিন্তু ব'লবেই বা কি, রসাস্বাদনে যে রকম ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছ দেখছি আর কিছুই রাখবে না তুমি। আমাদের পর আরও দুজন বাকী আছে মনে রেখ।

সতীশও বোধ করি একটু খোঁচা দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল, আরে বল কেন, এ ক'দিন খেয়েছি যা একেবারে বাজে, আজ রামহরির রান্নাটা সত্যিই চমৎকার লাগছে। তুমি ত' খাও পেট আঁটে বলেই, আমার ত' আর তা নয়, ভাল যখন লাগছে তখন কথা বলার অবসর কই ?

রামহরি মাথা নাড়িয়া বলিল বল কি খোকাবাবু এ কদিন বাজে রান্না ক'রে খাইয়েছে কে ? আমাকে একবার ডেকে নিয়ে গেলে না কেন, ঘাড় ধরে তাকে বা'র ক'রে দিয়ে আমার মাকে রেখে আসতাম সেখানে—আজকের রান্না খেয়েই বুঝতে পারছ ত' তার হাত কেমন ?

সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই সতীশের চক্ষু অলকার মুখের উপর নিবদ্ধ হইল। অলকা চক্ষু সরাইয়া অন্য দিকে ফিরিয়া চাহিল কি একটা লইয়া আসিবার জন্যই বোধ করি তাড়াতাড়ি বাহিরে গেল !

প্রতুল বলিল, পারলে না সতীশ, নিজের আঘাত নিজের গায়েই ফিরে এল শেষ পর্য্যন্ত—যারা সত্যিকার গুণী তাদের গুণ নেই ব'লে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেই কি হয়।

তাহার শেষ কথাগুলি অলকার কানে আসিয়া পৌছিল। কিছুক্ষণ সে কোন কিছুই করিতে পারিল না, সমস্ত শক্তিই তাহার কে যেন নিঃশেষে হরণ করিয়া লইয়াছে, আগুনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কে যেন তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই তাহাকে

ধীরে ধীরে একদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—এ পথ তাহার নয়, কিন্তু নয় বলিলেই কি থামা যায়? সেই অজ্ঞাত শক্তিও যেন তাহার কোন কথাই কানে না তুলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করিয়াই নিজের খেয়ালের খেলা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আহার শেষ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া সতীশ বলিল, এবার অলকার কথা শুনিতে তোমার আপত্তি হবে না নিশ্চয়।

আরাম করিয়া শুইয়া পড়িয়া প্রতুল বলিল, পৃথিবীর কোন কিছুতেই আমার আপত্তি নেই, এই শুলাম—যা খুশী তোমার ব'লে যেতে পার কেবল চেঁচিও না, কারণ চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভাল রকম আসে না।

সতীশ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, একটু পরে ঘুমিও আমার কথা শেষ হতে খুব বেশী দেরী হবে না আর ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়, শোনা দরকার।

'বেশ বল, কিন্তু সহজ শাদা ভাবে বলা চাই।'

সতীশ সমস্ত কিছুই বলিয়া গেল, কেমন করিয়া মাঝে মাঝে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিত আবার আপনা হইতেই সমস্ত কিছু দূরে সরাইয়া দিয়া কেমন করিয়া সে তাহাকে আপনার করিয়া লইত—তাহার অসুখের কথা ওই মেয়েটির অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা কিছুই বাদ দিল না।—বলিতে বলিতে সে যেন নিজেকে হারাইয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই সে বর্ত্তমান হইতে সরিয়া গেল।

সে চুপ করিবামাত্র প্রতুল বলিল, আর কিছুই ব'লবার নেই ত'? এবার যদি আমি ঘুম দিতে চাই তোমার আপত্তি হবে না বোধ হয়? তোমার কথা শুনতে আমি আপত্তি করিনি সে কথা মনে থাকে যেন।

অবাক বিস্ময়ে সতীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ইহা সে আশা করে নাই—সমস্ত কিছু শুনিয়া কোন কিছু না বলিয়া অন্তত বার কতক

ছি ছি না করিয়া যে সে এমনি করিয়াই ঘুমাইতে চাহিবে তাহা সে ভাবিয়াও পায় নাই। প্রতুলকে সে জানিত, সে যে উপহাস করিবে না তাহাও নিশ্চয়রূপেই তাহার জানা ছিল, কিন্তু সে যে এমনও হইতে পারে তাহা সে কোনদিনও ভাবে নাই।

তাহার বিস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া প্রতুল হাসিয়া বলিল, তুমি ব'সে ব'সে ভাবতে থাক কিন্তু চারটের সময় আমাকে জাগিয়ে দিও। আজ আমার ছুটি, কিন্তু তাই ব'লে চা-টা বাদ দিতে চাই না—দিদিকে ব'লে রেখ'।

প্রতুল পাশ ফিরিয়া শুইল—সতীশ ঠিক তেমনিভাবেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। তাহার কাছে আরও অনেকে আসে, তাহাদের সবাইকে সে সত্য কথা জানাইবে, প্রতুলের মত হয়ত কেহ কেহ কোন প্রশ্নই না করিয়া সহজ হইয়া থাকিবে কেহ বা প্রশ্ন তুলিয়া চোখ মুখের নানা ভঙ্গী করিয়া জানাইয়া দিবে যে ইহা ভাল হয় নাই, এমন তাহারা আশা করে নাই, আবার কেহ কেহ হয়ত' তাহাকে তিরস্কার করিয়া তাহার সমস্ত সংস্রবই কাটাইয়া যাইবে। কিন্তু কোন উপায়ই নাই—যাহা সত্য তাহা প্রকাশ করিতেই হইবে। যাহারা তাহাকে সমর্থন করিবে না তাহাদেরই বা কি বলিবার থাকিতে পারে, যুক্তির কোন মানেই ত' তাহাদের কাছে থাকিবে না, এতদিনকার সমস্ত বিশ্বাসই তাহারা মুহূর্ত্তে হারাইয়া ফেলিবে আর একটি বিশ্বাসের কাছে। সতীশের মন নানা চিন্তায় ডুবিয়া গেল—তন্দ্রাচ্ছন্নের মত চক্ষু বুজিয়া সে পড়িয়া রহিল।

চারিটা বাজিবার মিনিট কয়েক পরেই কি একটা শব্দে প্রতুলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তেমনিভাবে পড়িয়া থাকিয়াই সে বলিয়া উঠিল, বাজ'ল ক'টা, থাক্‌গে দরকারই বা কি।

হাসিয়া ফেলিয়া অলকা বলিল, থাকলে ত' চলবে না দাদা, চারটে বেজে গেছে।

এতটুকু না নড়িয়া প্রতুল বলিল, ঘড়িটা নিতান্তই খারাপ দেখছি—ঘণ্টাখানেক মাত্র ঘুমিয়েছি, ফেলে দিন ওটা, টাকা দেবেন কিনে দেব এখন একটা।

হাসিমুখে অলকা বলিল, টাকা আমার নেই, আর দাদাকে টাকা দিয়ে অপমান করতেও নেই।—চা কিন্তু আমি এখনি নিয়ে আসব।

তাড়াতাড়ি প্রতুল উঠিয়া বসিয়া বলিল, খুব ভাল কথা, চারটে নিশ্চয় বেজেছে কিন্তু বন্ধুটি গেলেন কোথায়? একা একা চা খেলে আরাম হয় না।

অলকা বলিল তিনি বেরিয়েছেন, সন্ধ্যের সময় ফিরবেন—কোথায় নাকি বিশেষ দরকার আছে।

বিছনা হইতে নামিয়া প্রতুল বলিল, চা নিয়ে আসুন আমিও একটু জল দিয়ে আসি মুখে চোখে—আচ্ছা থাক আমি নীচেই যাচ্ছি, রান্নাঘরে ব'সেই চা খাওয়া যাবে।

প্রতুল নীচে নামিয়া গেল, অলকা তাহার বাকী কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এক পেয়ালা চা শেষ করিয়া পেয়ালাটা আগাইয়া দিয়া প্রতুল বলিল, ঠিক এই জন্যেই রান্নাঘরে ব'সে :চা খেতে ভালবাসি আমি, এক পেয়ালা ফুরলেই আবার পাওয়া যায়।

'যদি না দিই?' অলকা বলিল।

'এই মা-বাপ মরা ছেলেটিকে কি না দেওয়া উচিত?' প্রতুল হাসিয়া উঠিল।

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি একাই থাকেন?

প্রতুল বলিল. নিশ্চয়ই, একা চুপ ক'রে ব'সে থাকতে আমার খুব ভাল লাগে।

'আপনাকে দেখে ত' তা বোঝা যায় না।' অলকা বলিল।

'বোঝা যেতে দেবই বা কেন আমি।' প্রতুল উত্তর করিল।

আর বিশেষ কোন কথাই হইল না, নিঃশব্দে চা-পান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতুল বলিল, চলি আজ, নিজের ছোট্ট ঘরটার কথা মনে হ'চ্ছে এখন।

'কাল আবার আসবেন কিন্তু।'

চমৎকার হাসি হাসিয়া প্রতুল বলিল. তা ত' বলতে পারিনে দিদি। আমার ছোট্ট ঘরটার বাইরে আছে একটা বিরাট পৃথিবী, একবার ঘর থেকে বের হ'লেই নানা পথ চোখে পড়ে তাই এ পথ যদি ভুলই করি ত' ভাববার বা দুঃখ করবার কিছু নেই।

আর কোন কথা না বলিয়া এবং অলকাকেও কথা বলিবার এতটুকু সুযোগ না দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অলকার কেবলি মনে হইতে লাগিল এই যে কথাগুলি ওই লোকটা বলিয়া গেল তাহার যেন অনেক্ অর্থই হয় এবং সহজ অর্থ বলিয়া যাহা মনে হয় তাহা উহার সত্যিকার অর্থের কাছে নিতান্তই বাজে, একান্তই তুচ্ছ বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু স্পষ্ট করিয়া কিছুই ত' বোঝা গেল না!

রামহরি আসিয়া বলিল, এবেলার সমস্ত কাজই কিন্তু আমি করব মা, আর শুধু এবেলাই বা কেন, কোন বেলায়ই আর তোমাকে কাজ করতে দিতে পারব না আমি।

'কালো হয়ে গেলে আর আমাকে বুঝি মা ব'লে ডাকতে ইচ্ছে হবে না রামহরি?'

অপ্রস্তুত হইয়া রামহরি বলিল, কি যে বল তুমি, না, এই বুড়ো বয়েসে আমাকে কাশী যেতেই হবে দেখছি। খোকাবাবু, মা, সকলেই যেন এবার শত্রু হয়ে উঠছে আমার। তার চেয়ে এ বুড়োর দু' গালে দু'টো চড় কসিয়ে দাও না কেন।

হাসিয়া অলকা বলিল, বেশ তাই হবে রামহরি, আমি আর বিশেষ কোন কাজ না করে বসে থাকব। আর তোমায় হুকুম করব। তা তোমার খোকাবাবু বেরিয়েছেন, সন্ধ্যের সময় ফিরবেন, চা দিও যেন।

*　*　*　*　*

সেদিন সতীশ, অলকা ও প্রতুল উপরের ঘরে বসিয়া চা পান করিতেছিল।

একথা সেকথার পর সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মামা মামীর কোন কথাই ত' বলনি অলকা। তাঁদের খুঁজে বার করতে পারলেও হয়—তাদের কথা বল।

অলকা বলিল, তাঁদের সম্বন্ধে জানাবার এমন কিছুই নেই, অত্যন্ত সাধারণ গৃহস্থ যেমন হয় তাঁরাও ঠিক তেমনি। তবে মামা ছিলেন খুবই পণ্ডিত, সংস্কৃতও যেমন জানতেন তেমনি জানতেন ইংরাজী। কোন ধর্ম্মে তাঁর বিশ্বাস ছিল কি না তা' কেউ কোন দিন বুঝতে পারেন নি, পড়াতে তিনি খুব ভালবাসতেন—গাঁয়ের কয়েকটি ছেলেকে তিনি নিজের ইচ্ছায়ই পড়াতেন আর সেই সঙ্গেই পড়্তেন আমায়।—প্রথম প্রথম অনেকেই তাঁকে একঘরে করার চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ছেড়ে যেতে চাইত' না তাই সে চেষ্টা সফল হয়নি। আমি ছিলাম তাঁর প্রিয় পাত্রী, অনেক সময় আমার কাছে তিনি যা বলতেন, তাতে মনে হ'ত বুঝি বা ঈশ্বরও তিনি মানেন না, কিন্তু কি যে মানেন তাও ঠিক স্পষ্ট হ'ত না কোনদিন। মামী করতেন পূজা, যত

রকম পূজা থাকতে পারে সবই ক'রতেন তিনি, তাঁকেও আমার সাহায্য ক'রতে হ'ত, আমি মামার মতই হয়ে উঠলুম, না মামীর মতটাই আমার কাছে বড় হয়ে উঠল, তা' ঠিক বুঝতেও পারতুম না, এখনও পারি না। মামা কিন্তু আমার কাজ দেখে হাসতেন, ব'লতেন দু'নৌকোয় পা দিয়ে কতদূর আর যাওয়া যাবে! অর্থ তখন সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলেও আজ পার কিন্তু এটা এখনও ভেবে পাইনি কোন নৌকো থেকে পা তুলে নিয়ে কোনটাতে উঠে ব'সব।

সতীশ চুপ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল, প্রতুল পেয়ালা খালি করিয়া আর একবার ভরিয়া দিবার জন্য সেটা অলকার দিকে আগাইয়া দিল।—

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, ক' পেয়ালা হ'ল আজ সারাদিনে? আর ক'বারই বা হবে! সহজভাবেই হাসিয়া প্রতুল বলিল, এই ত' পাঁচবার হ'চ্ছে, আর বার দুই হ'তে পারে—বেশী নয়।

'পেটের ভেতরটা যে শেষ হ'য়ে যাবে।'

প্রতুল জবাব দিল, তা' যেতে পারে কিন্তু বছর কুড়ির আগে নয়, হয়ত' বছর পঁচিশও হ'তে পারে, এর বেশী বাঁচবার ইচ্ছে আমার নেই, মা হয়ত' আরও আগে টেনে নেবার ব্যবস্থাই ক'রছেন।

সতীশ বলিল, ও যা' ক'রতে চায় তার বিরুদ্ধতা ক'রতে নেই অলকা—বিরুদ্ধতা ক'রে আজও কেউ পারে নি, আর কোনদিনও কেউ পারবে না সে আমি জানি। সে একটা বন্যার খবর আমার জানা আছে, আমিও গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার জন্য।

প্রতুল বলিয়া উঠিল, আঃ বন্যার চেয়ে চা অনেক ভাল, সত্যি ভারী রাগ হ'চ্ছে দিদি শুধু চা-ই দিতে হয় বুঝি সে-সব জিনিষগুলি গেল কোথায়!

হাসিয়া ফেলিয়া অলকা বলিল, নিজের পেটটা একবার খুঁজে দেখলেই সে-সব পাবেন কিন্তু। 'আমার পেটে! তা' হবে, কিন্তু বাইরে কি আর কিছু নেই!'

সতীশ বলিল, তর্ক ক'রে লাভ নেই কিছু এনে দাও ওকে।

অলকা বলিল, না, এখন আমি উঠতে পারব না। বাজে কথায় চাপা দেবার চেষ্টা না ক'রে চুপ ক'রে থাকুন একটু, নীচে গিয়ে লুচি ভেজে দেব' তা'হলে।

আর কোন কিছু বলিবার সুবিধা না পাইয়া প্রতুল চুপ করিয়াই রহিল।

সতীশ বলিয়া চলিল, নৌকায় ক'রে ঘুরে বেড়াতুম আমরা, আমি ও আর একটা ছেলে,—ওকে সে দাদা ব'লেই ডাকত' নাম ছিল তার সুরেশ। একদিন রাত্রে বোধ হয় তখন চারটে হবে হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল কিসের চীৎকারে। প্রথমটা কেউ কিছু বুঝতে পারলুম না। একটু চুপ ক'রে থেকে কথা কইলে প্রতুল, বললে, দূরে কোথাও উঁচু কোন জায়গা আছে নিশ্চয় আর তার ওপর মানুষ আছে, আজ ক'দিন মাত্র জল বেড়ে গেছে বটে, কিন্তু এমনি উঁচু জায়গা থাকা অশ্চর্য্য নয়। আজই ওধারে যাওয়া দরকার কিন্তু তা ত' হবে না সুরেশ, কাল সকালেই যে আমাদের ওই চীৎকার যেদিক থেকে আস্‌ছে তার উল্টো দিকে যেতে হবে। তবে এদিকেও যাওয়া দরকার একবার, হয়ত দু'তিনটে মানুষই আছে—তোমরা কাল সকালেই ওদিকে যেও আজ আমি চললুম এদিকে। ওদিককার কাজ শেষ ক'রে তোমরা আমার খোঁজ ক'র। এই কথা ব'লে অষুধের বাক্স থেকে গোটা দুই শিশি তুলে ভাল করে বেঁধে পকেটে ফেলে একটা ফ্লাস্কে জল ভরে পিঠের সঙ্গে ভাল করে বেঁধে নিয়ে সে প্রস্তুত হয়ে নিল।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি সাঁতার কেটে যেতে চাও নাকি, ও উত্তর না দিয়ে শুধু হেসে উঠল। সুরেশ এক বার বললে, কিন্তু প্রতুলদা? —ও তার দিকে একবার ফিরে চাইলে—সুরেশের মাথা নীচু হ'য়ে গেল। আমি অবাক হ'য়ে গেলুম, কি সে শক্তি যা এমন ক'রে মানুষের মাথা হেট করিয়ে দিতে পারে? আজও আমি ভেবে পাইনে এই প্রতুল আর সেই প্রতুল এক হয় কি ক'রে?'

আর থাকিতে না পারিয়া প্রতুল বলিয়া উঠিল, খুব ভাব সতীশ, প্রাণপণ ভাববার চেষ্টা কর আমি ওদিকে রামগরিকে খুঁজি, সেই আমার বন্ধু, পেটটা যেন একেবারেই খালি হ'য়ে গেছে।

প্রতুল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তাহার গমন পথের দিকে চুপ করিয়া অলকা চাহিয়া রহিল, সে বাহির হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দুই চক্ষু আপনা হইতেই একবার বুজিয়া আসিল, বুক কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল, চক্ষু ফিরাইয়া সতীশের দিকে চাহিয়া সে বলিল, তারপর?

সতীশ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, অনেকদিন আগেকার সেই বন্যার দৃশ্য যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে তখন ভাসিয়া উঠিতেছিল, তাহার সমস্ত বীভৎসতা, সমস্ত সৌন্দর্য্য লইয়া।

অধীর হইয়া অলকা বলিল, তারপর?

সতীশের চমক ভাঙ্গিয়া গেল, অলকার মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত কিছুই যেন তাহার মনে পড়িয়া গেল, ধীরে ধীরে সে বলিতে লাগিল, আর কোন কথা না ব'লেই প্রতুল জলে লাফিয়ে পড়ল। পরের দিন আমাদের কাজ শেষ ক'রেই আমরা তার খোঁজ ক'রতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু তিন দিন তার কোন খোঁজই পেলুম না। সুরেশের সেই বিষাদমাখা মুখ, সেই করুণ চোখের দৃষ্টি আজও আমি ভুলতে পারি

নি—তিনটি রাত তাকে আমি নিতান্ত ছোট ছেলের মতই কাঁদতে দেখেছি, বাপ মায়ের মৃত্যুর সময়েও বোধ হয় এমনি ক'রে কেউ কোনদিন কাঁদে না। চার দিনের দিন তাকে আমরা পাই একটা বড় গাছের ওপর। গাছের ডালে নিজেকে ভাল করে বেঁধে সে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুম দিচ্ছিল, উৎফুল্ল সুরেশের চীৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল, একটু হেসে সে নেমে এল নৌকার ওপর।

সুরেশের সে কি আনন্দ। তার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি বা একটা রাজ্যই সে জয় ক'রে নিয়েছে। তারই প্রশ্নের উত্তরে প্রতুল ব'ললো, ঘণ্টা চারেক সাঁতার কেটে সে ভেসে আসা একটা বাড়ীর চালা দেখতে পায়, তারই ওপর শুয়ে ছিল দুটি লোক, অনাহারে তারা খুবই কাতর হ'য়ে পড়েছিল, বন্যার জল খেয়ে কলেরা ডেকে আনতেও দেরী করে নি তারা—অষুধে কি আর কিছু হয়, একটা ত' এমনিই শেষ হ'য়ে গেল। আর একটা ছিল বেঁচে কিন্তু তারও দিন শেষ হ'য়ে এসেছিল, দুদিন বাদে হঠাৎ চালাটা কেঁপে উঠেই ফেটে গেল, আস্তে আস্তে সেটা গেল ডুবে।—কতক্ষণ আর একটা লোককে নিয়ে সাঁতার কাটা চলে? তারপর ওই গাছটাই হ'ল আশ্রয়।

"আমি বললুম কিন্তু নৌকো নিয়ে গেলে হয়ত ওদের বাঁচান যে'ত। সুরেশ কিন্তু ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, তা হয় না সতীশবাবু, প্রতুলদার কাজে কোন গলদই থাকতে পারে না। হয়ত' সুরেশের কথাই সত্যি, সেই বছর আঠারর ছেলেটার চোখে সে কি জ্বলন্ত বিশ্বাস সেদিন দেখেছিলুম, অমনি বিশ্বাস যে কি ক'রে হয় তা আজও আমি ভেবে পাইনি।"—

অলকা অবাক বিস্ময়ে সতীশের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। বন্ধুর কথায় তাহার চক্ষের উজ্জ্বল দৃষ্টি তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

বিশ্বাসও ঠিক এমনি করিয়াই কোন এক অজ্ঞাতসারে আসিয়া মানুষকে অধিকার করিয়া বসে, আর একবার অধিকার করিতে পারিলে কোন কিছুর সাহায্যেই তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখা যায় না। সমস্ত যুক্তি-তর্কই ব্যর্থ হইয়া যায়। বিশ্বাসীর উজ্জ্বল মুখ তেমনি উজ্জ্বল হইয়াই জ্বলিতে থাকে, কিন্তু কেমন করিয়া যে এমন হইতে পারে, তাহাও কেহ ভাবিয়া পায় না। বন্ধুর প্রশংসায় সতীশের মুখে এই যে সুন্দর মোহাচ্ছন্ন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সে কি কোনদিনও বুঝিতে পারিবে? কেহই বুঝিতে পারে না, ইহারা এমনি অজ্ঞাতে মুখের উপর খেলা করিয়া যায় আপন খুশীমত।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না। কোন এক অজ্ঞাত দেশের কি এক গভীর বিষয়ে তাহারা দুইজনেই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিজেদের হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

আস্তে আস্তে কতকটা অন্যমনস্কভাবেই সতীশ বলিল, এমনি আমার বন্ধু, এমান ওর সুন্দর মন। অপরকে আপনার করে নিতে এতটুকু দেরীও ওর হয় না, তাই কোন দিকে লক্ষ্য না করে অপরের জন্যে নিজের বিপদের কথা মনেও সে রাখতে পারে না, আর হয়ত ঠিক সে-কারণেই সুরেশ বিশ্বাস করে তার প্রতুলদা অভ্রান্ত—ভুল ব'লে কোন কিছুই যেন সে ভুলেও করতে পারে না।

অলকা মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

প্রতুল ঘরে প্রবেশ করিয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, রামহরিকে খুঁজে ত পেলুমই না, আর ভাঁড়ার ঘরেও পাকা কিছু নেই। নূতন আদব-কায়দায় সবই বদলেছে দেখছি, কিন্তু আমার একটা ব্যবস্থা হ'ক।

অলকা তাহার মুখের দিকে চাহিল। এই সেই লোক যে মায়ের মৃত্যুকেও নিতান্ত সাধারণভাবে উড়াইয়া দেয়—আবার বহুদূর হইতে

ভাসিয়া আসা কাতর ক্রন্দনে অস্থির হইয়া নিতান্ত পাগলের মতই জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ইহাদের তুলনা নাই, কোন বাঁধা-ধরা পথ দিয়াও ইহাদের চালিত করা যায় না। যে পথ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে পথেই ইহারা চলিল না কেন, ইহাই ভাবিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরাও চলে না।

তাহাকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রতুল হাসিল, তারপর হাত নাড়িয়া হতাশ হইবার ভঙ্গিতে বলিল, কি মুস্কিল, মানুষ ত' বেশ চটপট্ বোবা হ'তে পারে দেখছি। আমিই কথা বলি। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ চক্ষু তুলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ, বিয়ে আপনার হয়েছে, কিন্তু কি ক'রে হ'ল?

এ প্রশ্নের কোন অর্থই অলকা খুঁজিয়া পাইল না।

সতীশ যেন প্রশ্নটা শুনিয়াই জাগিয়া উঠিল, বলিল, হ্যাঁ এটা জানা দরকার—তবে প্রশ্নটা ঠিকভাবে করা হয় নি। যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে অলকা সে তোমাদের দেশের লোক ত নয়ই, কাছাকাছিরও নয়—তার নামটাই শুধু জান, কিন্তু সে তোমাদের ওখানে গেলই বা কি ক'রে তা বুঝলুম না আর হঠাৎ বিয়েই বা হ'ল কি ক'রে তাও বুঝতে পারলুম না। ব্যাপারটা যতটা সম্ভব আমাদের জানা দরকার।

হাসিয়া প্রতুল বলিল, আরে আমার প্রশ্নও ত' তাই, কিন্তু কেমন এক কথায় সেরে দিয়েছিলুম বলত? তুমি সাহিত্যিক কিনা খানিকটা বাজে কথা বলা ত চাই, ইচ্ছে হয় আরও কয়েকটা বলতে পার কিন্তু আসলে সবই এক।

অলকা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর একটা গভীর নিশ্বাস চাপিয়া বলিল, আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকতেন নিবাবরণ-দা। কলকাতায় অনেকদিন তিনি পড়াশুনা করেছেন জানতুম, পড়াশুনা শেষ ক'রেই তিনি দেশে ফিরে যান। গাঁয়ের কোন লোকেরই তাঁর সম্বন্ধে

ভাল ধারণা ছিল না। পড়তে গিয়ে তিনি নাকি এমন অনেক কিছু ক'রেছিলেন যা গাঁয়ের কোন লোকই ভাল চোখে দেখত' না। মামা কিন্তু অতশত বুঝতেন না, কারও সঙ্গেই তাঁর বিবাদ ছিল না—সবারই মত তাঁর সঙ্গেও তিনি অবাধে মিশতেন। আমাদের বাড়ীতে তাঁর আসা-যাওয়াও সেই সূত্রে কম ছিল না। মামীমা কিন্তু সন্দেহ করতেন, আমাকে বারণ করতেন কাছে যেতে। আমি কিছুই গ্রাহ্য করতুম না। নিবারণ-দা কলকাতায় পড়াশুনা করেছেন, কতদিন তাঁর কাছে সেসব গল্প শুনেছি, কলকাতার কথা শুনতে তখন খুবই ভাল লাগত আমার। সেই লোকই হঠাৎ কয়েকদিন আর আমাদের বাড়ী এলেন না। আমি সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছিলুম মামীমা স্মরণ করিয়ে দিতেন আমার বয়সের কথা আর মামা দিতেন সবকিছু হেসে উড়িয়ে, বলতেন—ও-সব মনে রাখতে নেই, নিতান্ত ছোটর মতই এই পৃথিবীটাকে জানবার আগ্রহ রাখতে হয়, মন ত' ভাবেই, তাকে জোর ক'রে সেই ভাবনার দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে লাভ কি ?

'আরও কয়েকদিন পর মামা এসে বললেন, নিবারণের শক্ত অসুখ হয়েছে দেখে এলুম, অন্ধকারে একলা পড়ে আছে বেচারা। এক বন্ধুকে আসতে লিখেছে, তার বিশেষ বন্ধু, হয়ত বা আসতেও পারে। তবে কলেজের বন্ধুত্ব ভবিষ্যতেও থাকে কিনা বলতে পারি না। তা তুমি একবার বিকেলের দিকে দেখে এস অলকা—আলো জ্বালবারও ওর কেউ নেই।'

'মামীমা বললেন, তাই বলে ওকেই আলো জ্বালতে যেতে হবে নাকি ? সমস্ত গাঁ যাকে পছন্দ করে না তাকে ত বাড়ীতে নিয়ে এসে তুললে মাথায়, এবার পাঠাচ্ছ ওকে একলা সেখানে। এমনি বুদ্ধি নিয়ে যে মানুষ কি ক'রে থাকে !'

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

'মামা হেসে বললেন, ভয় তোমার কিছু নেই, বুদ্ধি আমার কাঁচা সন্দেহ নেই, কিন্তু হালে ব'সেও নৌকো পাড়ে তুলবার ভরসা আজও তুমি দিতে পারলে না। তাই পাকা বুদ্ধি ছেড়ে কাঁচাটাই চেখে দেখ। মানুষ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, নিবারণও সেই মানুষ—সে একেবারেই শয্যাশায়ী, শুধু তার ঘরের বাতি জ্বেলে দিয়ে একটু খোঁজ খবর নিলে যদি মহাভারত অশুদ্ধই হয় ত' হ'ক না তা অশুদ্ধ। আমার ত' মনে হয় মহাভারতের বিধান যাবে তোমারই বিরুদ্ধে। মামা আর কিছু না বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন—মামীমা গম্ভীর হ'য়ে বললেন, যা খুশী কর গিয়ে তোমরা, কেন যে তোমাদের ভালর জন্যে আমার এত মাথা ব্যথা তা বুঝতেও পারি না। মামীমা মুখ কালো ক'রে সরে যান।'

'সন্ধ্যের সময় নিবারণ-দার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হই। ঘরের ভিতর সে যে কি অন্ধকার তা বলে বোঝান যায় না। প্রথমটা চোখে কিছুই দেখতে পাইনি, পরে নিবারণ-দার শায়িত দেহটা আবছাভাবে দেখতে পাই। ঘরের কোণ থেকে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে জ্বালিয়ে ফেলি। দেশলায়ের কাঠি জ্বালাবার শব্দে চৌকির ওপাশ থেকে কে একজন উঠে দাঁড়ালেন। আমি অবাক হ'য়ে সেদিকে চেয়েছিলুম। আরও একজন মানুষ যে এই ঘরের মধ্যেই আছেন অথবা থাকতে পারেন তা আমি প্রথমে ভাবতেও পারিনি। ভদ্রলোকটি আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সহজভাবেই বললেন, আলোটা এদিকে নিয়ে আসুন, ওষুধটা খাইয়ে দিই।'

'অবাক হ'য়ে গিয়েছিলুম, অন্ধকারে বসে বসে মানুষে ওষুধ ঠিক করে কেমন ক'রে? একটু কষ্ট করলেও যদি প্রয়োজনীয় জিনিষ মেলে তবে সেই কষ্টটুকু এরা করতে চায় না কেন। কোন্ কথা না ব'লে তাঁর কথা মত আলোটা সামনে নিয়ে যাই। নিবারণ-দা আর মাত্র দুটি দিন

বেঁচে ছিলেন। তাঁর কলেজ জীবনের প্রধানতম বন্ধুর সমস্ত সেবা, মামার ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ, আমার একান্ত আগ্রহ নিতান্ত তুচ্ছ হ'য়ে গেল। গাঁয়ের লোকের অভিসম্পাতের বোঝা মাথায় নিয়েই তাঁকে বিদায় নিতে হ'ল পৃথিবী থেকে। এবার নিবারণদার বন্ধু বিদায় চাইলেন, কিন্তু মামা তাঁকে থেকে যেতে ব'ললেন কিছুদিন—মামীমাও সহজে ছাড়তে রাজী হ'লেন না। তারপর আর কিছুই বলবার দরকার নেই বোধ হয়?'

দুই বন্ধু এতক্ষণ স্থির হইয়াই সমস্ত কথা শুনিতেছিল। অলকা থামিবামাত্রই প্রতুল বলিয়া উঠিল, না আর কিই-বা ব'লবার থাকতে পারে? তারপর সেই নিবারণ-দার বন্ধুই, ওঃ সেখানে যদি থাকতুম সে সময়ে, পেটটা কিন্তু সত্যি ভরতে পারতুম। আচ্ছা এখন সমস্ত কথাই থাক. ওই যে কি একটা ভেজে দেবার কথা ছিল নীচে গিয়ে—তাই হ'ক এবার, আমি নীচে যেতে প্রস্তুত।

সতীশ বলিল, না ব'লবার আরও কিছু আছে। বিয়ের প্রস্তাব তোমার মামা করেছিলেন, না করেছিলেন সেই ভদ্রলোকটি?

অলকা মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। এতক্ষণ অনেক কথাই সে বলিয়াছে, নিতান্ত বলিতে হইবে বলিয়াই বলিযাছে হয়ত। কিন্তু নিজের বিবাহের কথা দুইটি পুরুষের সম্মুখে এমনি করিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের মত কতক্ষণই বা বলা যায়? এ কথা বলিবার ইচ্ছা আর তাহার নাই—সে চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল।

প্রতুল বলিল, চটপট্ উত্তর দিয়ে দিন দিদি—ওর বাজে কথা নইলে বেড়ে যাবে আর ওদিকে আমাদের দেরী হ'য়ে যাবে। তারপর সতীশের দিকে ফিরিয়া সে বলিল, আর কোন প্রশ্নই কিন্তু তুমি করতে পা'রবে না সতীশ, যদি কর ত' মজা টের পাবে। ক্ষিধের সময় বন্ধু বলেও কিছু সুবিধে পাবে না তা বলে দিচ্ছি।

অতি লজ্জায়ও অলকা হাসিয়া ফেলিল, তাহার দিকে চাহিয়া চক্ষের দৃষ্টিতে নারীর অন্তরের সমস্ত স্নেহই উজাড় করিয়া দিয়া সে বলিল, মামীমাই প্রস্তাব করেন, তিনিও খুশী মনে বাড়ীতে চিঠি লিখে দেন, কিন্তু দিনকয়েক পরেই তাঁর চোখ মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করে, পরের দিনই তিনি আমাকে বিয়ে ক'রতে রাজী হন—তারপর আর কিছুই নেই। এবার আসুন আপনি নীচে। সমস্ত কথাই জোর করিয়া থামাইয়া দিয়া সে প্রতুলের দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িল।

প্রতুলও এতটুকু ইতস্তত না করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই ত' চাই, এই না হ'লে আর দিদি। তুমিও ব'সে থাক হে বন্ধু, ভাগ কিছু পাবেই। বাঙালী মেয়ে যখন তখন আর ইংরেজী মতে কাজ করতে পারবে না, এ ভরসা দিতে পারি।

তাহারা বাহির হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল জগদীশ। ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে চমকিয়া গেল। তাহারই অতি সন্নিকটে দাঁড়াইয়া ওই যে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মেয়েটী তাহাকে ত' সে পূর্ব্বে কোথাও দেখে নাই। তাহাকে পূর্ব্বে দেখে নাই ইহাও যেমন সত্য আজ এমনি সময় দেখিয়া আর কখনও যে তাহাকে ভুলিতে পারিবে না তাহাও ঠিক তেমনই সত্য বলিয়াও তাহার মনে হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত সে তাহার বিস্মিত দৃষ্টি দিয়া ওই মেয়েটির সমস্তই যেন শুষিয়া লইতে লাগিল। অলকার বুক একবার কাঁপিয়া উঠিল। এইবার হয়ত' তাহাকে প্রকৃত পরীক্ষায় পড়িতে হইবে, হয়ত' তাহার সমস্ত কিছু শুনিয়াও বিশ্বাস করিবার কোন হেতুই পাইবে না এই লোকটি। যেমন করিয়া সে চাহিয়া আছে তাহাতে তাহাকে সহজ বিশ্বাসী বলিয়া মনে হয় না, যাচাই করিয়া না দেখিয়া কোন কিছুই যে সে বিশ্বাস করিবে না ইহা অবধারিত সত্য

বলিয়াই তাহার মনে হইল। যে আসিয়াছে সে সতীশের মতও নয় প্রতুলের ধার ঘেঁসিয়াও সে যাইতে পারে না।

কিন্তু কযেক মুহূর্ত্ত মাত্র এমনিভাবে তাহারা দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহাদের দুইজনের মনে অনেক কথাই আসিল, অনেক কথাই মিলাইয়া গেল।

প্রতুল বলিল, কি হে জগদীশবাবু যে, বড় বেকায়দা সময়ে—ভাগ একটা বেড়ে গেল দেখছি, আপনাকে দেখলেই মনে হয় যেন আপনি গন্ধ শুকেও অনেক কিছু টের পান। সে একটু জোরেই হাসিযা উঠিল।

জগদীশ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, কোনও রকমে একটু হাসিয়া বলিল, কি করি বলুন, মেসে ব'সে ব'সে কি আর ভাল লাগে? তাই এলুম সাহিত্যিকের কাছে, সময় খানিকটা বেশ কেটে যাবে।

তেমনিভাবে হাসিযাই প্রতুল বলিল, নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনি নিশ্চয় বুঝেছিলেন যে সতীশের হাতেও কোন কাজ নেই বেচারা হয়ত' বেঘোরে ঘুমুচ্ছে—বেশ, বেশ। কিন্তু আমি চলি। চলুন দিদি। অলকা যেদিকে দাঁড়াইয়াছিল সেইদিকে চাহিয়া প্রতুল আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। তাহাদের কথা বলিবার অবসরে সে যে বাহির হইয়া গিযাছে তাহা বুঝিতে তাহার মুহূর্ত্ত মাত্রও দেরী হইল না। দ্রুত পদে সেও বাহির হইয়া গেল।

সতীশ বলিল, এস হে, ওর বাজে কথায় কান দাও কেন? এতদিন ধ'রে ওকে দেখে এসেও আজ ওরই কথায় তোমাকে লজ্জা পেতে দেখে আমিও আশ্চর্য্য হ'যে গেছি।

নিতান্তই সহজভাবে হাসিয়া প্রতুলের প্রত্যেক কথাকেই যেন একান্ত সহজভাবে উড়াইয়া দিয়া জগদীশ বলিল, না, ওর কথা আমি আমলেও আনি না। পৃথিবীতে অনেক রকম মানুষই আছে। এই আমাদের

মেসেই আমার পাশের বিছানাতেই ছিলেন এক ভদ্রলোক, তাঁর কাজ ছিল শুধু চিন্তা করা। মানুষে কি যে এত' ভাবতে পারে তা' আমি বুঝতেও পারি না। একদিন তাকে বেড়াতে নিয়ে গেলুম, এই ভিক্টোরিয়া হলের ওদিকে, তা তিনি গেলেন পালিয়ে—বাইরের হাওয়া না কি তাঁকে পাগল ক'রে দেয়। আমি অবাক্ হ'য়ে যাই, বলে কি এ? মেসে ফিরে এসে শুনি তিনি দেশে পালিয়েছেন পাছে আমি আবার তাঁকে বাইরের জগতের মধ্যে নিয়ে যাই। এরা সব পাগল। পৃথিবীটা যেন একটা পাগলা-গারদ, আমরাই দু'চারটে যা ছিট্‌কে বেরিয়ে গেছি।

সতীশ হাসিয়া বলিল, সে কথা সত্যিই জগদীশ, তোমার একথাটা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কিন্তু যাই বল এ পাগলগুলোরও প্রয়োজন বড় কম নয়—এরা আছে ব'লেই বেঁচে আছে সাহিত্য, বেঁচে আছে মানুষ। ভগবানের দস্তুর মত বুদ্ধি আছে একথা স্বীকার ক'রতেই হবে।

'ভগবানের বুদ্ধি নেই ব'লেই মনে হচ্ছিল না কি?'

সতীশ বলিল, নিশ্চয়ই, ভগবানও যে ওই পাগলা-গারদের একজন আসামী, হয়ত' বা বড় আসামীই। এমনি ক'রেই সে ঘটনাগুলি সাজিয়ে রেখেছে যে মনে হয় যেন একটা উপন্যাস। হয় সে পাগল নয়ত' বা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। কখন কার ঘাড়ে যে কে চেপে ব'সবে, বিয়োগান্ত হবে না সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবার ব্যবস্থা হবে তা' যেন ধারণাও করা যায় না একটু আগেও। এই ধর না আমারই কথা, কেমন ক'রে যে এমনি ব্যাপার ঘটে গেল তা' আমি বুঝতেও পারিনি, আর ব্যাপারটা ঘটবার এক মুহূর্ত্ত আগেও কিছু টের পাইনি, এ যেন হঠাৎ ট্রেণের গতি পরিবর্ত্তনে আকস্মিক ধাক্কা, তাল সামলান একেবারেই অসম্ভব।

জগদীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। অল্প কয়দিনের মধ্যে উহার এমন কি ঘটিয়া গেল যাহা ট্রেনের

আকস্মিক ধাক্কার মতই তাল সামলান অসম্ভব? হয়ত' ওই মেয়েটিই তাহার আসল কারণ, হয়ত' উহারই জন্য আজ সতীশকে দিক্ ভুল করিতে হইয়াছে, হয়ত' বা ভীষণ ধাক্কা লাগিয়া সে তাহার গতানুগতিক গতিপথ হইতে অচিরেই ছিটকাইয়া পড়িবে। সে তাহার মনের আগ্রহ চাপিয়া, বুকের দ্রুত স্পন্দন কোন রকমে বাহিরে প্রকাশ করিতে না দিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সতীশও একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল, একটু ইতস্তত করিয়া সে ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনাই ব্যক্ত করিল।

সতীশের ব্যক্তব্য শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জগদীশের মুখের উপর দিয়া একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। এ কিসের চমক, হাসির না বিদ্রুপের তাহা দেখিবার মত খেয়াল সতীশের ছিল না, বিশেষভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেও কেহ বুঝিতে পারিত কি না সন্দেহ।

ধীরে ধীরে মুখ চোখের ভাব গম্ভীর করিয়া জগদীশ বলিল, ব্যাপারটা ত' খুব ভাল নয়। এতদিন তোমরা একসঙ্গে ছিলে—সাধারণ মানুষে তোমাদের বিশ্বাস ক'রবে কি না কে জানে? তারপর ওর স্বামীর খোঁজও যদি পাওয়া যায় ত' সে কি তাকে ফিরিয়ে নিতে রাজী হবে?

অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইয়া সতীশ বলিল, রাজী হবেই বা না কেন? ও ত' কোন দোষই করে নি।

নিতান্ত চিন্তিতভাবেই জগদীশ বলিল, সে আমি না হয় বিশ্বাস করি, কিন্তু জগতের সব লোকই ত' এক নয়। দোষ ও করেনি একথা কি সবাই স্বীকার ক'রবে? হয়ত' অনেকে ব'লবে যে দোষ ও ক'রেছে তার চেয়ে বড় দোষ মেয়েদের আর হয় না। আমি তোমাকে যেমন চিনি তেমন ত' আর সকলে চেনে না। বিশেষ করে সাহিত্যিকদের এদিক দিয়ে দুর্ব্বল ব'লেই মনে করে অনেকে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল, তার মানে? কি ব'লতে চাও তুমি? তুমি নিশ্চয় ব'লতে চাও না যে—

ম্লান হাসি হাসিয়া, চোখে মুখে করুণতা ফুটাইয়া জগদীশ বলিল, হ্যাঁ, মাপ ক'র বন্ধু, আমি তাই ব'লতে চাই—কিন্তু এ আমার কথা নয়, যাকে একটু আগে দেখেছি এখানে তাকে অবিশ্বাস ক'রতে চাই না, তোমাকে ত করি-ই না। কিন্তু ভয় অন্য সবাইকে, হয়ত' ওই প্রতুলও।—

অন্যমনস্কভাবে সতীশ বলিল, না প্রতুল সব জানে ওকে বিশ্বাস ক'রতে এতটুকু দ্বিধা করাও চলে না, ও মনুষ্য জগতের বাইরে।

একটা চক্ষু কুঁচকাইয়া জগদীশ বলিল, কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল বটে, কিন্তু একটা কথা সতীশ, হ্যাঁ কথাটা প্রয়োজনীয়, দেখ' ওই প্রতুলের জন্যে যেন তোমার সম্মানের হানি না হয়। অবশ্য তুমি সবই বুঝবে, তবু জানিয়ে রাখা ভাল পরে যেন দোষের ভাগী হ'তে না হয় আমায়। বন্ধুর কর্ত্তব্য একটু কঠিন হ'লেও তা' ক'রতে আমার আপত্তি নেই তা' বোধ হয় তুমি জান।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল, না প্রতুলকে আমি বিশ্বাস করি, আমার কোন অনিষ্টই সে কোন দিন ক'রবে না তা আমি জানি।

'সে ত' খুবই ভাল কথা, তবে ত' অনেক ভাবনাই চুকে গেল।' জগদীশ আস্তে আস্তে বলিল।

রামহরি আসিয়া তাহাদের দুইজনের সম্মুখে দুই প্লেট খাবার রাখিয়া বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

সতীশ বলিল, তোর মা কোথায় রে রামহরি?

রামহরি দাঁত বাহির করিয়া বলিল, তিনি প্রতুলবাবুর কাছে।

গম্ভীর মুখে সতীশ বলিল, এখানে তাদের আস্‌তে বল না।

তেমনিভাবে হাসিয়াই রামহরি বলিল, সেখান থেকে কি আসবার জো আছে মা'র। প্রতুলবাবু বললেন, রান্নাঘরে বসে খেতেই ভাল লাগে—গরম গরমও হয় আর একটু বেশীই পাওয়া যায়। সেখান থেকে বেরোবার পথও তার বন্ধ—দরজা আগলে ব'সে আছেন তিনি। মা'রও আসবার তেমন ইচ্ছে নেই। তোমরা ততক্ষণ খেয়ে নেও খোকাবাবু।

রামহরি আর কিছু না বলিয়া সতীশকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

জগদীশ এতক্ষণ সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া সমস্ত কিছুই শুনিতেছিল। রামহরি বাহির হইয়া গেলে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সে বলিল, ব্যাপার কিন্তু খুব ভাল নয়। তুমি সাহিত্যিক হ'য়েও কেন যে এসব দিকে নজর দাও না তা' ত' বুঝতে পারি না। সম্মানটা রক্ষা করবার চেষ্টা করা ত' উচিত, শেষ কালে কি তোমার বাড়ীতে।—

তাহার কথা শেষ হইতে পাইল না, জোর করিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া সতীশ বলিল, তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি জগদীশ; কিন্তু আমি নিজেকে বিশ্বাস ক'রতে না পারলেও প্রতুলকে বিশ্বাস ক'রতে পারি। সে ভয় আমি করি না, কিন্তু তবু ওদের এখানেই আসা উচিত ছিল, তোমার সঙ্গে অলকার আলাপ করিয়ে দিতেও ত' পারতুম।

হাত নাড়িয়া জগদীশ বলিল, না তার জন্যে ভাবনা কি। আমি ত' আর পালিয়ে যাচ্ছি না— রোজই আমি আসতে পারব' এখন, এক সময় আলাপ করিয়ে দিলেই চ'লবে। আলাপ ত' হবেই উনি যখন এখানে থাকবেনই তখন অসুবিধে আর কি। আমরা ত' সব সময়েই আসি তুমি না থাকলেও যাতে বিপদে প'ড়তে না হয় তার ব্যবস্থা আমরাই ক'রে নেব অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল প্রতুল, আসিয়াই সে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, আরে ব্যাপার কি সতীশ, সব খেতে পারনি বুঝি? তা তুমি পারবেও না জানতুম, অতগুলো দিতে বারণ করলুম তা কি মেয়েরা শোনে কখনও। আর আপনার কি হ'ল জগদীশবাবু? ও-হো বুঝেছি, আসছেন এক্ষুণি, আর একবার চা-খেতে ইচ্ছে হয়েছে কি না তাই একটু দেরী হ'চ্ছে—তা সব শুদ্ধু নিয়ে এসে প'ড়লেন ব'লে।

কথা শেষ করিয়াই জানলার সম্মুখে আগাইয়া গিয়া সে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, দিদি একটু শীগ্‌গির, এরা কিছুই খায়নি—নেহাৎ অভদ্রতা হ'য়েছে আমাদের। জগদীশবাবু নূতন লোক একটু অনুরোধ তাঁকে ক'রতে হবে বইকি। ও-সব না হয় থাক্ একবার এসে আগে অনুরোধ ক'রে যান তারপর গিয়ে নিয়ে এলেই চ'লবে।

জগদীশ কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া প্লেট হইতে একটা লুচি তুলিয়া লইয়া সমস্তটা একসঙ্গে তাহার ক্ষীণ দেহের মধ্যে ভরিয়া দিবার জন্য মুখের ভিতর পুরিয়া দিয়া কত কি বলিবার জন্য হাত ও মুখ নাড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার মুখে স্থানের নিতান্তই অভাব হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া কথা বাহির হইতে পারিল না, বাহির হইয়া আসিল একটা বিশ্রী শব্দ। তাহার অবস্থা দেখিয়া প্রতুল মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর হইতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, যা হ'ক আমার অনুরোধই যে রাখবেন তা' ভাবিনি, আমার নিজের সম্বন্ধে আজ থেকে একটা উঁচু ধারণা হ'ল।

কোন রকমে কিছুক্ষণ চেষ্টার পর মুখের জিনিষ ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া একটু জল খাইয়া জগদীশ বলিল, মোটেই নয়, অনুরোধ করার কোন দরকারই হয় না আমায়, এই ত' খেয়ে নিলুম অনুরোধ ক'রতে হ'ল কি? ও সব নিজেদের জন্যে তুলে রাখুন প্রতুলবাবু।

হাসি মুখে মাথা নাড়িয়া প্রতুল বলিল, ঠিক, এতটুকু অনুরোধ করতেও হয়নি আপনাকে, বুদ্ধিমান লোকেরা ঠিক আপনার মতই চটপট হাত চালায়, কিন্তু দেখবেন অমনি ক'রে বেশীক্ষণ চালাবেন না যেন—ডাক্তার তাহলে আমাকেই ডেকে আনতে হবে, কিন্তু এখন আমার পক্ষে বেশী হাঁটা মুস্কিল। তারপর তোমার ব্যাপার কি সতীশ, জগদীশবাবুর মত বুদ্ধির দৌড় দেখাবে, না বোকা সেজেই শেষ পর্য্যন্ত বসে থাকবে?

সতীশ বলিল, না খাবার ইচ্ছে আমার নেই, শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না সকাল থেকেই, আর বেশী অত্যাচার না করাই ভাল।

সহজভাবেই প্রতুল বলিল, হ্যাঁ, না খাওয়াই ভাল—বেশী অত্যাচার করা উচিত নয়। কিন্তু আমার পেটও যে ভরা। আর কথা না বাড়াইয়া প্লেটটা টানিযা লইয়া এক সঙ্গে দুইটা মিষ্টি মুখে পুরিযা দিয়া সে বলিল, এ সব না খেযে এক কাপ চা বরং খেযে ফেল সব ঠিক হ'যে যাবে, একেবারে আমার মত চাঙ্গা আর জগদীশবাবুর মত বুদ্ধিমান হ'য়ে যাবে তাহলে।

সতীশ হাত নাড়িয়া বলিল, থাম প্রতুল, মানুষকে খোঁচা দিতেই শিখেছ শুধু। একটু সহজ মানুষের মত বুদ্ধিবৃত্তিকে খুলে ধ'রতে শেখনি?

অত্যন্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রতুল বলিল, খোঁচা দিচ্ছি? তুমি কি পাগল হ'য়েছ না কি? প্রশংসা করছি বল! আচ্ছা সত্যি বলুন ত' জগদীশবাবু আপনার বুক ফুলে উঠ্ছে না আমার কথায়?

তাহার মুখের দিকে তাচ্ছিল্য ভরে চাহিয়া জগদীশ বলিল, বুক ত' আর সবারই এক রকম নয়, আপনার যাতে ফোলে আমারও যে তাতে ফুলবে এর কোন মানে আছে কি?

ঘাড় নাড়িয়া প্রতুল বলিল, ঠিক এই কথা আমিও ব'লতে চাই। আমার বুক ওতে ফুলে উঠত' ঠিকই, আপনার কিন্তু দমে যাচ্ছে—সে আমি ঠিকই বুঝেছি।

নিতান্ত অন্যমনস্কের মতই প্লেটটা হাতে তুলিয়া লইয়া সে আরও কিছু মুখের ভিতর চালাইয়া দিল। সতীশ আর কোন কথাই না বলিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল, জগদীশও যেন কোন কিছু গ্রাহ্য করে নাই এমনি ভাব দেখাইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল।

হঠাৎ দরজার দিকে চাহিয়া প্রতুল বলিয়া উঠিল, আমার কিছুই দোষ নেই দিদি, ও খেতে চাইল না, কিছুতেই না—আমারও ত' পেট ভরা কিন্তু তাই বলে নষ্ট করা—

সতীশ মুখ ফিরাইয়া অলকাকে দেখিতে পাইল, তাহার চোখে মুখে একটা তিরস্কারের ভাব তখনও লাগিয়াছিল—প্রতুলকে সে যেন তিরস্কার করিতে চায় কিন্তু কেন তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিযা জগদীশ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কি-ই যে করিবে সে তাহা ভাবিয়াও পাইল না।

এইবার প্রতুল হাসিয়া উঠিল, সে হাসি না শুনিলে বুঝিবার উপায় নাই কেমন করিয়া উহা এক মুহূর্ত্তেই মানুষের সমস্ত তিরস্কার, ক্রোধ গলাইয়া দিয়া তাহার মনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া নেয়। জগদীশের হাতের দিকে চাহিয়া সে বলিল, ওটা হাতেই র'য়ে গেল যে, একান্ত বুদ্ধিমানের মতই মুখে চালিয়ে দিয়ে গালটাকে একটু মিষ্টি ক'রে নিন জগদীশবাবু নইলে যা বেরোবে তা' মন থেকে মুছে ফেলতে আমারও হ'য়ত দিন কতক লাগবে।

হাতের জিনিষটাকে প্লেটের উপর ফেলিয়া দিয়া গ্লাসের মধ্যে হাত ডুবাইতেই খানিকটা জল উপছাইয়া পড়িয়া গেল। রুমাল দিয়া সেই

জল মুছিয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিবার কোন কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া নিতান্ত হতাশভাবেই জগদীশ আবার বসিয়া পড়িয়া সতীশের মুখের দিকে অসহায়ভাবে চাহিয়া রহিল।

সহজভাবেই অলকা বলিল, আপনি বসুন, ব্যস্ত হতে হবে না, আমি চা ঢেলে দিচ্ছি।

ঠোঁটে হাসি ফুটাইয়া জগদীশ বলিল, না ব্যস্ত নয়, তবে কি জানেন, এই কি যে বলব আমি ঠিক ভেবেই পাচ্ছি না বৌদি।

অলকার ললাট কুঞ্চিত হইল, কিন্তু কোন কথাই না বলিয়া সে চা ঢালিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

প্রতুল মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক ব'লেছেন জগদীশবাবু মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কি যে বলা যায় তাহ ঠিক ভেবে পাওয়া যায় না, বিশেষত যাদের একেবারেই অভ্যাস নেই তারা শুধু অপ্রস্তুতই হয়, কিন্তু আমি ওই ঠিক আপনার মতই বুদ্ধিমান। যারা অপরিচিত তারাই না আমাদের কাছে মেয়ে কিন্তু দিদি ত' আর সে-রকম মেয়ে হ'তে পারে না, সে ত দিদিই—মেয়ে হবে কেমন ক'রে। কি বলুন জগদীশবাবু। নিজের বুদ্ধির তারিফ করিয়া নিজে নিজেই সে হাসিয়া উঠিল।

অলকার দিকে বার বার চাহিয়া জগদীশ যেন আরও বেশী অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার বুকে কাহারা যেন তাণ্ডব সুরু করিয়া দিয়াছে, সে নৃত্য থামিবে কি না তাহা ভাবিয়া না পাইলেও সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছিল যে, অলকার সম্মুখে থাকিয়া তাহারই স্বহস্তে ঢালা চায়ের পেয়ালা হাতে তুলিয়া লইবার সময় বুকের সে দোলা তাহার হাতের কাপনের কাছে একান্তই তুচ্ছ হইয়া যাইবে।—সকলে পেয়ালা তুলিয়া লইবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যান্ত সে তাই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কত কি ভাবিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অলকা বলিল, ব'সে আছেন কেন আপনি? চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে এদিকে। প্রতুল হাসিয়া বলিল, ভারী মজা জগদীশবাবু, চা জিনিষটা একটু বেকায়দা ধরণের, ওই গরম চা রেখে দিন খানিক্ষণ, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে, কিন্তু শুধু ঠাণ্ডাটা রেখে দিন গরম আর হবে না কিছুতেই। অতএব বুদ্ধির খেলা দেখান আর একবার, কিন্তু মনে রাখবেন একসঙ্গে সবটা চালাবেন না যেন। ঠোঁট আর জিবের একটা বেজায় দোষ আছে—গরম জিনিষ তারা সহ্য ক'রতে পারে না, একেবারে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে বসে।

সকলের অলক্ষে অলকা একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—তাহার সমস্ত মুখ তখন প্রশান্ত হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া জগদীশ বলিল, আপনি যা জানেন আমি তার চেয়ে কম জানি না কিন্তু। বোঝাতে যদি হয় ত' ছোট ছেলেদের বোঝাবেন।

সহজভাবেই প্রতুল বলিল, আমার চেয়ে বেশী জানেন বলেই ত' মুস্কিল। চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া একবার হাসিয়াই প্রতুল গম্ভীর হইয়া গেল। সে যেন আর সেখানে নাই, সেই দলের মধ্যে থাকিয়াও সে যেন বহুদূরে সরিয়া গিয়া কাহাদের প্রতিটি কাজ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিতেছে। সে যাহা চাহিয়াছিল তাহা যেন করিবার চেষ্টা চলিয়াছে, ঠিক তাহার মনের মত করিয়া তাহা যেন কিছুতেই হইয়া উঠিতেছে না।

পেয়ালা খালি করিয়া জগদীশ বলিল, চল সতীশ, থিয়েটার দেখে আসা যাক্। কদিন ধ'রেই যাব ভাবছি, ভালই না কি হ'য়েছে—চল যাওয়া যাক্ আজই।

সতীশ খুশী হইয়া বলিল, সেই ভাল, সেখানে আমাদের কবিকেও ধ'রে নিয়ে যাওয়া যাবে—সেও অনেক দিন থেকেই ঝুঁকেছে ওটা দেখবার

জন্যে, কবি কাছে থাকলে সমস্তই কিন্তু ভারী সরস হ'য়ে ওঠে। চল অলকা, তুমিও চল আমাদের সঙ্গে।

সকলের দৃষ্টি বাঁচাইয়া অলকা প্রতুলকে ঠেলিয়া দিল।

প্রতুল যেন অকস্মাৎ মাটির পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিল, উঠিয়া পড়িয়া সমস্ত ঘরময় পায়চারী করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সে বলিল, সেই ভাল, তাই করা যাক্।

অলকার দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল, যাও তুমি প্রস্তুত হ'য়ে নাও, আমরা ঠিকই আছি, বেশী দেরী ক'র না কিন্তু।

অলকা প্রস্তুত হইয়া লইবার জন্য চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

ঘুরিতে ঘুরিতে প্রতুল হঠাৎ জানালার সম্মুখে গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন দেখিল, হয়ত' বা কিছু শুনিলও তারপর ঘুরিয়া অত্যন্ত সহজ ভাবেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না কাহাকেও কোন কথা বলিবারও যেন তাহার ছিল না। তাহার চলিবার পথে কেহ নাই, আছে শুধু সে আর তাহার সম্মুখে দিগন্ত প্রসারিত জনশূন্য পথ। যদি কোন পথিক অকস্মাৎ পথে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে সে মুখ ফিরাইয়া লয় না, পরিচয় করিয়া লইবার জন্যও থামিয়া থাকে না। বিশ্রাম যেন তাহার নাই অথচ এই কথাটাই সে প্রকাশ পাইতে দেয় না। এমনি করিয়াই কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়া অথচ এতটুকু অগ্রাহ্যও না করিয়া সে যেন তাহার চলিবার পথ করিয়া লইয়াছে—সকলেই তাহাকে ভালবাসে, সেও না বাসিয়া পারে না, অথচ ভালবাসার কোন অর্থই যেন তাহার কাছে নাই। সে অত্যন্ত সহজ হইয়াও যেন অবোধ্য, অত্যন্ত সরল হইলেও তাহাকে বুঝিবার কোন পথই যেন সে খোলা রাখে নাই। যেমন সহজ ভাবেই সে আসিয়া পড়ে তেমনি সহজ গতিতেই সে বাহির হইয়া যায়। ইহা লইয়া যে প্রশ্ন উঠিতে পারে,

মানুষের মনে যে ইহারই জন্য নানা দ্বন্দ্ব দেখা যাইতে পারে তাহা যেন সে জানেও না, ইহাকে কাছে ডাকিয়া যত্ন করিবারও উপায় নাই, যাও বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিবারও কোন পথ আছে বলিয়া মনে হয় না। অলকা কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, তাহাকে অনুসরণ করিবার শক্তিও তাহার ছিল না, ধীরে ধীরে সে আবার বসিয়া পড়িল।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জগদীশ বলিল, প্রতুলবাবু গেলেন কোথায়! হঠাৎ হ'লই বা কি তাঁর? মাথার গোলমাল নেই ত' কিছু!

ম্লান হাসি হাসিয়া সতীশ বলিল, না ওর মাথা আমাদের চেয়েও পরিষ্কার। গেল যে কোথায় তা জানি না, কিন্তু আজ আর আসবে না সে ঠিক—হয়ত আসবে না ও অনেক দিন। ঠিক এমনি ক'রেই আর একবার ও গিয়েছিল, কিন্তু ফিরেছিল তিন মাস পর। যেমন সহজ ভাবে ও যায় তেমনি সহজ ভাবে কোন দিনই ফেরে না।

জগদীশ বলিল, তা ত' বুঝলুম, কিন্তু আমাদের যাওয়াও কি তাই বলে থেমে থাকবে নাকি? প্রস্তুত হ'যে নিন বৌদি, একটু আগেই বেরোনো উচিত কি বল সতীশ, কবিকে আবার ধরা চাই ত'।

সতীশ মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া বলিল, তা নিশ্চয়, প্রতুলের আসা-যাওয়ার সঙ্গে তাল রাখবার চেষ্টা ক'রে কোন লাভই নেই। তুমি প্রস্তুত হ'যে নাও অলকা।

অলকা উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আজ আর যাওয়া হবে না আমার, আপনারা যান আপনাদের কবিকে নিয়ে। সে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না, সমস্ত প্রশ্ন ও কথাকে জোর করিয়া থামাইয়া দিয়া সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

সে বাহির হইয়া গেলেও সতীশ একটা কথা বলিতে পারিল না শুধু সম্মুখের দিকে অন্যমনস্কের মত চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের দিকে

জগদীশ কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, কি যেন একটু ভাবিল। কপালে তাহার এতটুকু কুঞ্চনও দেখা গেল না, যেন ইহা সে জানিত।—সতীশের অন্যমনস্কতাও যেন তাহার কাছে জল বাতাসের মতই সহজ—অঙ্ক কসিয়া সে যেন আরও অনেক কিছুই অতি সহজেই বলিয়া দিতে পারে। ঠোঁটের কোণে একটু বক্র হাসি হাসিয়া সে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলে সতীশ ?

অন্যমনস্কের মতই সতীশ বলিল, হুঁ।

ধীরে ধীরে হাত নাড়িয়া জগদীশ বলিল, তবু ভাল যে বুঝবার শক্তি তোমার হ'য়েছে। কিন্তু আমি বলি কি জান একটু শক্ত হও। যা তুমি পেয়েছ তা' তুমি ছাড়বে কেন বলত' ? কেন অপরকে দেবে তার তার ভাগ! আমি হ'লে কিন্তু—থাক, যাওয়া তাহলে আজ আর হ'লই না ?

অকস্মাৎ সতীশ যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল, সমস্ত শরীর একবার যেন তাহার কাঁপিয়া উঠিল—ক্রোধে অথবা অপমানে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। জগদীশের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁত দিয়া একবার ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, যাওয়া হবে নাই বা কেন ? আমি একা মানুষ কোন কিছুতেই আমার আসে যায় না। চল, আজ যেতেই হবে।

জগদীশের অনেকখানি উৎসাহই কমিয়া গিয়াছিল তথাপি সে অস্বীকার করিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনেক রাত্রে থিয়েটার দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াই সতীশ বিছানায় তাহার ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিল। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, হয়ত' কেহই জাগিয়া নাই, বৃদ্ধ রামহরি হয়ত' এই শীতে নিজে ঘরে বসিয়াই তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে নিজের অজ্ঞাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আর তাঁহারই পাশের ঘরে ওই যে মেয়েটি থাকে, সে কি কিছুই টের পায় নাই ? সে কি ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে অবজ্ঞা করিতেছে না ?

কিন্তু কেনই বা সে তাহার জন্য বসিয়া থাকিবে, কেনই বা সে তাহার জন্য তাহার স্নেহ মমতার এক কণাও খরচ করিতে আসিবে! সে ত' তাহার কেহই নয়—শুধু আশ্রয়প্রার্থী হিসাবেই সে আসিয়াছে তাহার সম্মুখে, তাহার বদলে প্রতিদান দিতে ত' সে আসে নাই, কোন দিন দিবেও না হয়ত'। একটা গভীর নিশ্বাস তাহার অলস ক্লান্ত দেহকে মুহূর্ত্তের জন্য সচেতন করিয়া দিল। তাহার কেহ নাই, অলকা তাহার নয়, তাহার জন্য ভাবিবার কথাও তাহার নহে। কখন কেমন করিয়া যে সে ধীরে ধীরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল তাহা জানিতেও পারিল না। আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর কাহার ডাকে সে সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠিল। কে যেন তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে। চক্ষু চাহিয়া সে অলকাকে চিনিতে পারিল। কিন্তু এ মূর্ত্তি সে আর কখনও দেখে নাই, সুন্দর আলুলায়িত কেশদাম তাহাকে বেষ্টন করিয়া মোহময় করিয়া করিয়া তুলিয়াছে, অমন সুন্দর চক্ষু সে যেন আর দেখে নাই—বিশ্বের মায়া-মমতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াই তাহাকে তখন মনে হইতেছিল। সে অবাক বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ক্ষণিকের জন্যও এ সৌন্দর্য্য সে যেন দৃষ্টির অগোচর রাখিতে চায় না। তাহাকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া অলকা লজ্জিত হইয়া পড়িল। বুকে কিসের যেন আঘাত পড়িতে লাগিল, নিজের অজ্ঞাতেই মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়া তাহাকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিল। সমস্ত পৃথিবীতে তখন আর কেহ জাগিয়া নাই, জাগিয়া রহিয়াছে শুধু দুইটি যুবক যুবতী, অতি নিকটে থাকিয়াও তাহারা পরস্পরের কেহই নয়—সুন্দর হইয়াও তাহারা সুন্দরের পূজারী হইতে পারে না।

কোনও রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অলকা বলিল উঠুন, খাবার এনেছি আপনার—দেরী করলে জুড়িয়ে যাবে সব।

সতীশের মোহ তখনও কাটে নাই, আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া সে বলিল, গরম খাবার তুমি এ সময় পেলে কোথায় অলকা ?

অলকা কোন কথা বলিল না, সুন্দর এক টুক্‌রা হাসি তাহার আরও সুন্দর মুখের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল।

অকস্মাৎ সতীশ যেন পাগল হইয়া উঠিল, আর থাকিতে না পারিয়া অলকার একটা হাত চাপ ধরিয়া তাহাকে কাছে আনিতে চাহিল। অলকার চোখে-মুখে একসঙ্গেই অনেক কিছু ফুটিয়া উঠিল। তাহার চক্ষে যে ভয় যে বিষাদের বিহ্ন ফুটিয়া উঠিল তাহা যেন সতীশকে সবলে আঘাত করিল। অলকার হাত ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া ছাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে দাঁড়াইয়া সে স্তব্ধ হইয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একি করিল সে ? এতটুকু সংযমও তাহার নাই, একথা রূঢ় সত্যের মত তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। একা নিস্তব্ধ রজনীতে অনাত্মীয় যুবতীকে সম্মুখে পাইলেই কি অমনি করিয়া নিজের সমস্ত সম্মান পদতলে দলিত পিষ্ট করিয়া ফেলিতে হয় ? যে তাহারই অসুখে সেবা করিয়া রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটাইয়া দিয়াছে, যে তাহারই আহারের জন্য অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিতে এতটুকু ইতস্ততও করে নাই, তাহাকে এমনি করিয়া অপমান করিবার সাহস তাহার হইল কি করিয়া ? কেমন করিয়া সে আবার উহারই নিকটে যাইবে, কেমন করিয়া সে তাহাকে তেমনি করিয়া সম্বোধন করিবে ? ও ঠিকই বুঝিয়াছিল, তাই বহুদিন পূর্ব্বেই তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল—কিন্তু তাহার নিজের স্পর্দ্ধার যেন সীমা নাই, সব কিছু অতিক্রম করিয়া নিজেকে বিরাট বলিয়া মনে হইলে মানুষের এমনি পতনই হইয়া থাকে। আর কোন কিছুই সে

ভাবিতে পারিল না, রেলিঙে মাথা রাখিয়া সে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। কতক্ষণ অমনি করিয়া সে পড়িয়াছিল তাহা সে জানে না, অকস্মাৎ আবার যেন কাহার ডাকে তাহার চমক ভাঙিল। চক্ষু না তুলিয়াও এবার সে বুঝিতে পারিল, কে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আস্তে আস্তে অলকা বলিল, এমনি করেই যদি আপনি সারারাত কাটিয়ে দিতে চান ত আমারও ত শুতে যাওয়া হবে না। অনেক কষ্ট করেই ওগুলা ভেজে এনেছি, গরম থাকতে থাকতেই বাকী কষ্টটা আপনাকে করতে হবে।

একবার চক্ষু তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়াই চক্ষু, নামাইয়া সতীশ বলিল, তুমি কি অলকা, তুমি কি মানুষ নও? এরই মধ্যে আমায় ক্ষমা করিলে কি করে? আজ আমার—।

ম্লান হাসি হাসিয়া অলকা বলিল, আমি মানুষ বলেই ত ক্ষমার প্রশ্ন ওঠেনি সতীশবাবু। আপনিও ত মানুষ—দেবতা হ'যে ত আর জন্মান নি, আর সে সাধও বোধ হয় আপনার নেই।

সতীশ বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, এতক্ষণের সমস্ত লজ্জাই যেন কেমন করিয়া সে সযত্নে মুছিয়া লইযাছে, আর এতটুকু দ্বিধাও তাহার নাই, এতটুকু চিন্তাও না।

তেমনি হাসি হাসিয়াই অলকা বলিল, অবাক্ হবার কিছু নেই এতে। মামা বলতেন, মানুষ কখনও দেবতা হয় না অলকা, চারটে পা আছে বলেই যেমন সে-সব জীবদের আমরা জন্তু বলে মনে করি, তেমনি দোষ আর গুণ আছে বলেই না আমরা মানুষ। ওই দোষ আর গুণ না মিশলে মানুষ সৃষ্টি হয় না—তাই ত নিবারণ-দার কাছেও কোন ভয় আমার ছিল না। এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমার মস্ত বড় বিপদে মানুষের মহান গুণ নিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন বলেই যেমন আপনাকে আমি

দেবতা বানিয়ে বসব না, ঠিক তেমনি আপনার কোন ত্রুটি আমার চোখে পড়েছে বলেই আমার কাছে আপনি কিছু পশু হয়ে যাবেন না। কিন্তু আর দেরী করবেন না আসুন, আমার এক্ষুণি ঘুম পাবে।

সতীশ কিছুই বলিতে পারিল না, হয়ত কোন কিছুই সে বুঝিতে পারিতেছিল না। ধীরে ধীরে সে অলকাকে অনুসরণ করিল।

আজ যেন অলকার যত্ন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার আহার শেষ হইলে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া মশারি ফেলিয়া ভাল করিয়া সে চারিদিকে গুঁজিয়া দিল। এক গ্লাস জল ভরিয়া টেবিলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিয়া সমস্ত উচ্ছিষ্ট তুলিয়া লইয়া মুহূর্ত্তের জন্য একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে খাটের দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর আলো নিভাইয়া দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

*   *   *   *   *

আরও কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। বন্ধুরা সকলেই আসে যায় কিন্তু প্রতুল সেই যে গিয়াছে আজিও আসে নাই, কবে আসিবে অথবা আসিবেই কি না তাহাও কেহ বলিতে পারে না—তাহারাও ভাবিয়া পায় না। অলকার একান্ত আগ্রহে সতীশ তাহার বাসায় গিয়া খোঁজ করিয়াছিল বটে কিন্তু নূতন কোন তথ্যই সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে নাই, তাহার একমাত্র ঘরটার দরজায় মস্ত একটা তালা ঝুলিয়া থাকিতেই সে দেখিয়া আসিয়াছে। ঘরের সমস্ত জানালাই বন্ধ, বাহির হইতে এতটুকু আলো প্রবেশের পথও সে রাখিয়া যায় নাই, সতীশের দৃষ্টি এবং অনুমানও তাই রুদ্ধ দরজায় ঘা খাইয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রতুলকে সে চেনে তাই তাহার কথা লইয়া আর বৃথা ভাবিয়া মরে না, কিন্তু অলকা তাহাকে ঠিক এমনি করিয়া ভুলিয়া থাকিতে পারে না। এই যে সতীশের বন্ধুদের আহারের জন্য রামহরি সমস্ত কিছুই সংগ্রহ করিয়া

দিতেছে, ওই যে আলমারীর মধ্যে আরও কত কি রহিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য সে দৃষ্টি মেলিয়া রাখিতে পারে না। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সতীশের সুন্দর গৃহটি সে সাগ্রহে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে তাহাকেই হারাইয়া সে কেমন করিয়া উহাদের সহিত মিশিয়া থাকিবে? নিশ্চিন্ত নীরবে সে যে কেমন করিয়া সমস্ত বন্ধনই উপেক্ষা করিয়া সরিয়া গেল তাহাও সে ভাবিয়া পায় না। তাহারই দাদা প্রতুল—তাহাকে ভুলিতে পারিবে না কখনও। অথচ দিদি বলিয়া যাহাকে ওই লোকটি কাছে টানিয়া লইল যাইবার সময় তাহাকে কি সে মূহূর্ত্তের জন্যও মনে রাখিতে পারিল না? তাহাকে ভুলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, কঠিন যাহারা তাহাদের মনে রাখিয়া লাভ কি অথচ ভুলিয়া যাওয়াও কি সহজ?

সেদিনও রোজকার মত সতীশের ঘরে বন্ধুদের সমাগম হইয়াছিল।

মহিম একটু গোঁড়া, পুরাতনের অনেক কিছুই লইয়া নূতনের কিছু কিছু ঘসিয়া মাজিয়া মিশাইয়া সে তাহার চলিবার পথ করিয়া লইয়াছে। সে যাহা করিয়াছে তাহার তুলনা মিলে না মিলিবেও না এই তাহার মত। বন্ধুরা তাই সহজে তাহাকে নিষ্কৃতি দেয় না, তাহার মত ও পথকে যতই তাহারা আক্রমণ করে ততই সে তাহা আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার মত ও পথের দেহে প্রাণ সঞ্চার করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠে। আজিও তাহাকে আক্রমণ করা হইয়াছে, একা কোনও মতে টিঁকিয়া থাকিবার জন্য সে তাহার তূণের চোখা চোখা কথাগুলি হাতড়াইয়া বাহির করিয়া শত্রুপক্ষকে কাবু করিবার জন্য নিক্ষেপ করিতেছিল।

অনেক কথার পর নিতাই হঠাৎ বলিল, আচ্ছা মহিম তোমার চমৎকার কয়েকটা মত আছে আর সেই মতের জোরে সুন্দর পীচ বাঁধানো কয়েকটা পথও ত' তুমি ক'রেছ—এখন বল দেখি আমাদের সাহিত্যেকের নবতম আবিষ্কারকে নিয়ে কি করা যায়?

মহিম তাহার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া বলিল। খোঁচা দিলে বটে, কিন্তু কি তুমি জানতে চাও আমার কাছে সেটাই ব'ললে না সোজা ক'রে।

নিতাই বলিল, বেশ তবে বুঝিয়েই ব'লছি, সতীশ হঠাৎ আবিষ্কার ক'রেছে অলকা দেবীকে—এখন তোমার মতে তাঁর কি করা উচিত।

সকলেই তাহার চমৎকার উপদেশ শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

সতীশ ধীরে ধীরে বলিল, এ প্রশ্ন আমিই করছি তোমাদের সকলকে, আমি অনেক ভেবেছি কিন্তু কোন উপায়ই ক'রতে পারিনি। কি ক'রে ওর আত্মীয়দের আমি খুঁজে বের ক'রতে পারি? তোমরা বেশ ক'রে ভেবে দেখ, এটা জানা আমার একান্ত প্রয়োজন।

জগদীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, সে ঠিক, অনেক দিন ভেবেও আমরা কোন পথ পাইনি—প্রতুলবাবুও সব কিছু জানেন কিন্তু তাঁর কথা না ভাবাই ভাল, এসব তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না। কিন্তু তোমাদের সবার মতটা জানা উচিত কারণ ভবিষ্যতে আমাদের একটা পথ ঠিক ক'রে নিতে হবে ত'?

নিতাই বলিল, তাই ত' মহিমের মত আমরা সব চেয়ে আগে জানতে চাই।

মহিম খানিকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিল, আগে নিয়ম ছিল এক বছর স্বামীর কোন খোঁজ না পেলে বিধবার মত জীবন-যাপন করা। আমি অবশ্য অতটা ক'রতে বলি না, তবে—।

তাহার কথা শেষ হইতে পারিল না, অনেকেই হাসিয়া উঠিল।

বিধান বলিল, তবে আধা বিধবার মত চালালেই যথেষ্ট আর এক বছরের যায়গায় বছর দুয়েক করা যেতে পারে, এই ত'?

মহিম আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, তাই ব'লে কি তুমি ব'লতে চাও এসবও ঠিক ? স্বামীর খোঁজ যার পাওয়া যাচ্ছে না, যে আছে একজন অপরিচিত লোকের কাছে তাকেও থাকতে হবে ঠিক ঘরের বৌয়ের মতই আনন্দিত হ'য়ে ?

'তবে কার মত মুখ ক'রে থাকবে ?' জগদীশ জিজ্ঞাসা করিল।

মহিম উত্তেজিত হইয়া বলিল, কার মত মুখ ক'রে থাকবে জানি না তবে হাসি তার চ'লবে না, চ'লবে না তার সাজ পোষাক আর অপরের মাঝে এসে বসা।

সতীশ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এত স্পষ্ট করিয়া সে ত' কোন দিনও নিজের মনের ভাব ব্যক্ত ক'রে নাই। ইহাই যদি তাহার মনের কথা হইয়া থাকে তাহা হইলে অলকাকে ত' সে কোন দিনই ভাল চক্ষে দেখিতে পারিবে না, কোন দিনই সৎ বলিয়া তাহাকে এতটুকুও শ্রদ্ধা করা দূরে থাকুক অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে অপমানই করিবে নিশ্চয়। এই যে আরও অনেকে বসিয়া আছে তাহাদের কাহারও কাহারও মনেও হয় ত' এমনি অনেক কিছুই লুকাইয়া আছে, হয় ত' অকস্মাৎ এমনি করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াই একদিন তাহাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইবে। কাহাকে ফেলিয়া যে কাহাকে বিশেষ করিয়া বিশ্বাস করা চলে তাহা সে ঠিক ভাবিয়াও পাইল না।

নিতাই বলিল, স্বামীকে সে ত' বুঝতেও পারেনি, অল্প কিছুক্ষণ তার সঙ্গে দেখা, হয়ত' একটা কথাও হয়নি, এক্ষেত্রে কি ক'রেই বা তোমার ব্যবস্থা লোকে মেনে নিতে পারবে ?

গম্ভীর হইয়া মহিম বলিল, কি ক'রে মেনে নিতে পারবে জানি না, কিন্তু মেনে নিতে হবে, নেওয়া উচিত এটুকুই জানি। পারিপার্শ্বিক

অবস্থা বদলের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মন বদলায়। স্বামীর অবর্ত্তমানেও যদি মেয়েরা ভেসে বেড়ায় তবে পতনের এতটুকু দেরীও হয় না।

জগদীশ বলিল, ওসব ছেলেবেলাকার কথা, নীতিবাগীশের অনেক উপদেশই আমরা জানি, কিন্তু সেই নীতির চেয়েও বড় মানুষ। তোমার কথার উত্তর দেওয়া সহজ হ'লেও সে সবগুলোকে উপেক্ষা করাই বোধ হয় আরও ভাল। হাসতে হবে কি না তা' জানবার দরকার আমাদের নেই, আমাদের শুধু জানা দরকার কি উপায় করা যায় এখন। তার সম্বন্ধে যদি কিছু পরামর্শ দিতে পার ত' দাও।

পরামর্শ দিতে বলা সহজ, দেওয়াও হয়ত' অনেক সময় সহজ কিন্তু তাই বলিয়া এক্ষেত্রে কেহই কোন কিছু বলিতে সাহস করিতেছিল না। মহিম তাহার কথা বলিয়াছে, অন্য সকলেই তাহার মতকে নিতান্ত বাজে বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে সত্য, কিন্তু সঠিক কোন পথও কেহ দেখাইতে পারে নাই। সতীশ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিল না, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা যাহা প্রয়োজন তাহা ত' কই কাহারও কাছে শুনা যাইতেছে না—কতকগুলি কথা শুনিয়া লাভ কি, অনেক কথাই সে নিজে কহিতে পারে, প্রয়োজন হইলে লিখিতেও পারে।

জগদীশের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, যদি কোন কিছুই কেউ না ব'লতে পার ত' ওকথা আর তুল না, ওসব আমার পক্ষে এখন ভুলে থাকাই ভাল।

মহিম তাহার দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, তার মানে তুমি ব'লতে চাও যে ওর স্বামার খোঁজ না পেলেও তোমার কাছেই থেকে যাবে? তা' কি ক'রে হ'তে পারে! পরস্ত্রীকে কি শেষ কালে—!

নিতাই হাসিয়া উঠিয়া বলিল, ভয় নেই, মহিম, পরস্ত্রীকে নিজের স্ত্রী সতীশ কোন দিনই ক'রবে না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তোমার আদর্শ রসাতলে যাবে না কিছুতেই।

হাসিয়া অজিত বলিল, সতীশ ত' আর মহিম নয় তাই ত' আমাদের আদর্শবাদীর এত ভয়। সাহিত্যিক সতীশ দরদী, তাই কোন মেয়ের দুঃখ দেখে যদি—কি বলহে মহিম এই ত' তোমার মহা ভাবনা, আমিও কিন্তু তোমার দলে। মুখটাকে অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া সে মহিমের দিকে চাহিয়া রহিল।

ধীরে ধীরে সতীশ বলিল, অলকাকে নিয়ে আর তামাসা ক'রতে দিতে চাইনা আমি। সে আমার আশ্রয়ে আছে বটে তবু নিজের মর্য্যাদা সে বোঝে, কোন কাজে অথবা কথায়ও তার অপমান হ'তে দিতে আমি পারব' না। তোমরা যদি পার ত' অন্য কথা বল। সতীশের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিল তাহা দেখিয়া সকলেই তাহার মনের সত্যকার কথা বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া রহিল। এ কথা লইয়া আর আলোচনা করিয়াও কোন ফল হইবে না, হইবে শুধু তাহাদেরই বন্ধুকে আঘাত করা ইহা তাহারা অতি সহজেই বুঝিতে পারিল। কেবলমাত্র মহিম সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হয়ত' মনস্তত্ত্বের অনেক কিছুই সে পড়িয়াছে, হয়ত' সতীশের মুখ হইতে তাহার মনের সব কিছুই সে বাহির করিয়া লইতে চায়—এমনি না হইলে তাহার পথকে সে বাঁচাইবে কেমন করিয়া, মতকেই বা আঁকড়াইয়া ধরিয়া কি উপায়ে তাহাকেই সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া অমোঘ বলিয়া প্রচার করিবে!

আস্তে আস্তে মহিম বলিল—কি ক'রতে চাও তুমি?

সতীশ চক্ষু তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, সমস্ত মুখে তাহার বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কোন কথাই সে বলিতে পারিল

না। তাহার দুই চক্ষুতে একান্ত অনুরোধ ঝরিয়া পড়িল, মুখের ভাষা অপেক্ষাও উহা স্পষ্ট হইয়া সমস্ত আলোচনা থামাইয়া দিতে মিনতি জানাইতেছিল—তাহা সকলে বুঝিতে পারিলেও মহিম বোধ করি বুঝিল না অথবা বুঝিয়াও উপেক্ষা করিল।

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, কি তুমি ক'রতে চাও তাকে নিয়ে ?

ম্লান চক্ষু মেলিয়া সতীশ বলিল, আমি কিছুই ক'রতে চাই না মহিম, কিন্তু সত্যিই কি তুমি চুপ ক'রবে না ? আমি আর ওসব শুনতে চাই না, তুমিও যদি ক্ষান্ত দাও ত' আমি খুবই সুখী হব।

ঠিক এমনি সময় রামহরি উপেনবাবুকে সেই ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য সতীশের চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্যই। পরমুহূর্ত্তেই সতীশ নিতান্ত অবশ হইয়া পড়িল। এই বার যে কথা উঠিবে তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার এতটুকু পথও সে খুঁজিয়া পাইল না। এ সময় একটি লোকের কথা কেবলই তাহার মনের দুয়ারে আঘাত করিতে লাগিল, যদি সে এখানে এ সময় উপস্থিত থাকিত তাহা হইলে সমস্যা হয়ত' কতকটা সহজ হইয়া যাইত। পরের সমস্ত বিপদ অত্যন্ত সাধারণভাবে সকলের অজ্ঞাতেই কেমন করিয়া সে নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লয় এবং কেমন করিয়া সমস্ত কিছু কাটাইয়া উঠিয়া সে সহজভাবেই কথা কহিয়া যায়, তাহা তাহার অপেক্ষা ভাল করিয়া আর কে জানে ? কিন্তু কোথায় সে, বিদায় লইয়া যে যায় নাই, বলিয়া কহিয়া কি সে কোন দিনও আসিবে ? ধূমকেতুর মত সে আসিয়া পড়ে, নিতান্ত অলসভাবেই দিন কাটাইয়া দিতে এতটুকু আপত্তিও করে না ; আবার কখন ঠিক ধূমকেতুর মতই বাহির হইয়া যায়—সকলের অজ্ঞাতে অথচ কাহাকেও এতটুকু না লুকাইয়া। তাহাকে ভাবা যায় না অথচ না ভাবিয়াও উপায় নাই। এই যে জগদীশ, নিতাই প্রভৃতি

তাহাকে ভরসা দিতেছে তাহাদের সেই ভরসা কতটুকু ? এই বার যে কথা উঠিবে তাহার কাছে তাহারা নিজেরাও হয়ত' এতটুকু ভরসা পাইবে না। কিন্তু আর ভাবিতেও সে পারিল না, সহজভাবেই সে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উপেনবাবু বলিলেন, তারপর আছেন কেমন ? এখানে এসে অসুখ আর হয়নি ত' ?

ম্লান হাসি হাসিয়া সতীশ বলিল, না আর কোন অসুখই হযনি, আসুন আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

উপেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই। এঁরা যে আপনার বন্ধু তা' আমি আগেই বুঝতে পেরেছি, কেবল আমার পরিচয়টাই পাননি এঁরা— না পেলেও ক্ষতি নেই বোধ হয় কারণ এই সাহিত্যিক সমাজের মধ্যে আমার মত উকীলের প্রবেশ চিরকালই নিষেধ থেকে যাবে। সেখান থেকে এসে আর দেখা হয়নি তাই আসা। সময়ও বড় একটা পাই না কিন্তু ওপরওয়ালার অর্থাৎ আমার তাঁর তাগাদার দৌড়ও কম নয়, ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন আজ।

জগদীশ বলিল, আদেশের জোর আছে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের লাভই হ'য়েছে তাতে, আপনার সঙ্গে আলাপ ত' হ'য়ে গেল।

কপালে করাঘাত করিয়া উপেনবাবু বলিলেন, আমি বিরাট কিছু নই যে আলাপ হবার গৌরবে আপনারা ফুলে উঠবেন, অতএব বিনয় প্রকাশের কোন প্রয়োজনই নেই। আদেশটা কিন্তু আমার কাছে একটু বড় ব'লেই মনে হ'য়েছে, কোথায় গেলুম তাঁর কাছ ঘেঁসে একটু বসতে, তা নয়—। আপনার বরাত কিন্তু ভাল, আড্ডা তাও বাড়ীতে— আপনার গিন্নীটি কিন্তু বেশ, এমনি স্ত্রী যদি আমিও পেতুম !

বন্ধুরা বিস্মিত হইয়া উঠিল। নির্জ্জন পথে গভীর রাত্রে একা পথ চলিতে চলিতে অকস্মাৎ সমুখে ভূত দেখিলে মানুষ যেমন করিয়া চমকাইয়া ওঠে ঠিক তেমনিভাবে চমকাইয়া উঠিয়া মহিম বলিল, কার স্ত্রীর কথা ব'লছেন আপনি? সতীশের—?

উপেনবাবু বলিলেন, নিশ্চয়, সতীশবাবুর স্ত্রীর কথাই ব'লছি আমি। সত্যি অমন স্ত্রী আর হয় না। এই ত' কিছুদিন আগে তাঁকে নিয়ে উনি গিয়েছিলেন বেড়াতে,আমরাও ছিলুম সেখানে—আহা স্ত্রীকে বুকের কাছে নিয়ে যখন উনি দাঁড়িয়ে থাকতেন, সেই মেলার কথা মনে আছে ত' সতীশ বাবু—কিন্তু কি হ'ল আপনার, অমন, ক'রছেন কেন. অসুখ করেনি ত'?

সতীশের মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সমস্ত দেহ টলিতে লাগিল। সে আর নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না, মুহূর্ত্তেই তাহার মুখের সমস্ত রক্তই কে যেন নিঃশেষে শুষিয়া লইল। সম্মুখস্থ টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া সে স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল।

সমস্ত কিছু শুনিয়া মহিম উত্তেজিত হইয়া উঠিযাছিল, আর থাকিতে না পারিয়া সে বলিল, আপনি অলকার কথা ব'লছেন কি উপেনবাবু? কিন্তু সে ত' সতীশের স্ত্রী নয়।

উপেনবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন. স্ত্রী নয় মানে? তবে তিনি সতীশবাবুর কি হন।

'কেউ নয়।' মহিম উত্তর করিল।

ভুরু কুঁচকাইয়া উপেনবাবু বলিলেন, মিথ্যা কথা। আমাদের কাছে তাঁকে স্ত্রী ব'লেই পরিচয় দিয়াছেন উনি। যদি এর মধ্যে রহস্য কিছু থেকে থাকে ত' আমায় মাপ করবেন। আমি জানতুম না যে অনেকের এমন অনেক স্ত্রীই থাকে, তাঁদের বিভিন্ন স্থানে যে বিভিন্ন পরিচয় থাকে তাও আমি ভাবিনি। কিন্তু যাক আমি চলি, আমার স্ত্রীও আসতে

চেয়েছিলেন, সৌভাগ্য ব'লতে হবে যে তাঁকে এখানে—হয়ত' সে মহিলাটি, যাঁর বিভিন্ন রূপ আপনি দিতে চান, এখানেই আছেন এখনও। থাকুন তিনি, আপনারাও থাকুন, আমি চললুম।

উপেনবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সতীশ কিন্তু কিছুতেই মাথা তুলিতে পারিতেছিল না। আজই হয়ত তাহার সমস্ত কিছু শেষ হইয়া যাইবে, আজই হয়ত তাহার সমস্ত সম্মান সকলের পদতলে লুটাইয়া পড়িবে। কেহই তাহাকে তুলিয়া ধরিতে আসিবে না, সকলেই হাসিবে এবং হাসিয়াই চলিয়া যাইবে, মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া এতটুকু সহানুভূতিও জানাইবে না।

জগদীশ ধীরে ধীরে বলিল, অমনি ক'রে থাকলে ত' চলবে না সতীশ। আমি ও-সব কিছুই বিশ্বাস করি না। সবই মানুষের ভুল, আর ওই ভুল জিনিষটা এমনই মজার যে কেউ তা ঠিক বুঝতে পারে না।

সতীশ মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, তারপর ফিরিয়া চাহিল অন্য সকলের দিকে। কোন কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সমস্ত মুখে ভাসিয়া উঠিল একটা অসহায় ভাব।

মহিম এই বার উত্তেজিতভাবে বলিল, ছিঃ, এ আমি ভাবতেও পারিনি। এমনি ক'রেই কি মানুষের অধঃপতন হয়। মানুষ হ'য়েও মনুষ্যত্ব নেই এতটুকু? এতটুকু সংযমও নেই কি? পরের স্ত্রীকে—ছিঃ।

মহিম উঠিয়া দাঁড়াইল। এখানে তাহার মত লোকের থাকা চলে না। যাহারা ভোগটাকেই বড় করিয়া তুলিয়া ত্যাগের কথা ভাবিতেও ভুলিয়া গিয়াছে তাহাদের সহিত আর যাহারই সম্পর্ক থাকুক তাহার কিছুতেই থাকিবে না। সে যাহা ভাল মনে করে তাহার বাহিরেও হয়ত কিছু কিছু সে মার্জ্জনা করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া এত বড় অনাচার সম্মুখে

দেখিয়াও সে না সরিয়া থাকিতে পারে কেমন করিয়া! উঠিয়া সকলের দিকে একবার চাহিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

অজিত প্রভৃতি অন্য সকলেই উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আজ তাহলে আমরা আসি। পরে একদিন আসা যাবে, আজ দেরী হয়ে গেছে।

নিতাই বলিল, কিছুই বুঝতে পারছি না সতীশ কিন্তু বুঝতে চাই আমি, ভেবে দেখবার সময় চাই—তারপর যা হয় হবে, আচ্ছা আসি আজ।

সকলেই বাহির হইয়া গেল, গেল না কেবল জগদীশ। সে যে কেন গে না তাহা সেই জানে।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে সতীশ বলিল, কিন্তু তুমি জগদীশ?

মৃদু হাসিয়া জগদীশ বলিল, আমি? আমার কথা থাক এখন। দোষ তুমি করেছ কিনা জানিনা, কিন্তু যদি ক'রেই থাক তাতেই বা আমার সরে যাবার এমন কি আছে।

সতীশ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আর বসিয়া থাকিতে সে পারিতেছিল না। উঠিয়া সে ঘরময় দ্রুত পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, তুমিই বা যাবে না কেন? কেন যাবে না বলতে পার জগদীশ?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জগদীশ বলিল, তুমি একটু চুপ ক'রে বস সতীশ। কেন আমি যাব না তা না শুনলেও তোমার চলবে—শুধু এটুকু শুনে রাখ আমার না গেলেও চলবে।

সতীশ আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ধীরে ধীরে অলকা ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার মুখ চোখ অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল, আস্তে আস্তে সে বলিল, আমি অনেক কিছুই শুনেছি সতীশবাবু। আমার জন্যে আপনাকে যে এতটা অপমানিত

হতে হবে সে ভয় আমার ছিল। একজন ছাড়া সবাই আপনাকে অপমানিত ক'রে গেছেন, আপনাকে কি ব'লে ধন্যবাদ দেব তা' আমি ভেবেও পাচ্ছি না জগদীশবাবু।

তাহার চক্ষুতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া জগদীশ মৃদু হাসিয়া বলিল, ধন্যবাদ আমাকে দিতে হবে না বৌদি, অন্য সকলেই চলে গেছে বলেই যে আমাকেও চলে যেতে হবে তারও ত কোন মানে নেই। আপনি ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছেন সেটাও ত আমার কম লাভ নয়, আর কিছু না বললেও চলবে।

সতীশ তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল, তাহার মুখের ভাব এতটুকুও বদলায় নাই। অনেক কিছুই ঘটিয়া যাইতেছে সত্য, কিন্তু কোন কিছুর সহিতই যেন তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

অলকা মৃদুস্বরে বলিল, আপনি এবার বসুন ত' স্থির হ'য়ে। এ অপমানেই যদি আপনি এতটা বিচলিত হয়ে পড়েন ত আর বেশী দিন আপনার এখানে আমার থাকা চলবে না দেখছি। তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, চলুন আবার আমরা বেরিয়ে পড়ি। আপনার ভাগ্যের সঙ্গে আমার ভাগ্য যখন জড়িয়ে গেছে তখন আর কি উপায় হতে পারে বলুন?

জগদীশ সায় দিয়া বলিল, সে কথা মন্দ নয়, কিছুদিন নিশ্চিত থাকতে পারবেন তাতে। তাহার মুখের উজ্জ্বলতা কমিয়া গেল, একটা বিষাদের ছায়া সেখানে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

অলকা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, দুঃখ করবেন না জগদীশবাবু। আপনি কাছে থাকলে হয়ত অনেক উপকারই হ'ত আমাদের, কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায়ও যে নেই।

ম্লান হাসি হাসিয়া জগদীশ বলিল, না দুঃখের হয়ত কিছু নেই এতে

তবু একটু হয় বই কি। ভবিষ্যতে যদি কোন দিনও কারও সাহায্যের দরকার হয় আপনার ত আমাকে ভুলবেন না।

মৃদুস্বরে অলকা বলিল, আমাকে সাহায্য করায় বিপদ আছে তবু ভুলব না আপনার কথা। তারপর সতীশের দিকে ফিরিয়া সে বলিল, আপনার ত চুপ করে থাকলে চলবে না। বন্দোবস্ত সব ঠিক করতে হবে ত। আমি একা ত আর সবকিছু করতে পারি না।

সতীশ বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কোন কথা না কহিয়া সমস্ত কিছু ঠিক করিবার জন্য সে অলকাকে অনুসরণ করিল।

* * *

জন্মভূমিতে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অক্ষয়ের সহিত সুধীরের দেখা হইয়া গেল।

অক্ষয় আগাইয়া আসিয়া বলিল, ব্যাপার কি হে? অনেক দিন যে আর দেশের দিকে আসা হয় না, এ বেচারা এমন কি দোষ করেছে! তারপর পরশু তোমার কাকার চিঠি পেয়েই রওনা হয়েছ বুঝি।

সুধীর বলিল, না কাকার চিঠি আমি পাইনি, পাবার কথাও নয়। কলকাতা থেকে বেরিয়ে ছিলুম অনেকদিন আগেই। দেশেই আসিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু হঠাৎ কেন জানি না মতটা একটু বাদলে গেল। তাই কদিন একটু বেড়িয়ে এলুম অন্যদিকে, যাক্ এখানকার সব খবরই ভালত'!

অক্ষয় বলিল, হ্যাঁ, ভালই এক রকম, তবে তোমার কাকার শরীর তেমন ভাল নয়, বয়স ত হয়েছে কম নয়, এবার হয়ত হঠাৎ একদিন চোখ বুঁজবেন। তারপর অকস্মাৎ গলার স্বর অত্যন্ত নামাইয়া সে বলিল, আচ্ছা বৌকে হঠাৎ হারিয়ে ফেললে কি করে? এখানকার বুড়োরা কিন্তু অন্য কথা বলে; কিন্তু থাক সে সব শুনে তোমার কাজ নেই।

কাকা বলেন, ওখানে বিয়ে করতে আগেই বারণ করেছিলুম তা না শোনাতেই এই ফল। ছেলে পেলেই যারা ধরে-বেঁধে বিয়ে দেয় তারা কি ভাল হতে পারে কখন-ও? আরও অনেক কথাই তাঁরা বলেন। কিন্তু কি হয়েছিল বলত?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুধীর বলিল, কাকার মত ছিল না এ বিয়েতে। তিনি চেয়েছিলেন বনেদি জমিদার বংশের মেয়ে যাঁরা হবে আমাদেরই সমান ঘর। কিন্তু সে মেয়েটিকে দেখে আমার ভারী পছন্দ হয়েছিল তাই কাকার অমতেই তাকে বিয়ে করি। দেশে আসব ভেবেছিলুম কিন্তু মনে হল কাকা যদি রেগে যান? যদি তিনি ওর সামনেই ওর এবং ওর পিতৃপুরুষের নিন্দা সুরু করেন? তাই দেশে না এসে পশ্চিমের দিকে রওনা হয়ে যাই, তারপর একটা ছোট ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামার সঙ্গে সঙ্গে কি খেয়াল হওয়ায় সেখানেই নেমে পড়ি—তারপর কি ঘটেছিল তা' ত' চিঠিতেই জানিয়েছি।

অক্ষয়ের মুখেও বিষাদের ছায়া পড়িল আস্তে আস্তে সে বলিল, এবার কি করবে ভেবেছ? যে গেছে তাকে পাবার আর ত' কোন উপায়ই নেই। তোমার সম্বন্ধে এতটুকু সংবাদও তাকে দাওনি বলেই আজ এ শাস্তি তোমার। কিন্তু সে যাক্, তার কথা ভেবেও আর লাভ নেই।

সুধীর বলিল, না ভেবেই বা করি কি! সে নিরাপদে আছে না মহাবিপদের মধ্যে পড়েছে তাও ত' জানতে পারলুম না। নিরাপদে আছে একথাটাও যদি জানতে পারতুম! তারও কোন উপায় নেই আমারও রইল না।

অক্ষয় বলিল, তার জীবন ত' নষ্ট হয়েছেই কিন্তু তোমারটা ত' রক্ষা করা যায়। আমার মনে হয় আবার তোমার সংসারী হওয়া উচিত। তুমি আমায় ভুল বুঝ না বন্ধু কিন্তু তোমার জীবন ব্যর্থ করার মানে

যে কি তা একবার ভেবে দেখেছ কি! তোমার কোন ভাইই নেই, তোমার কাকারও কোন সন্তান নেই—তুমিও যদি সংসারী না হও তবে এ বংশের আর কি বাকী থাকবে?

ম্লান হাসি হাসিয়া সুধীর বলিল, বাকী নাই বা থাকল।

বিস্মিত হইয়া অক্ষয় বলিল, তার মানে পিতৃপুরুষের যে আকাঙ্ক্ষা পুরুষানুক্রমে ব'য়ে এসে তোমার মধ্যে সংক্রামিত হয়ে আছে তাকে আজ তুমি বুঝতে না পারলেও ভবিষ্যতে যখন বুঝতে পারবে তখন যে আর কোন পথই খোলা থাকবে না তোমার জন্যে। তাই ত' বলি সময় যে সুযোগ তোমার কাছে এনে দিয়েছে তাকে অবহেলা করো না। সুযোগ জীবনে আসে কিন্তু তাকে যে ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারে সেই ত সত্যিকার বুদ্ধিমান।

'পৃথিবীতে দু' একটা বোকা লোক থাকায় দোষ কি?' সুধীর বলিল।

অক্ষয় এতটুকু না দমিয়া বলিয়া চলিল, তোমাকে বুদ্ধিমান বলতে আর চাইও না আমি। দেশে না এসে নব বিবাহিতা বধুকে নিয়ে যে প্রথমেই সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায় যায় তাকে বুদ্ধিমান মনে করবার ইচ্ছা আর আমার নেই, তাই আজ বন্ধু হিসেবে পরামর্শ দিচ্ছি তোমায়।

সুধীর কোন উত্তর দিতে পারিল না, সম্মুখের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কাকা তাহাকে এতটুকু তিরস্কার না করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাহার অলক্ষ্যে অক্ষয়কে কি ইঙ্গিত করিলেন—সেও তাহার অজ্ঞাতসারে মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

তিনি বলিলেন, যা হবার তা হয়েছে সুধীর, আর দেশের বাইরে তোমার যাওয়া হবে না।

সুধীর কোন কথা না বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া মুখ লুকাইয়া বাঁচিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর সে তাহারই বহু দিনকার ঘরের চতুর্দ্দিকে

চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওই যে কোণে ধূলা জমিযাছে, ওই যে তাকের উপর উইয়ে বাসা বাঁধিয়াছে এবং ঘরের চতুর্দ্দিকে এই যে পাতা এবং ছেঁড়া কাগজ আসিয়া জুটিয়াছে উহারা সকলেই একসঙ্গে জোট পাকাইয়া যেন তাহাকে আক্রমণ করিল। আজ তাহাকে ঘিরিয়াই তুইটি সেবা পরায়ণ হাত, তুইটি সুন্দর মমতাপূর্ণ চক্ষু নিরন্তর কত ব্যস্তই না হইয়া থাকিত। কাপড়ে কোথায় ধূলা লাগিয়াছে,চুলের কোথায় একটু ব্যতিক্রম হইয়াছে। তাহাও আজ সেই অনুসন্ধিৎসু চক্ষুর নিকট হইতে লুকাইয়া রাখা সম্ভব হইত না। কিন্তু কেমন করিয়া যে সমস্ত সম্ভাবনা অসম্ভব হইয়া গেল তাহা সে ভাবিযাও পাইল না। যাহাকে পাইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না তাহাকে পাইয়া হারাইয়াছে বলিয়াই না তাহার এত তুঃখ। তাহাকে কোন দিনও যদি সে না দেখিত! বসিয়া বসিয়া সময় আর তাহার কাটিতে চাহে না। ধূলিপূর্ণ টেবিলের উপরই মাথা রাখিযা সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

বিকালে অক্ষয় আসিয়া বলিল, চল বেড়িয়ে আসি খানিক নৌকো করে। যে খালটা দিয়ে আমরা অনেক দিন গিযেছি সেটা হয়ত আজও আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে।

সুধীর খুসী মনেই রাজী হইল। সেই তাহাদের পুরাতন দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। স্মৃতির কোঠায় যাহা যাহা আসিয়া পড়িযাছে তাহাদের কাহারও দাম কম নহে।

তাহারা তুইজনে নৌকায উঠিয়া পড়িল। অক্ষয় দাঁড় টানিতে লাগিল, সুধীর চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া হয়ত পুরানো কথাই ভাবিতেছিল।

নিকটেই খালের পাড়ে একটি যুবতীকে দেখিতে পাইয়া অক্ষয় বলিল, ওকে চিনতে পার সুধীর? খুব ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, লজ্জা

পাবার কিছু নেই। চেয়ে দেখ, ও কিন্তু তোমায় চিনতে পেরেছে। পালিযে যাবার কথাও ভুলে গেছে, চিনিতে পারলে ?

সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া সুধীর বলিল, হ্যাঁ চিনেছি—ও পারুল, না ?

অক্ষয় বলিল, হ্যাঁ তাই, ও পারুলই। চিনতে তোমার একটু দেরী হয়েছে, ওর কিন্তু একটুও দেরী হয়নি। ওর কথা মনে পড়ে বোধ হয়।

সুধীর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। একটা গভীর নিশ্বাস তাহার বুক চিরিয়া বাহির হইয়া গেল। এ সেই পারুল যাহার কথা সে ভুলিবে না বলিয়াই ভাবিত। কিন্তু কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে উহার। নৌকা আগাইয়া গেল, মুখ ফিরাইয়া সে আর একবার সেই মেয়েটির দিকে চাহিল—সে তখনও তাহাদের দিকেই চাহিয়াছিল। আজ কম হইলেও আঠার বৎসর বয়স হইবে তাহার কিন্তু ওই বয়সই তাহার চিরকাল ছিল না। বছর পাঁচ আগেকার কথা স্পষ্টই মনে পড়ে। যেদিন তাহার কলিকাতায় পড়িতে আসিবার কথা সেদিনই খুব ভোরে দেখা হইয়াছিল উহার সঙ্গে। নূতন কলেজে পড়িতে যাইতেছে। মনের আনন্দ তাহাকে প্রজাপতির মত হালকা করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ওই মেয়েটির চোখে মুখে যে বিষাদ ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা তখন চোখে পড়িলেও মনের মধ্যে তেমন করিয়া দাগ কাটিতে পারে নাই। আর আজ চোখে না পড়িলেও মনের মধ্যে গভীর হইয়া তাহা কাটিয়া কাটিয়া বসিতেছিল। সমস্ত কথার মধ্যে সেদিন সে কেবলই বলিতেছিল,'এখানকার সব কিছুই বোধ হয় তুমি ভুলে যাবে সুধীরদা! সমস্ত, এর একটা কণাও তোমার মনে থাকবে না ত!' সে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল কিন্তু কি বলিয়াছিল আজ আর তাহা মনে পড়ে না, হয়ত' শত চেষ্টায়ও পড়িবে না।—তারপর যাইবার সময মাটির উপর আঙ্গুল দিয়া তাহার নাম লিখিয়া সে বলিয়া গিয়াছিল, হয়ত'

তোমার যাবার সময় আমি আসতে পারব না সুধীরদা, কিন্তু সে সময় ঠিক যাবার আগে আমার এই নামটা তুমি মুছে দিয়ে যেও। হয়ত' কোন কিছু ভাবিয়াই সে ওকথা বলে নাই, হয়ত' উহা তাহার বালিকা বয়সের একটা খেয়াল কিন্তু সে খেয়াল সে পূর্ণ করিয়াছিল—তাহার হাত দিয়াই সে সযত্নে তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই হাতের দিকে সে চাহিয়া দেখিল। তারপর প্রতি ছুটীতে দেখা হইয়াছে উহার সঙ্গে—পরস্পরের গা ছুঁইয়া কত প্রতিজ্ঞাই না করিয়াছে উভয়ে কিন্তু সমস্তই ত মিথ্যা হইয়া গেল, কোন কিছুই ত' আজ আর বাঁচিয়া নাই। একটা গভীর নিঃশ্বাস তাহাকে সচকিত করিয়া দিয়া গেল। সে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। বহুদূরে প্রায় দেখা যায় না, একটি মেয়ে তখনও স্থির হইয়া এই দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুধীর মুখ ফিরাইয়া আবার আকাশের দিকে চাহিল।

অক্ষয় বলিল, ওই সেই পারুল কিন্তু আজ ও বিধবা।

সুধীর চমকাইয়া উঠিল, বিধবা! সমস্ত মুখ তাহার বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া গেল, বুকের মধ্যে কে যেন অনবরত খোঁচা দিতে লাগিল। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে স্থির হইয়া রহিল।

অক্ষয় বলিয়া চলিল, তোমার বিয়ের খবর পাওযার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মাও ব্যস্ত হয়ে ওঠে। একা মানুষ কিই বা ক'রতে পারে! তারপর জুটল এক বৃদ্ধ, অবশ্য তার ছোট ছেলের সঙ্গেও বিয়ে দেওয়া চলত' কিন্তু সেও তখন দু' ছেলের বাপ তাই বিয়ে ক'রতে হ'ল সেই বৃদ্ধকেই। কিন্তু মাসখানেকও কাটতে পায়নি—তারপর, পারুল; যাকে তুমি একদিন ভরসা দিয়েছিলে সে ফিরে এল নূতন এক সাজে।

সুধীর চীৎকার করিয়া উঠিল, থাম অক্ষয়, দয়া কর। আর ওসব শুনিয়ো না আমায়। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, একবার মাথা

তুলিয়াই তেমনিভাবে সে আবার বসিয়া রহিল। সমস্ত শরীর তাহার থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

অক্ষয় বলিল, না আর বেশী কিছু নেই, আর একটু শোন। আমি গিয়েছিলুম একদিন ওদের বাড়ী। ওর সঙ্গে দেখা হওয়ায় একটু দুঃখও প্রকাশ ক'রেছিলুম বোধ হয়। ও কিন্তু হেসে ব'লেছিল, 'এ ত' আর আমার বিয়ে হয়নি অক্ষয় দা যে দুঃখ ক'রবে। হ'য়েছিল এক বুড়োর সঙ্গে খানিক ঠাট্টা, স্বামী আমার বুড়ো হ'তে যাবে কিসের জন্যে—সে বুড়ো হবার আগেই যে আমার চুল পেকে যাবে। রাজা-রাজড়ার গল্প প'ড়েছ ত', দুয়োরাণীর কথা কি ভুলে গেছ নাকি?' জান সুধীর এতটুকু দুঃখের ছাপও দেখিনি তার মুখে কিন্তু কেন তা কি বুঝতে পারছ তুমি?

সুধীর চুপ করিয়াই রহিল।

হঠাৎ দাঁড় তুলিয়া ফেলিয়া অক্ষয় বলিল, কিন্তু থাক সে-সব কথা। একজনকে ভুলতে যখন পেরেছ তখন আর একজনকেও ভুলতে পারবে আশা করি। তাই ব'লছিলাম আবার বিয়ে কর। সংসার ব'লে একটা জিনিষ আছে আর সে জিনিষটার দামও কম নয়।

আস্তে আস্তে সুধীর বলিল, একটা উদাহরণ দিয়েই ত' আর সব কিছুকে প্রমাণ করা যায় না। পারুলকে আমি ভুলেছি ব'লেই কি অলকাকেও ভুলতে পারব? ছেলেবেলার অনেক কিছুই যৌবনেও অনেকদিন পর্য্যন্ত টিঁকে থাকে তাই হয়ত' হ'য়েছিল পারুলের বেলায় কিন্তু যৌবনের জিনিষ যদি ঠিক সে সময়েই এসে হাজির হয় ত' তাকে কি সহজে ভোলা যায়? আমার মনের অবস্থা তুমি হয়ত' ঠিক বুঝতে পারবে না অক্ষয় কিন্তু থাক্ এবার ফেরা যাক সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে।

অক্ষয় আর কোন কথা না বলিয়া নৌকার মুখ ঘুরাইয়া দিল।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া অক্ষয় বলিল, চল কাল আমাদের যতীনের বাড়ী যাওয়া যাক, দুদিন সেখানেই থাকা যাবে। মনে আছে বোধ হয় তার মাকে। কি যত্নই না করতেন তিনি। মেয়ের বিয়ের সময় তুমি যেতে পারনি, কত দুঃখ যে তিনি পেয়েছিলেন তাতে। তারপর ত' আর যাওনি ওদিকে, কালই চল।

সুধীর বলিল, বেশ, কাল দুপুরের দিকে রওনা হওয়া যাবে, সন্ধ্যের মধ্যেই পৌছতে পারব' তা'হলে। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, কয়েক মাস দেখা হয়নি ওর সঙ্গে, কার সঙ্গেই বা হয়েছে, কি করে আজকাল ও ?

অক্ষয় বলিল, করে আজকাল খুব ভাল কাজ। নিজেদের জমি আছে তাই চাষ করায়, নিজের হাতেও অনেক কাজ-করে। বেশ ভালই আছে কিন্তু। সন্ধ্যের সময় যখন জমি থেকে ফেরে তখন ওর ক্লান্ত সুন্দর শরীরটার দিকে না চেয়ে পারা যায় না। সেই যতীন—ভারী আশ্চর্য্য না ? অক্ষয়ের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু সেই অন্ধকারে নৌকার অন্য প্রান্তে বসিয়া সুধীর তাহা দেখিতে পাইল না। বাড়ী ফিরিয়াও সুধীর এতটুকু শান্তি পাইতেছিল না। পারুলের কথা থাকিয়া থাকিয়া কেবলই তাহার মনের হারাইয়া যাওয়া এক অংশ তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল। তাহাকে সে স্নেহ করে তাহার দুঃখ সে স্পষ্টই অনুভব করে। তাহাকে সে ভুলিবে না বলিয়াই ভাবিয়াছিল কিন্তু সেকথা সে রাখিতে পারে নাই, কিন্তু ভুলিয়াছে বলিয়াই কি সম্মুখে আসিয়াও তাহার কথা না ভাবিয়া পারা যায় ? ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার ভবিষ্যত জীবন গড়িয়া উঠিবে ইহাই একদিন তাহার মনের মধ্যে বড় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে ফেলিয়া কেন্দ্রস্থলে অপর একটি মুক্তা সে গাথিয়া লইয়া খুসী হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই হয়ত' আজ বিধাতার

অভিশাপ তাহার মাথার উপর নামিয়া আসিয়াছে। কি সে করিবে তাহা ভাবিয়াও পাইতেছিল না। শরীর খারাপ আহার করিবে না এই অজুহাত দেখাইয়া সে শুইয়া পড়িল। কিন্তু শুইয়া পড়িলেই যে চিন্তা আরও ঘিরিয়া ধরে তাহা আজ সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। অনেকক্ষণ স্থির হইয়া পড়িয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। রাত্রি খুব বেশী হয় নাই। আকাশের চাঁদ তাহাকে ভরসা দিতেছিল, তারাগুলি সঙ্কেত করিতেছিল, সম্মুখের গাছগুলি যেন তাহাকে কোন একটা পথের সন্ধান দিতেছিল। সে আগাইয়া চলিল। আশেপাশের সমস্ত কিছুই তাহার চক্ষে পড়িতেছিল কিন্তু কিছুই যেন তাহার নজরে আসিতেছিল না। এ কোন্ পথে সে চলিয়াছে কোথায়ই বা যাইতেছে তাহা সে ভাবেও নাই ভাবিবার প্রয়োজনও মনে করে নাই হয়ত'। অনেকদূর চলিবার পর অকস্মাৎ কাহার ডাকে তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে চাহিয়া সে পারুলকে দেখিতে পাইল। তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। ইহা যে উহাদেরই বাড়ীর আঙ্গিনা তাহা বুঝিতে তাহার দেরী হইল না। এখানে সে বহুদিন আসিয়াছে। ওই যে একধারে পেযারা গাছটা দেখা যাইতেছে উহারই উপর সে কতদিন চড়িয়া বসিয়া কাঁচা পাকা পেয়ারা খাইয়াছে, ওই মেযেটিকেও কত দিয়াছে তাহা এই অন্ধকার রাত্রে ওই মেয়েটির সম্মুখে কে যেন তাহাকে মনে করাইয়া দিল। সে স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

পারুল এতটুকু লজ্জা না পাইয়া বলিল, কবে এলে সুধীরদা, আজই? দেখলুম তখন ঘাট থেকে।—তুমি চিনতে পেরেছিলে আমাকে?

ঘরের ভিতর হইতে তাহার রুগ্না মা ডাকিয়া বলিলেন, কে রে পারু?

পারুল বলিল, তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাক মা। সুধীরকে একটু দাঁড়াইতে বলিয়া সে চকিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটা ছোট

জলচৌকী লইয়া আসিয়া আঁচল দিয়া ভাল করিয়া উপরটা মুছিয়া তাহাকে বসিতে দিয়া বলিল, আমি কিন্তু তোমায় চিনতে পেরেছিলুম দেখেই। মাত্র কয়েক মাস দেখা হয়নি কিন্তু কি চেহারা করেছ বলত' ?

সুধীর এতক্ষণে কথা কহিতে পারিল, বলিল, নিজের চেহারার দিকে কি চেয়ে দেখনি কোন দিন, এ কি হ'য়েছ বলত আজ! যা অনেক সাধনায় মেলে তা কি অত সহজে নষ্ট ক'রতে হয় ?

সুন্দর হাসি হাসিয়া পারুল বলিল, কিন্তু আমার চেহারার আর ত' কোন দরকার নেই সুধীরদা। একটা পরীক্ষার জন্য এটার দরকার ছিল কিন্তু সে ত' শেষ হ'য়ে গেছে, আমি যে পরীক্ষায় জিততে পারিনি, সুধীরদা।

ক্ষণকাল সুধীর কিছুই বলিতে পারিল না। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, আমারও ত' শেষ হয়ে গেছে। আমারই বা এ সবে দরকার কি!

পারুল বলিল, তোমার শেষ হ'তে যাবে কেন, যাকে হারিয়েছ সে কি তোমাকে ভুলতে পেরেছে মনে কর ? মেয়েগুলো যে ভারী বোকা! কোন এক ফাঁক দিয়ে গোপনে দেখে তারা সারারাতের চোখের ঘুম নষ্ট করতেও যে প্রস্তুত থাকে, সুধীরদা। এসব তর্ক ক'রে বোঝান যায় না, হৃদয় দিয়ে অনুভব ক'রতে হয়।

সুধীর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, চাঁদের আলো তাহার সমস্ত দেহই স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল কিন্তু মুখ দেখিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিবার উপায় ছিল না। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া সে বলিল, তাকে ত' আর পাওয়া যাবে না পারুল যে আমার চেহারাটার দিকে আবার নজর দিতে হবে। কিন্তু মেয়েরা কি চেহারাটারই শুধু দাম দেয় ?

পারুলের সারা মুখ মুহূর্ত্তের জন্য অত্যন্ত বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া উঠিল, কোনমতে নিজেকে সংযত করিয়া সে বলিল, সে কথা আব তোমাকে

বলতে চাই না। আমি. আমার বুড়ো স্বামী কি ব'লত জান? সে বলত, তোমাকে বিয়ে ক'রে তোমার জীবনটাই নষ্ট ক'রে দিলুম নূতন-বৌ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি বাকী দিনগুলো যেন তোমার সুখেই কাটে —আর যে কদিন আমি বাঁচি একটু যত্ন ক'রো আমায়, বুড়ো ব'লে ঘৃণা ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিও না যেন। তার সেবাও ত' আমি ক'রেছি, যে কদিন সে বেঁচেছিল এতটুকু অযত্নও হ'তে দিই নি। সুধীর দা, আমি শুধু আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই তোমাদের কথা ভেবে। তোমারা কি? আর একজনের জীবন ব্যর্থ হচ্ছে একথা খুব ভাল ক'রে বুঝতে পেরেও কেন তোমরা নিজেদের সংযত ক'রতে পার না? চেহারাটার দাম আমরা বেশী দিই, না? কিন্তু থাক এ-সব পুরানো ঝগড়া। বউকে খুঁজে বার করবার কোন চেষ্টা ক'রছ না আবার বিয়ের ব্যবস্থা হ'চ্ছে।

সুধীরের চোখে মুখে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল, চক্ষু তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া সে বলিল, আজও কি আমায় তুমি ক্ষমা করতে পারনি পারুল

ক্ষণকাল চুপ করিয়া পারুল বলিল, ক্ষমা কিসের, দোষ ত' তুমি কিছুই করনি। আমরা, মেয়েরা, একেই বলি বরাত।

সুধীর উঠিয়া দাঁড়াইল কি যেন বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে বলিল, আজ যাই পারুল পরে আবার দেখা হবে। আর কোন কথা না বলিয়া সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। পারুল যে স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারায় পিছন ফিরিয়া চাহিবার শক্তি আর তাহার ছিল না। অন্যমনস্কের মত সে কিছুদূর আগাইয়া আসিল।

অকস্মাৎ একটা বাঁশঝাড়ের নীচে দৃষ্টি পড়িবামাত্রই সে চমকাইয়া উঠিল। ভূত বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্বও সে বিশ্বাস করে না অথচ

অন্ধকারে ঐ গাছের নীচে যাহাকে দেখা যাইতেছে তাহার সমস্তই মানুষের মত হইলেও মুখ দেখিয়া মানুষ বলিবার কোন উপায়ই ছিল না। ওই গাছ গুলির ঠিক সম্মুখে হরিশদার বাড়ী, হরিশদা তাহার স্ত্রীকে লইয়া সেখানে বাস করে—সন্তানাদি আজিও হয় নাই। স্ত্রাভক্ত বলিয়া সকলে তাহাকে রাগাইয়া তোলে, সেও ওই কথা শুনিয়া নিতান্ত রাগ করিয়াই বাড়ী চলিয়া আসে। বোকা ধরণের মানুষটি। কিন্তু তাহার কথা মনে পড়িতেও সুধীরের অনেকটা সাহস বাড়িয়া গেল। ভূত বোধ হয় তাহাকে দেখিতে পায় নাই তাই অত্যন্ত সাধারণভাবে হরিশদার বাড়ীর দিকে চাহিয়া হয়ত' কর্ত্তব্যবোধেই নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গী করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিতে যে সে পায় নাই তাহা একান্তই সত্য তাহা না হইলে মানুষকে দেখিয়া ওই প্রেতরূপী ব্যক্তিও অমন করিযা অঙ্গভঙ্গি করিতে লজ্জা পাইত। তাহার ভঙ্গি দেখিযা সুধীর হাসিয়া ফেলিল নিকটে আসিয়া বলিল, কে হরিশদা নাকি? হঠাৎ ভূতের বেশে যে?

লজ্জিত হইয়া হরিশদা কোঁচার খুঁটে মুখের রং মুছিতে মুছিতে বলিল, আর ব'ল না ভাই তোমার বৌদির জ্বালায কি আর টিকবার যো আছে। ভূত দেখবার ভারী সখ, তাই—আর ব'ল না। কিন্তু এলে কবে? চল, ভেতরে চল। বৌদির সঙ্গে দেখা ক'রবে না?

সুধীর মাথা নাড়িয়া বলিল, আজ থাক্, আছি ত' কিছুদিন, দেখা হবেই।

হরিশ দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া তাহার কথায় সায় দিয়া মুখের রং মুছিতে মুছিতে বাড়ীর দিকে আগাইয়া গেল।

সুধীরের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। হরিশদার গমন পথের দিকে চাহিয়া তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। হয়ত বৌদি জানালা দিয়া ভূত দেখিয়াছে; কেমন করিয়া ভয় দেখাইতে গিয়া

মানুষকে তাহারা হাসাইয়া দেয় তাহাও দেখিযাছে বোধ হয়। ওই ভূতকে ঘিরিয়াই অনেক কথা হয়ত তাহার জমিয়াছে, স্বামীর নিকটে হাসিযা হাসিয়া যখন সে-সব কথা বলিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিযাছে তখন সে তাহাদের মধ্যে পড়িয়া সমস্ত আনন্দ হরণ করিযা বসে কেমন করিয়া? তাই সে হরিশদার সহিত যাইতে চাহে নাই কিন্তু মন যে তাহাকে ছাড়িযা উহাদেরই আশে পাশে ঘুরিযা মরিবে তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। হরিশদা দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই একটা নিশ্বাস যেন তাহাকে মুক্তি দিযা বাহির হইয়া গেল। মুখ ফিরাইয়া লইয়া সে চলিতে লাগিল। আকাশে তারা উঠিয়াছে, কোথাও বা ঘেঁসাঘেঁসি, কোথাও অনেকদূর পর্য্যন্ত একেবারেই নাই, এই পৃথিবীর অনেক কিছুই ভরিযা আছে, নিজের বুক তাহার ঐ তারকাশূন্য আকাশের অংশের মতই ফাঁকা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সমস্ত বুকে কোথাও কিছু যেন অবশিষ্ট নাই আর কোন দিনই তাহার বুক ভরিয়া উঠিবে বলিযাও তাহার মনে হইল না। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই অনেকখানি পথ হাঁটিযা সে বাড়ী আসিযা উপস্থিত হইল।

* * * *

পরদিন আহারাদির পর সুধীর অক্ষযের সহিত বাহির হইযা পড়িল। যতীনের বাড়ীতে পৌঁছাইতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। এই দুপুর রৌদ্রে কলিকাতায কেহ বাহির হইতে চাহে না সত্য, কিন্তু গ্রামে আসিয়া গ্রামের ছেলেরা যেন অস্থির হইয়া বেড়ায। ঘর অপেক্ষা বাহিরই তাহাদের নিকট অধিকতর বাঞ্ছনীয বলিয়া মনে হয।

পথ চলিতে চলিতে সুধীর বলিল, যতীন ত আমাদের যাওয়ার কথা কিছুই জানে না, ও যদি কোথাও গিযে থাকে, দু'দিন দেরী করে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে গেলেই হত।

হাসিয়া অক্ষয় বলিল, না হে, বাড়ী ছেড়ে সে বড় কোথাও যায় না, জমি তার দেখবে কে ?

আর কোন কথা না বলিয়াই তাহারা আগাইয়া চলিল।

বৈকাল বেলা একটা বড় দীঘির নিকট আসিয়া অক্ষয় বলিল, একটু ব'স এখানে, কিছু খাবার জোগাড় ক'রে নিয়ে আসি।

সুধীরের বসিতে এতটুকু আপত্তিও ছিল না। নিকটস্থ গাছটায় হেলান দিয়া তাহারই স্নিগ্ধ ছায়ায় সে বসিয়া পড়িল।

গ্রামের বধূরা, মেয়েরা একে একে, দুয়ে দুয়ে কলসী কাঁখে আসিতে লাগিল। এই যে সময়টা তাহারা তাহাদের হাতের মধ্যে পাইযাছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ না করিয়া তাহারা পারে না। গৃহের বাহিরে পরস্পরের সহিত কতটুকু সময়ই বা তাহাদের দেখা হয়। প্রতিদিন সকালে বিকালে নিজেদের খুশীমত ঘণ্টা দুয়েক ব্যয় করিয়া গৃহে ফিরিয়া শাশুড়ী অথবা মাতার তিরস্কারে এতটুকু কান না দিয়া পরের দিনের জন্য তাহারা ব্যস্ত হইয়া ওঠে। হাসিয়া, হেলিয়া-দুলিয়া যে যাহার স্বামীর এবং গৃহের কথা বলিতে বলিতে দীঘির ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধীর বসিয়া বসিয়া তাহাদের আগমন দেখিতে পাইল, অনেকের অনেক কথাই তাহার কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল, কিন্তু এতটুকু আগ্রহ না দেখাইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর কিছু চিঁড়া, মুড়কি, বাতাসা ও কলা লইয়া অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। জামাটা খুলিয়া রাখিয়া দীঘির ঘাটের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল, না, ওখানে এখন না যাওয়াই ভাল। হাত-মুখ ধোওয়া প'ড়ে থাক। শুকনো চিঁড়েই চালাও। কথা শেষ করিয়াই একমুঠা মুখে পুরিয়া কলার খোসা ছাড়াইতে সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

আহার শেষ করিয়া অক্ষয় বলিল, একটু জল না পেলে চ'লবে না কিন্তু। চল চোখ-কান বুঁজে ঘাটেই যাওয়া যাক—দূর থেকে খানিক গোলমাল ক'রতে ক'রতে গেলেই হবে।

সুধীর অক্ষয়ের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

অক্ষয়ের নেতৃত্বে সুধীরও হাত-মুখ ধুইয়া জল পান করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। একটি প্রগল্‌ভা যুবতী ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, জল যেন আর কোথাও নেই, পুরুষগুলোর যদি এতটুকু আক্কেলও থাকত!

অক্ষয় যেন এই কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল, সুধীরের দিকে ফিরিয়া সে বলিল, শুন্‌লে ত? একথা যে শুন্‌তে হবে, তা আমি জানতুম। আমার কর্ত্তাঠাকরুণও ঠিক এমনি কিনা। সংসার ত ক'রলে না আজও। আমি বলি কি, গোলমাল যখন হ'য়েছেই, তখন তার ব্যবস্থা তারই হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'রে নাও। মিছি মিছি তোমার জীবনটাও নষ্ট ক'রে কি ফল পাবে? স্বর্গে গিয়ে মিল্‌বে যদি ভেবে থাক ত সে ভরসা ছাড়, কারণ ভগবান যখন ইহকালই তোমার ব্যর্থ করে দিয়েছেন, তখন স্বর্গীয় হলে পরেও যে তোমার জন্যে তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠবেন, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আর তখন যমরাজের হাত, ষাঁড়ের ওপর বসে গুঁতোবার অভ্যেসই তাঁর হয়েছে, ঠাণ্ডা মেজাজ তাঁর কোনদিনই দেখবে না।

সুধীর বলিল, পরকালের কথা আমি একটুও ভাবি না, তাই সে-সব কথা ব'লে যুক্তি দেবার কোন দরকারই তোমার নেই।

অক্ষয় বলিল, তবে আমি ব'লব তুমি মেয়েদের প্রশংসা চাও। আবার বিয়ে ক'রলে পাছে তারা ছি ছি করে, এই তোমার ভয়। স্বার্থত্যাগ দেখাতে গিয়ে মস্তবড় স্বার্থপরতার কাজই করছ তুমি। বাঙলাদেশে বহু

মেয়েই পিতামাতার দীর্ঘশ্বাসে শুকিয়ে উঠ্‌ছে। তুমি সক্ষম হ'য়েও তাদেরই একজনের ভার নিতে রাজী না হ'যে পাপ ক'রছ ব'লেই আমি মনে করি। ওই যে মেয়েদের ঘাটে দেখে এলে, ওদের প্রাণশক্তি নষ্ট ক'রে দেবার কি অধিকার তোমার আছে বল্‌তে পার ?

অন্যমনস্কের মত সুধীর বলিল, তর্ক ক'রে অনেক কিছুই বোঝান যায় না অক্ষয়। একথা আর বেশীবার বল্‌বার ইচ্ছে আমার নেই। শুধু এটুকু জেনে রাখ যে, এমন একটা জিনিষ আছে, যা তর্ক এবং যুক্তির চেয়েও বড়। কি সে জিনিষ, সে প্রশ্ন ক'র না—পার ত নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ। যাদের হাস্য-পরিহাস দেখে একটা দিক তোমার নজরে পড়েছে, তাদেরই সেই খুশীর আর একটা দিক কি তুমি ভুলে থাক্‌তে চাও ?

অক্ষয় কোন কিছু না বুঝিতে পারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কি তুমি ব'লতে চাও স্পষ্ট ক'রেই বল। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

তেমনি ভাবেই সুধীর বলিল, বুঝতে যখন পার নি, তখন থাক্‌। প্রত্যেক জিনিষই যে যার নিজের ভাবে দেখে। তাই ওই হাস্য-পরিহাস আমি যেভাবে দেখেছি, তোমাকেও কি ঠিক সেইভাবেই দেখতে হবে ? তবে শুধু যুক্তি দিয়েই যখন তুমি জিততে চাও, তখন সব কিছুই তোমার বিচার ক'রে দেখ্‌তে হবে বই কি। কিন্তু যাক্‌, আকাশের অবস্থাটা একবার দেখছ কি ? আমাদের আলোচনার মধ্যে যত না সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার চেয়েও বড় রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে ওখানে।

উপর দিকে চাহিয়া অক্ষয় বলিল, আর ঘণ্টা দুয়েক চ'লতে পারলেই হয়। ছাতাটাকে ভাল ক'রে চেপে ধ'রে এগিয়ে চল, হঠাৎ ঝড় উঠ্‌তে পারে।

নিঃশব্দে কিছুদূর তাহারা আগাইয়া গেল। বহুদূরে আকাশের বুকে একটা বিদ্যুৎ চমকাইয়া তাহাদের অতি নিকটে আসিয়া পড়িল বলিয়াই মনে হইল।

চক্ষু বুঁজিয়া সুধীর বলিল, আর ত কোন উপায়ই নেই অক্ষয়। কাছাকাছি আর কোন গ্রামই ত বোধ হয় নেই।

ঝম্-ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। ক্ষুব্ধ বায়ু গর্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল। দূরের এবং নিকটের সমস্ত গাছই টলিতে লাগিল— হয়ত একটা তাহাদেরই উপর আসিয়া পড়িবে। আকাশের বুক চিরিয়া মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া তাহাদের বুকের স্পন্দন আরও বাড়াইয়া দিল।

ছাতি বন্ধ করিয়া একটু সাহস দিয়া অক্ষয় বলিল, কাছাকাছি কোন একটা বাড়ী পাওয়া যেতেও পারে, কিন্তু ছাতাটা আর খুলে রেখ না।

বহুদূরে মাঠের মধ্যে একটা আলো দেখা গেল। তাহারা দুইজনেই সেদিক লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতে লাগিল। প্রায় মিনিট পনের পর ছোট্ট একটি কুটীরের সম্মুখে আসিয়া মুহূর্তের জন্য দম লইয়া তাহারা সজোরে দরজা ধাক্কা দিতে লাগিল। ছোট্ট কুটীরখানাই ঝড়ের তাল সামলাইতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের দুইজনের একত্রিত জোর ধাক্কা খাইয়া দরজা এমন কি সারা কুটীরটিও কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই একটি যুবতী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। এক ঝলক বৃষ্টি লইয়া তাহারা দুইজনেই একসঙ্গে ঘরে প্রবেশ করায় যুবতীর কাপড়ও ভিজিয়া উঠিল। দরজা বন্ধ করিতে গিয়া যুবতী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, নিকটেই আরও একজন আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই তাহার মনে হইল। তাহার সমস্ত শরীর যে এভাবে অপেক্ষা করিতে গিয়া ভিজিয়া গেল; সেদিকে তখন তাহার এতটুকু লক্ষ্যও ছিল না। সে অপলক-

দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া কি যেন দেখিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ তাহাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল না। দরজার সম্মুখে একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি আসিয়া থামিয়া পড়িল; এই জল-ঝড়েও যেন তাহার কিছুই হয় নাই, এমনি ভাবেই সে হাসিয়া বলিল, আরে এ বৃষ্টিতে আবার দরজা খুলে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে নাকি? না, এ দেশের মেয়েরা ভাবিয়ে তুল্‌লে দেখ্‌ছি। আমার চেয়েও বেশী স্নান ক'রে উঠেছেন যে। সরুন, ভেতরে ঢুকি।

যুবতী সরিয়া দাঁড়াইল, যুবক ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া বলিল, যান ত দিদি এবার ওগুলো ছেড়ে আসুন। যদি আব কেউ আসে ত আমি আছি. বাইরে দাঁড়িয়ে কাউকেই ভিজতে হবে না। যান দেরী ক'রবেন না।

যুবতী তাহার মুখের দিকে বিস্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ইহাকে সে পূর্ব্বে আর কখনও দেখে নাই, কিন্তু একথা বলিলে কে বিশ্বাস করিবে? যুবতী কোন কথা বলিতে পারিল না, তাহার কথা শুনিযা তৎক্ষণাৎ চলিযা যাইবার কথাও বোধ হয় তাহার মনে আসিল না।

তাহার অবস্থা বুঝিযা হাসিয়া আগন্তুক বলিল, আমার কথায় আশ্চর্য্য হবার কি আছে? অচেনা হ'য়েও কি ক'রে ওসব বল্‌লুম, এই না? কিন্তু আপনিই বা আমাকে আসতে দেখে দরজা না বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন কি ক'রে? যাক্‌গে সে-সব, ঠিক হ'য়ে আসুন, খেতে হবে ত কিছু।

যুবতী এইবার হাসিল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, তাইত, বড়ই ভিজে গেছি আমি, কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভেবে যে, এই বৃষ্টির মধ্যে এসেও আপনার কাপড়-জামা শুক্‌ন রইল কি ক'রে? যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি সে জায়গাটা যে একেবারেই ভিজে গেল, স'রে আসুন, নইলে জ্বর হ'তে পারে শেষকালে।

যুবক নিজের জামা-কাপড়ের দিকে চাহিয়া মিষ্টি হাসিয়া বলিল, সেকথা আমার খুবই মনে আছে। তাইত আপনাকে ও-সব ছেড়ে আস্‌তে ব'ল্‌ছি। আপনি এ দেশের মেয়ে যখন তখন আমার জন্যে এতটুকু ভয়ও আমি করি না, ভয় আমাদের শুধু আপনাদের জন্যেই। মনে না করিয়ে দিলে ওসব বদ্‌লাবার দরকারই যে মনে করেন না অপনারা। কিন্তু যাক্‌, আমারও একটা ব্যবস্থা করুন।

সম্মুখের ঘর হইতে সুধীর ও অক্ষয় বাহির হইয়া আসিল। নিজেদের ছোট সুটকেশ খুলিয়া পোষাক পরিবর্তন করিতেই এতক্ষণ তাহারা ব্যস্ত ছিল।

তাহাদের দিকে চাহিয়া আগন্তুক বলিল, এই যে, আপনারা যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত দেখ্‌ছি। পা-দুটোকে ক'রেছেন বটে! শুনেছি হরিণ খুব জোরে ছোটে, দেখি নি, তবে আপনারা যে বড় কম নন, সেকথা আমি জোর ক'রেই ব'লতে পারি। বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে চ'মকে ওঠায় দূর থেকে আপনাদের দেখতে পাচ্ছিলুম বটে, কিন্তু কতবার যে প'ড়েছেন, তা ঠিক বুঝ্‌তে পারি নি। গা-হাত-পা ছ'ড়ে যায় নি ত?

হাসিয়া ফেলিয়া যুবতী পাশের ঘরে চলিয়া গেল এবং কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই নিজের একখানা শাড়ী আনিয়া আগন্তুকের হাতে দিয়া বলিল, তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হ'য়ে নিন্‌ আমিও ঠিক হ'য়ে নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রে দি। আপনারা সবাই আমার অপরিচিত—নিজেদের পরিচয় আপনাদের নিজেদেরই ক'রে নিতে হবে। সে আর না দাঁড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

সুধীর তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, আমার একখানা কাপড়ও প'রতে পারেন আপনি। যুবক হাসিয়া বলিল, না, শাড়ীই ভাল, বেশ চওড়া পাড় আছে। তবে আপনার একখানা জামা বার ক'রে দিন।

সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া ঘরের মধ্যে পাতা মাদুরের উপর গিয়া তাহারা বসিল। অক্ষয় বলিল, চ'লেছিলুম বন্ধুর বাড়ী, কিন্তু মহাবিপদ যে অপেক্ষা ক'রেছিল, তা কি আর জান্‌তুম? আর ঘণ্টা দুয়েক পরে হ'লেও চলত।

আগন্তুক বলিল, তা কি হয়। আমার ত মনে হচ্ছে এই হ'য়েছে বেশ—আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। বাঙলাদেশে বহু অপরিচিত আছে, তাদেরই দু'জন পুরুষ আর একটি মেয়ের আলাপ হ'য়ে গেল ত। এ দেশের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হওয়া মস্ত সৌভাগ্যের বিষয় মনে রাখবেন। এদের সকলেই এক ছাঁচে গড়া, কিন্তু তবু যেন কোথায় প্রত্যেকেরই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, অদ্ভুত এরা। তারপর একটু থামিয়া বলিল, বসুন আপনারা, দেখে আসি আমার এ দিদিটি কি কাজে ব্যস্ত হ'য়ে আছেন এখন।

সে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া রান্নাঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেয়েটি তখন ভাত চাপাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া সে চক্ষু ফিরাইয়া চাহিল।

ঘরের মেঝেতে বসিয়া পড়িয়া যুবক বলিল, তাইত, ভাবছেন কি বলুন ত? মহা সমস্যা না? কি দিয়ে খাওয়ান যায় এদের? হ্যাঁ, ভাববার বিষয়ই বটে।

মেয়েটি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, না, আপনাকে আমি বুঝেছি—যা খুসী দিলেই আপনার চ'লে যাবে, কিন্তু ওঁদের দু'জনকে দিই কি বলুন ত? ঘরে কয়েকটা আলু ছাড়া আর ত কিছুই নেই।

আস্তে আস্তে যুবক বলিল, কিছু ভাবনা নেই আপনার। ওদের কোন কিছুতে আপত্তি হবে না।

আরও মিনিট পনের পরে আহারে বসিয়া যুবক বলিল, আপনারা চ'লে-ছিলেন ত বন্ধুর বাড়ী, কিন্তু কতদূর সে জায়গাটা, আর নামটাই বা কি ?

অক্ষয় বলিল, খুব বেশী দূর নয়, এই কাছেই—হলদিপুর। নাম শুনেছেন কি ?

যুবক মাথা নাড়িয়া বলিল, বটে, হলদিপুর ? আমি যে তার পাশের গাঁ থেকেই আসছি। মেয়েটির দিকে চাহিয়া সে বলিল, বুঝেছেন দিদি, ওখানে কে এক সাধু এসেছেন, ওষুধ দিচ্ছেন। তাই শুনেই এসেছিলুম দেখা করতে—কিন্তু কোথাই বা তাঁর গেরুয়া, আর কোথাই বা মন্ত্রপড়া মাদুলী। ওষুধ দিচ্ছেন বটে, কিন্তু খাঁটি ডাক্তারী মতে। সাধুজী সত্যিই মহৎ—ওখানকার ছেলেদের নিয়ে স্কুল ক'রেছেন—পয়সাও লাগে না তাদের, এমন কি বইও অনেক সময় তিনিই দেন। আবার চাষা-ভুষোদের সঙ্গেও কি সব নিয়ে আলোচনা করেন দেখে এলুম। কেউ বলে স্বদেশী, কেউ বলে শাপভ্রষ্ট, কিন্তু তিনি যে সৎ একথা অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই। আসবার সময় দেখা ক'রে আসবেন তাঁর সঙ্গে।

অক্ষয় বলিল, হলদিপুরেও গিয়েছিলেন নাকি আপনি ?

নিশ্চয়ই। সেখানেও দেখে এলুম আর একজনকে, শক্তিমান পুরুষ। বাঙালী ভদ্রলোকের পাশ করা ছেলেও যে লাঙল ধ'রতে জানে, তা ভাবি নি। সাধুজীই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন।

সুধীর বলিল, তার ওখানেও গিয়েছিলেন নাকি ? আমাদেরই বন্ধু সে—আমরা ত সেখানেই যাচ্ছি। কি নাম আপনার বলুন ত ?

যুবক হাসিয়া বলিল, নামটা এমন বিশেষ কিছু শ্রুতিমধুর নয়। হেমন্ত ব'ললেই তাঁরা চিনতে পারবেন। আপনিই বোধ করি সুধীরবাবু, আর তাহ'লে ওঁকে অক্ষয়বাবু হ'তেই হবে। আলাপ যে কখন কার সঙ্গে হয় ! কিন্তু এবার ওঠা যাক্।

হাত-মুখ ধুইয়া তাহারা ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে, এমন সময় পাশের ঘরে কে যেন খুব জোরে টানিয়া টানিয়া কাশিতে লাগিল। তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি ব্যস্ত হইয়া সেই ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিল, আপনারা বসুন গিয়ে, আমি এক্ষুণি আসছি আপনাদের ব্যবস্থা ক'রে দিতে।

তাহারাও আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিল। ঘরের মধ্যে মিটমিটে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহারই আলোয় তাহারা দেখিতে পাইল চৌকির উপর ছিন্ন একটি বিছানায় একটি বৃদ্ধ উপুড় হইয়া শুইয়া আছে, আর তাহারই পিঠে ওই মেয়েটি ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছে। চেহারা দেখিয়া তাহার বয়স অনুমান করিবার সাধ্য কাহারও নাই, ষাট হইতে উর্দ্ধতন যে কোন বয়সের বলিয়া তাহাকে চালাইয়া দেওয়া যায়।

হেমন্ত আগাইয়া গিয়া আরও গোটা দুই বালিশ এবং কাঁথা তাহার বুকের তলায় গুঁজিয়া দিল। বৃদ্ধ একবার চক্ষু তুলিয়া তাহার দিকে চাহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কাশির দমকে সক্ষম হইল না। কিন্তু হেমন্ত কোনদিকে না চাহিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

মিনিট পনের কাশিয়া বৃদ্ধ হাঁপাইতে লাগিল।

হেমন্ত বলিল, একটু তেল গরম ক'রে মালিশ ক'রে দিতে হবে এবার। আর সেই সাধুকে একটা খবর দিলেও ত পারেন, আর কোন কিছু না হ'লেও একটু সাহায্য ত পেতে পারেন তাঁর কাছে।

মেয়েটি বলিল, তিনি নিজেই আসেন মাঝে মাঝে, তাঁদের ডাকতে হয় না তাঁরা আপনিই টের পান। তিনি একটা ওষুধ দিয়ে গেছেন, তাই খাইয়ে দিতে হবে—তেলের দরকার নেই।—

প্রসন্ন হাসিতে হেমন্তর মুখ ভরিয়া উঠিল, আস্তে আস্তে সে বলিল, সেই ভাল ডাক্তারের কথাই শোনা দরকার, আমরা ত শুধু বাজে ডাক্তারীই করি।—সাধুজী যখন আছেন এর মধ্যে তখন আমাদের চুপ ক'রে থাকাই ভাল।—এসব সাধুরা সত্যিই মহৎ। নিজেদের চেয়ে পরকেই এরা মনে করেন বেশী, পরের কথা ভাবতে গিয়েই ঘর-সংসার এদের ভেসে যায়, অথচ সংসারী হবার অধিকার আমাদের চেয়েও তাঁদের কত না বেশী!

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক ব'লেছ বাবা, এঁরা মস্ত লোক। ওর মা মারা যাবার পর থেকে মেয়েটাকে আমিই আজ পর্য্যন্ত টেনে বেড়ালুম, কত কষ্ট যে গেছে সে আমিই জানি, কিন্তু কই এতটুকু দরদও ত' কারও হ'তে দেখলুম না। তাই গাঁ ছেড়ে এমনি একা একা আছি, কিন্তু ওই অল্পবয়সী সাধু এসে যেন সব গোলমাল ক'রে দিলে। আবার যেন গাঁয়ের জন্যে মন কেমন করে, বৃদ্ধ হাঁপাইতে লাগিল। মেয়ে আগাইয়া আসিয়া তাহাকে ওষুধ খাওয়াইয়া দিল।

বৃদ্ধ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, আমার জন্য কোন ভয়ই করি না, আর বেশী দিন আমার নেই, কিন্তু ওই মেয়েটা। কি যে করি।

মেয়ে বাধা দিয়া বলিল, তুমি চুপ কর বাবা, আর বেশী কথা ব'ল না।—

হেমন্ত বলিল, কোন ভয়ই আপনার নেই। সেই সাধুজী যখন আছেন, তখন ব্যবস্থা ত' হ'য়েই আছে। একটু বিশ্বাস চাই আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই—কিন্তু আপনি ঘুমোন আর একটা কথাও ব'লবেন না।

বৃদ্ধ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল আর একটি কথাও বলিল না।

মেয়েটি পাশের ঘরে তাহাদের শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সুধীর ও অক্ষয় আর বসিয়া না থাকিয়া শুইয়া পড়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করিল।

মেয়েটির কাছে আসিয়া হেমন্ত বলিল, একটা বাতি দিতে পারেন দিদি আমার একটু কাজ ছিল।

বাতি লইয়া হেমন্ত বসিয়া বসিয়া গোটা কয়েক চিঠি শেষ করিয়া যখন মাথা তুলিল তখন প্রায় তিনটা বাজে। তাহার লেখা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি কাছে আসিয়া বলিল, এবার একটু শুতে যান।

মৃদু হাসিয়া একটা চিঠি তাহার হাতে দিয়া হেমন্ত বলিল, কাল ঠিক আটটার সময় সাধুজী আসবেন তাঁর হাতে এটা দিয়ে দিবেন।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মেয়েটি বলিল, তিনি আসবেন সে কথা আপনাকে কে বললে? কাল'ত তাঁর আসবার কোন কথাই নেই।

তেমনি হাসিয়া হেমন্ত বলিল, কথা'ত অমন অনেক কিছুই থাকে না। কিন্তু চিঠিটা রইল, এলে দিয়ে দেবেন।

মেয়েটি বলিল, তা' হ'ক কিন্তু এখন শুতে যান।

হাত-ঘড়িটার দিকে চাহিয়া হেমন্ত বলিল, হাঁ যাব আর আধ ঘণ্টা বাদে, ততক্ষণ ব'সে ব'সেই একটু ঘুমিয়ে নি। কিন্তু আপনি আর জেগে থেকে অসুস্থ হ'যে সাধুজীর কাজ বাড়াবেন না।

মেয়েটি অবাক্ হইয়া বলিল, আধঘণ্টা বাদে যাবেন কোথায়?

হেমন্ত সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে, আপনিও শুতে যান। দেওয়ালে হেলান দিয়া চক্ষু বুজিয়া সে স্থির হইয়া রহিল।

পরের দিন ভোরে উঠিয়া তাহাকে আর দেখা গেল না।—সুধীর ও অক্ষয় বিস্মিত হইয়া উঠিল। মেয়েটি কিন্তু কিছুই বলিল না, শুধু মুখ

গম্ভীর করিয়া অভিমানে সে নানা কাজে নিজেকে ব্যস্ত করিয়া রাখিল। যে লোকটি আসিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত কিছু ওলট-পালট করিয়া দিয়া গেল তাহাকে কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল। সে কোথা হইতে আসিয়াছিল, কোথায়ই বা গেল এবং কেনই বা ওই গভীর রাত্রে কোন কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেল, তাহা না বুঝিলেও তাহার অদ্ভুত আচরণের কথা থাকিয়া থাকিয়া কেবলই তাহাকে আঘাত করিতেছিল। সে তাহার প্রশ্নের উত্তর দেয় নাই, কিন্তু তাহাকে ভুলিয়া থাকাও সম্ভব নহে!

সুধীর আর অক্ষয়ও আর দেরী না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত কাজ ফেলিয়া সে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। চারিদিকে বিরাট শূন্যতা তাহাকে তখন চাপিয়া ধরিতেছিল।

* * * *

যথাসময়ে সুধীর ও অক্ষয় যতীনের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিছু পূর্ব্বেই যতীন কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহার মাতা উহাদের সাদরে গ্রহণ করিলেন। সুধীরের দিকে চাহিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, —এতদিন আসনি কেন বাবা? একটা ভাল কৈফিয়ৎ চাই আমি।

সুধীর বলিল,—এদিকে ছিলাম না, থাকলে নিশ্চয়ই আসতাম।

যতীনের মাতা বলিলেন,—নিজের দেশকে ছেড়ে কি অমন বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। এ হতভাগ্য দেশটাকে তোমরা সবাই মিলে যে আরও হতভাগ্য ক'রে দিচ্ছ, সে কথা ভুললে ত' চ'লবে না। কিন্তু যাক ওসব কথা, হাত মুখ ধুয়ে একটু কিছু মুখে দাও ত' আগে।

দুপুর বেলা মাঠের কাজ শেষ করিয়া যতীন আসিয়া তাহাদের দেখিয়াই আনন্দে প্রায় লাফাইয়া উঠিল। সুধীরের একটা হাত সজোরে

নাড়িয়া দিয়া সে বলিল, হঠাৎ আকাশ থেকে নাকি ? অক্ষয় যদি সঙ্গে না থাকত ত' আমি এটাকে মিথ্যে স্বপ্ন অথবা ভোজবাজী বলেই মনে করতাম।

সুধীর কোন কথা না বলিয়া তাহার দৃঢ় কর্ম্মঠ দেহের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষে একসঙ্গে কৌতুহল এবং বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

হাসিয়া যতীন বলিল, কিহে অবাক হ'যে গেলে যে। আমাকে কি আর কোনদিনই দেখনি নাকি।

এতক্ষণে সুধীর বলিল, দেখেছি তোমাকে অনেকবার কিন্তু এমনভাবে ত' আর দেখিনি কথনও। ভাবছি এতথানি বদলালে কেমন ক'রে।

যতীন বলিল, এখন নয়, এসব কথা পরে হবে। ক্ষিদেয় পেটের অবস্থা একটু শোচনীয় হ'যেই উঠেছে। চল দেখি, আগের দিনের মত পুকুরে বেশ ক'রে সাঁতার দিয়ে আসি।

আহারের পর বাহিরে গাছতলায় মাদুর পাতিয়া বালিশে হেলান দিয়া তিন বন্ধু গল্প করিতে লাগিল। এমনি করিয়া কতদিন তাহারা কেবলমাত্র বসিয়া বসিয়াই কাটাইয়া দিয়াছে। হয়ত মাঝে মাঝে দুই একটা কথা হইয়াছে, কখনও বা কোন কথাই হয় নাই। পরস্পরের সান্নিধ্যেই পরস্পরে খুশী হইয়া উঠিয়াছে। আজ অনেক দিনের পর সে-দিন তাহারা ফিরিয়া পাইয়াছে। যতীন তাহার কাজকে তুচ্ছ করিয়া, সুধীর তাহার অলকাকে মনের এক কোণে ঠেলিয়া রাখিয়া আবার তেমনি করিয়া বসিয়াই হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে লাগিল। তাহারা তিনজন সেই পুরাতন মূর্ত্তিতেই ফিরিয়া আসিল।

সুধীর বলিল, কি ক'রে বদলালে তা ত' কই বললে না।

যতীন বলিল, তার চেয়ে চল আজ একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি তোমাদের।

অক্ষয় বলিল, ওর প্রশ্নের উত্তর কি এই আলাপ করিয়ে দিলেই মিটবে ?

যতীন বলিল, এই লোকটাই যে আমার বদলানর মূলে। তাকে দেখলেই বুঝতে পারবে তোমরা—এখানে সবাই তাঁকে সাধুজী ব'লেই জানে যদিও গেরুয়ার ধার-কাছ দিয়েও তিনি যান না।

সুধীর বলিল, হ্যাঁ শুনেছি বটে তাঁর কথা একজনের কাছে। সে লোকটা নিজে কেমন যেন একটু খেয়ালী ধরণের, ঠাট্টাও বড় করে না, কিন্তু সাধুজীর ওপর খুব বিশ্বাস দেখলাম। হয়ত অনেকেই তাঁকে বিশ্বাস করেন, এও তাদেরই একজন। তবে লোকটা সত্যি একটু অদ্ভুত, বৃষ্টি দেখে যার বাড়ীতে আশ্রয় নিলে, তাকে না ব'লেই যে কখন গেল বেরিয়ে। তাকে ত' তুমিও চেন যতীন। কি যেন নাম তার ?

সুধীর অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিল।

অক্ষয় বলিল, হ্যাঁ সাধুজীও তাকে চেনেন, নাম তার হেমন্ত।

যতীনের চক্ষে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, হ্যাঁ তাঁকে চিনি আমি, কিন্তু তবু ঠিক চিনি না। সাধুজীই তাঁর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, আর এটুকু বুঝেছি তিনি যেই হ'ন, সাধুজী তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করেন—কিন্তু তার বেশী আর কিছুই আমি বুঝিনি।

সুধীর বলিল, সাধুজীর কথা ত' খুবই শুনছি, কিন্তু কোথা থেকে এসেছেন তিনি, আর কিই-বা তাঁর উদ্দেশ্য, কি করছেন তিনি এখানে এসে ?

যতীন বলিল, কোথা থেকে এসেছেন জানি না, জিজ্ঞেস করলে বলেনও না শুধু হাসেন। করছেন অনেক কিছুই। ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে স্কুল, গ্রাম পরিষ্কার করা, রোগীর সেবা, ছেলেদের কর্ম্মঠ

করা, সঙ্ঘবদ্ধ করা কিছুই বাদ দেন না তিনি। সবচেয়ে বড় নজর তাঁর চাষীদের ওপর. কি ক'রে ক্ষেতের ফসল বাড়িয়ে তুলতে হয় তাও যেমন তিনি জানেন. তেমনই জানেন সহজভাবে কি ক'রে তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা জমিয়ে দিতে হয়। তারা তাঁকে দেবতা বলেই জানে। দেখলে অবাক্ হ'তে হয়, তাদের পরস্পারের মধ্যে কেমনভাবে সহানুভূতি, ভালবাসা বেড়ে উঠেছে। গাঁয়ের মূর্ত্তি গেছে বদলে। উদ্দেশ্য তাঁর এঁদের সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ করে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করা। আমার বিশ্বাস যে কাজ তিনি হাতে নিয়েছেন তা সফল হবে।

অক্ষয় বলিল, কিন্তু সারা ভারতবর্ষে গ্রামের ত' অভাব নেই, এই একটা গ্রামের কোণে বসে কত কাজই বা হ'তে পারে? এমনি ধীরে ধীরেই যদি কাজ করতে হয়. তাহলে এ জাতিকে আর বেঁচে থাকতে হবে না।

যতীন হাসিয়া বলিল, আমারও প্রথমে সে কথাই মনে হয়েছিল, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁকে। তিনি হেসে বলেছিলেন, এত বড় ভারতবর্ষে আমিই যে একা লেগেছি কে তা বললে? হয়ত অনেকেই আছেন এমনিভাবে ব্যস্ত, আর আছেন যে সে সত্যি। তাঁরা আমার নমস্য. ভারতের গ্রামই শুধু নয়, শহরও আজ বাদ যায় নি। আমি তাঁর কথা ঠিক বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝেছি যে, তিনি একা নন। আরও অনেকে ছড়িয়ে আছেন চারিদিকে—হয়ত সবাই একদলের।

সুধীর বলিল, এ ত' তোমার অনুমান।

যতীন বলিল. তা নিশ্চয়ই, কিন্তু এ অনুমান করা খুবই সোজা। যাঁরা নিজেদের কথা ভুলে পরের জন্যে কাজ করেন, তাঁরা কি তাঁদের মহৎ উদ্দেশ্যের কথা ভুলে যান মনে কর? তাঁরা অচেতনকে চেতনা দিতে চান,

তাই সঙ্ঘবদ্ধ না হ'য়ে এসব কাজে কখনই তাঁরা নামতে পারেন না। এ ত' হুজুগে মেতে থাকা নয়।

অক্ষয় বলিল, তুমিও তাঁদের দলে ঢুকে পড়েছ নাকি?

মাথা নাড়িয়া যতীন বলিল, না অতদূর স্পর্দ্ধা আমার নেই। আমার মা আছেন, স্ত্রী আছে, তাদের কথা নিয়েই ত' আমার সমস্ত সময় কেটে যায়। তারই ফাঁকে তাঁকে এতটুকু সাহায্য করতে পারলে অবশ্য আমি খুবই খুশী হই।

গাছের ফাঁক দিয়া একটি যুবককে তাহাদের দিকেই আসিতে দেখা যাইতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া অক্ষয় বলিল, কে একজন লোক এদিকেই আসছে না?

সেই দিকেই চাহিয়াই যতীন দাঁড়াইয়া উঠিল, আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিল, এদিকে আসুন সাধুজী। অনেক দিন বাঁচবেন কিন্তু।

সাধুজী ততক্ষণে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। সুধীর ও অক্ষয় তাহার মুখের দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। যাঁহাকে সাধুজী বলিয়া তাহারা শুনিয়া আসিতেছে, তিনি যে গেরুয়াধারী নহেন, তাহা তাহারা জানিত, কিন্তু তিনি যে তাহাদের অপেক্ষাও ছোট, মাত্র বছর বাইশের সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক, একথা তাহারা ধারণা করিতেও পারে নাই।

সাধুজী হাসিয়া বলিলেন, খুব তাড়াতাড়ি মরবার ইচ্ছেও আমার নেই। কিন্তু সবাই আমাকে সাধুজী বলে ব'লে আপনিও কি তাই ব'লবেন নাকি? আমার একটা সহজ নাম আছে, আর সেটা অনেকবার বলেছি আপনাকে, আবার মনে করিয়ে দিতে হবে কি?

যতীন হাসিয়া বলিল, যে নাম ধরে ডাকতে আমার ভাল লাগে, সে নাম ধরেই ত' ডাকব আমি, কিন্তু থাক নামের গোলমাল—এদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দি আগে।

হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া মৃদু হাসিয়া সাধুজী বলিলেন, এদের চিনি আমি, আপনাকে আলাপ করিয়ে দিতে হবে না। তারপর সুধীরের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, কয়েক দিনের মধ্যেই আপনার ওখানে যাব ভাবছিলাম সুধীরবাবু। আপনারা ত' বেশ বড় জমিদার তাই নিরাশ হব না নিশ্চয়। কিছু অর্থ সাহায্য চাই আপনার কাছে,—আপনাদের বিরুদ্ধেই ত' আমাদের অভিযান। কথা শেষ করিয়াই সাধুজী জোরে হাসিয়া উঠিলেন।

অক্ষয় বলিল, এমনি করে কি অভিযানে সফল হওয়া যায়? যার বিরুদ্ধে যাবেন আপনারা, সেই কি না করবে আপনাদের সাহায্য!

মৃদু হাসিয়া সাধুজী বলিলেন, আপনি ওঁর বন্ধু হ'য়েও ওঁকে ঠিক জানেন না। জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন আপনার বন্ধুকেই—তিনি আমাকে সাহায্য করতে রাজী আছেন কি না, তা তাঁর কাছেই জানতে পারবেন।

সুধীর ঘাড় নাড়িয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল।

সাধুজী হাসিলেন।

অক্ষয় বলিল, এক্ষেত্রে না হয় সাহায্য পেলেন, কিন্তু সব জায়গায়ই ত' তা মেলে না। যেখানে সাহায্য না পান সেখানে অভিযান কি বন্ধ রাখেন নাকি? নিজের পায়েই নিজে কুড়ুল মারে এমন বোকা আর কটা পাবেন। তার কণ্ঠে বিদ্রুপ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

সাধুজীর মুখের হাসি কিন্তু কিছুতেই মুছিয়া গেল না, তিনি বলিলেন, আর যাই বলুন, যুক্তি এবং উদাহরণ দিতে গিয়ে বন্ধুকে বোকা না বলাই ভাল। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার একটা শাস্ত্রসম্মত মত আছে। আমরাও তাই ক'রে থাকি। যে রোগীর কলেরা হয়েছে, তাকে কালাজ্বরের অষুধ আমরা দিই না।

অক্ষয় আর কোন কথা বলিতে পারিল না। কেবলমাত্র বিদ্রূপ করিবার জন্যই তর্ক করা যে ইহার সঙ্গে চলিবে না, তাহা সে খুব ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিল।

মাথা নাড়িয়া যতীন বলিল, এঁর সঙ্গে কথা ব'লে পারবে না অক্ষয়, সে চেষ্টাও ভবিষ্যতে আর ক'রো না।

সুধীর আস্তে আস্তে বলিল, আমিও আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই। আমাকে আপনার সহকর্মী করতে কি কোন আপত্তি আছে সাধুজী?

হাসিয়া সাধুজী বলিলেন, কেন, সাধু না হয়েই আমাদের মত ও নামটার ওপর খুবই লোভ হয়েছে বুঝি?

সুধীর বলিল, না সাধু হবার লোভ আমার নেই। আমি চেলা হ'তে চাই, আপ'ন নেবেন কি আমায়?

একটু বিস্মিত হইয়া সাধুজী বলিলেন, হঠাৎ কি কারণ হ'ল তা আমি জানতে চাই যে।

সম্মুখের দিকে চাহিয়া সুধীর বলিল, জীবনের আর কোন উদ্দেশ্যই নেই আমার, এখন দিন কটা শুধু কাটিয়ে দিতে চাই। জীবনটা ত' ব্যর্থ হ হয়েছে, বাকী দিনগুলা একটু কাজের মধ্যে দিয়ে যেতে চাই।

সাধুজীর চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য তীব্র হইয়া উঠিল, মুখের উপর দিয়া মুহূর্ত্তের জন্য একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার সেই শান্ত ভাব ফিরিয়া আসিল, সোজা সুধীরের চক্ষের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন পরের কাজ কি এতই সোজা যে, নিজের জীবন ব্যর্থ হ'য়ে গেলেও, তা করা যায়। নিজের জীবনেরই যদি কোন উদ্দেশ্য না থাকে ত' পরের জীবনকে মহান উদ্দেশ্যের মধ্যে বাঁধবেন কেমন ক'রে? এ-সব হয় না সুধীরবাবু, ফাঁকা মন নিয়ে ও-সব কাজ করা চলে না। আজ উঠি, আবার দেখা হবে—আর আমার টাকার কথাও ভুলবেন না।

বাড়ীর ভিতর হইতে একটি তরুণী বাহির হইয়া আসিয়া সাধুজীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মাসীমা আপনাকে ডাকছেন বিনয়-দা। তোমরাও এস দাদা বিকেল যে হ'য়ে গেছে।

সাধুজী হাসিয়া বলিলেন, তাই নাকি সতী দিদি, বিকেল হ'য়ে গেছে? তা হবে। কিন্তু বিকেল হ'য়ে গেলে কি করতে হয়?

সতী হাসিয়া বলিল, তা ত' বুঝতেই পাচ্ছেন। কিন্তু দেরী করলে মাসীমা রাগ করবেন। তরুণী ভিতরে চলিয়া গেল।

মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিয়া সাধুজী বলিলেন, এদেশটা বড়ই অদ্ভুত না সুধীরবাবু? কে যে কোথা থেকে এসে টান দেয় তা কে বলতে পার? ঘর ছেড়ে এসেও সত্যিকার ঘর ছাড়ার এতটুকু উপায়ও নেই। আসুন আমার কিছু কাজও বাকী আছে।

ভিতরে আসিয়াই একটা প্লেট টানিয়া সাধুজী বলিলেন, জিনিষগুলা ত' বেশ ভালই দেখছি।

যতীনের মা হাসিযা বলিলেন, তোমার ত' সব কিছুই ভাল লাগে বাবা। কাঁচা চিঁড়ে পেলেও তুমি এমন ভাব দেখাও যে, মনে হয় এমন জিনিষ বুঝি আর কখনই তুমি খাও নি, তুমি যে পাগল সে আমি খুব ভাল রকমই জানি।

সাধুজী হাসিলেন, কোন কথাই না বলিযা আহারে মন দিলেন।

অক্ষয় বলিল, জিনিষগুলা যে ভাল তা টের পেলেন কি ক'রে? সাধুজীর ধ্যান করার অভ্যাস আছে নাকি?

সাধুজী মুখ তুলিয়া বলিলেন, না ধ্যান নয়, এসব হচ্ছে জিহ্বার ব্যাপার। জিনিষগুলা দেখে আপনার জিহ্বার যে অবস্থা হয়েছিল, মনের মধ্যে যে আগ্রহ ফুটে উঠেছিল, আমারও তার ব্যতিক্রম হয় নি যে।

সুধীর বলিল, সাধুজীকে রাগাবার আর চেষ্টা ক'র না অক্ষয়।

যতীন বলিল, রাগ উনি করেনও না।

মাথা নাড়িয়া সাধুজী বলিলেন, রাগ ক'রতে জানি যথেষ্ট তবে গুরুর আদেশ আছে কিনা। তিনি সমস্ত রাগ মনের মধ্যে জমা ক'রে রাখতে বলেন, এতটুকুও যেন বেরিয়ে না যায়। ভগবানের জিনিস একদিন কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে তাঁকেই ফেরৎ দিতে হবে যে।

অক্ষয় বলিল, এই গুরুজীটি আবার কে।

সাধুজী হাসিয়া বলিলেন, কে যে তা' বলা বড় শক্ত, তবে আমরা চিনতে পারি। চারিদিকেই তাঁর চোখ। তাঁকে চিনতে গেলে তাঁর আশীর্ব্বাদ ছাডা আর কোন উপায়ই নেই।

সুধীর তাঁহার মুখের দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল, যতীনের মা অন্য কাজে উঠিয়া গেলেন, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অক্ষয় বলিল, ব্যাপারটা একটু রহস্যাবৃত হয়ে উঠল। গুরুটি কি দাগী ?

সাধুজীর দৃষ্টি সম্মুখের দিকে প্রসারিত হইল, আত্মগতভাবে তিনি বলিলেন, দাগ থাকা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয় ; কিন্তু যত দাগই বসান যাক প'চে শেষ হয়ে যাবার লোক তিনি নন। তিনি কথা দিয়ে কিছু করেন না—যা কিছু করেন, দুটো হাত দিয়ে শক্তভাবেই করেন।

ঠিক এমনি সময় পাশের গ্রামের হরিহর সর্দ্দার আসিয়া সাধুজীকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

সাধুজী বলিলেন, তোমার একটু দেরী হয়েছে হরিহর। আমি নিজেই যাচ্ছিলুম তোমার খোঁজে। মনে রেখো কোন কাজে দেরী করা ত' আমাদের নিয়ম নয়।

হরিহর বলিল, কি করব ঠাকুর—বাতাসীর ডাকে তাদের বাড়ী গিয়েছিলুম, কিন্তু কোন লাভই হ'ল না। ওর মাকে ধরে রাখতে পারা

গেল না।—বুড়িকে কিন্তু এখনও ঘরেই রেখে দেওয়া হয়েছে আপনার জন্যে। সে কয়েক মুহূর্তের জন্য বাহিরের দিকে চাহিয়া আবার সাধুজীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

সাধুজী বলিলেন, আমার জন্যে তাকে এখনও ঘরেই রেখেছে কেন? আমাকে খবর দিতে পাঠিয়ে ওদিককার ব্যবস্থা তোমরাও ত' করতে পারতে। আমার জন্যে একাজটাও ফেলে রাখবে? যদি আমি এখানে নাই থাকতুম অথবা মরেই যেতুম ত' করতে কি?

দুই কানে আঙ্গুল চাপিয়া হরিহর বলিল, ওকথা বলবেন না ঠাকুর, আপনি যদি না-ই আসতেন এ গ্রামে ত' দিন আমাদের কেটে যেত এক রকম কিন্তু আপনি এসেই ত' সব গোলমাল ক'রে দিয়েছেন, আর তাই আপনাকেই সমস্ত তাল সামলাতে হবে। বুড়ি মরবার আগে মেয়েকে বলে গেছে যে, ঘর থেকে বার করবার আগে আপনার পায়ের ধূলো যেন তার মাথায় দেওয়া হয়। আর ত' কোন উপায়ই নেই, পায়ে বেশ করে' ধূলো মাখিয়ে এখন চলুন আমার সঙ্গে।

সাধুজী দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, হরিহর তাঁহার অনুসরণ করিল। অনেক দূর আসিয়া একটু থামিয়া হরিহরকে তিনি বলিলেন, না তোমরা যে চিরকাল বোকাই থেকে যাবে তা' বুঝতে পেরেছি— ব'লে, আশী বছরে গয়লার বুদ্ধি হয় তা' এবার থেকে তাও হবে না।

হরিহর কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে নিতান্ত অপরাধীর মত চাহিয়া রহিল। শান্ত হইয়া সধুজী বলিলেন, সবার কাছে কি এসব কথা বলতে হয় হরিহর। ভদ্রলোকদের সামনে ওসব পায়ের ধূলোর কথা আর কখনও ব'ল না। কিন্তু আর দেরী নয়—চল।

পরের দিনও যতীনের কাজে যাওয়া হইল না, মজুরদের সেদিনকার কাজ বুঝাইয়া দিয়া বন্ধুদের লইয়া সে নিকটস্থ একটি বাড়ীতে আসিয়া

উপস্থিত হইয়া বলিল, এটি হচ্ছে আমার গ্রাম সম্পর্কে মাসীমার বাড়ী। একটি মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই তাঁর। তাকে দেখেছ কাল বিকেলে। খুব ভাল মেয়েটি, সতীনাম দেওয়া যে সার্থক হয়েছে তা' এ গ্রামের সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে।

সুধীর বলিল, হ্যাঁ কাল দেখেছি তাকে, খুব ভাল মেয়ে বলেই মনে হ'ল।

অক্ষয় একবার বক্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দূরে গাছগুলির ভিতরে কি যেন খুঁজিতে লাগিল। যতীনের মাসীমা তাহাদের ভিতরে লইয়া গেলেন। তাঁহার সৌম্য শান্ত চেহারার দিকে চাহিয়া আপনা হইতেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে।

সতী চা লইয়া আসিল।

কি এক সম্পর্ক থাকায় অক্ষয়ের সহিত তাহাদের পরিচয় ছিল, সতীকে চা আনিতে দেখিয়া সে হাসিয়া বলিল, বা লক্ষ্মী মেয়ের মত একেবারে ঠিক সময়েই যে।

লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া সতী বাহির হইয়া গেল।

সতীর মা বলিলেন, এটা আমার গর্ব্ব যতীন যে, গ্রামের সবাই ওকে ভাল বলে। কিন্তু সেই ভাল হওয়া ত' ওর কোন কাজেই এল না আজ পর্যান্ত। একটা ছেলেও কি পাওয়া যায় না, যার হাতে ওকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরতে পারি ?

যতীন বলিল, ভাল ছেলে অনেক আছে মাসীমা, ছেলে আর মেয়ের অভাব এদেশে কোন দিন হবে না।

মাসীমা হাসিলেন, সুধীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, অনেক আছে সেকথা স্বীকার করি কি করে। নমুনা ত' আজও পাইনি। তবে মেয়ের যে অভাব নেই তা' আমি জানি। তোমাকে, অক্ষয়কে আরও

কত লোককেই ত' বললুম; কিন্তু ছেলের খোঁজ ত' কই আজও মিলিল না।

অক্ষয় বলিল, ছেলেরা আজকাল বিয়ে করতেই চায় না।

মাসীমা বলিলেন, অথচ সবাই বিয়ে করে। ওটা হ'চ্ছে আমাদের মারবার যন্ত্র। এই যে আমার মেয়ে, শুধু আমার মেয়েই বা কেন এই এতটুকু গ্রামেও অনেক মেয়ে পাবে যারা কারও চেয়ে ছোট নয়; কিন্তু তাদের শেষ অবস্থা কি হয়! অনেককেই বলেছি, তোমাকেও বলি বাবা সুধীর, যদি পার এ মেয়েটার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিও।

সুধীর মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল—ইহার বেশী আর কিছু করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। সেই দিনই দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সুধীর ও অক্ষয় স্বগ্রামের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। অনেক দূর নিঃশব্দে চলিয়া আসিয়া সুধীর বলিল, যাবার সময় সেই মেয়েটির সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাওয়া উচিত নয় কি? সেদিন যদি তার সাহায্য না পেতুম তাহলে কি হত বলত'?

অক্ষয় বলিল, দেখা ক'রে যাওয়ার এমন কিছু দরকার আছে ব'লে ত' মনে হয় না। আর সাহায্য? সেত পাবেই। এ দেশের মেয়েদের কাছে বিপদের দিনে সাহায্য না পাওয়াবই যে উপায় নেই। পরের সেবা এবং সাহায্য করাই যেন এদের মজ্জাগত ব্যাপার। এদের বুঝবার সৌভাগ্য তোমার হয়নি—তাই বলি বন্ধু সময় থাকতে সে কাজ ক'রে ফেল। জীবনে দু'একটা ভুল ত' করেছ আর নাই বা করলে। সতীর মায়ের কথা মনে আছে কি?

অন্যমনস্কের মত সুধীর বলিল, মনে আছে, যদি অসাধ্য না হয় ত' তার ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব'।

অক্ষয় বলিল, হ্যাঁ, তোমার অসাধ্য হবে না, খুব ভাল একটা সম্বন্ধই ত' হাতের কাছে আছে।

তাহার দিকে ফিরিয়া সুধীর বলিল, ভাল সম্বন্ধ আছে অথচ সে-কথা তাদের বলোনি! কে সে?

সম্মুখের দিকে চাহিয়া অক্ষয় বলিল, তাকে তুমিই নাও—মেয়েটি খুবই ভাল।

সুধীর চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিল, আমি? তা হয় না অক্ষয়—আমার স্ত্রী বর্ত্তমান।

অক্ষয় বলিল, তোমার কাকা কিন্তু আশা করেন যে, তুমি বিয়ে ক'রবে।

সুধীর বলিল, কারণ?

অক্ষয় বলিল, তিনি ভেবেছেন তাঁর চিঠি পেয়েই তুমি এসেছ।

একটু বিরক্ত হইয়া সুধীর বলিল, সে ধারণা তার ভুল প্রমাণ ক'রে দিলে না কেন? তুমি ত' সমস্তই জান। এখানে আমি একটু বিশ্রাম নিতে এসেছি একথা স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিলে না কেন?

অক্ষয় বলিল, আমার মনেও একটু ভরসা ছিল তাই তাঁর অতবড় আশাটা ভেঙ্গে দিতে পারিনি।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, এখনও সে ভরসা আছে কি?

অক্ষয় বলিল, না।

* * * * *

সতীশের চক্ষের অবস্থা বিশেষ ভাল নহে বলিয়া অলকার বেশী দূরে যাইবার ইচ্ছা ছিল না। তাই অনেক তর্ক-বিতর্কের পর যখন দেওঘর যাওয়াই ঠিক হইল, তখন অলকা কতকটা নিশ্চিত হইল। লোকালয় হইতে দূরে তাহারা বাস করিবে, কেহ আসিয়া বিরক্ত করিবে না আর

সতীশের চক্ষু যদি নূতন কোন বিপদ বাধায় ত’ কলিকাতায় ফিরিয়া আসাও বিশেষ কোন অসুবিধাজনক হইবে না।

পরের দিনই তাহারা হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া পড়িল। অসুবিধা না হইলে সেও যে উহাদের সঙ্গী হইয়া সমস্ত দিক দেখিয়া শুনিয়া মস্ত বড় সুবিধা করিয়া দিতে পারিত—এই কথাই বার বার বলিয়া জগদীশ যাইবার সময় অলকাকে প্রয়োজনের সময় তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার কথা আর একবার স্মরণ করাইয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে যশীডি আসিয়া গেল। এতখানি সময় যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা অলকা ভাবিয়াও পাইল না। ওদিকের বেঞ্চে সতীশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অলকা ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু অমন সুন্দর ঘুম হইতে অকস্মাৎ তাহাকে উঠাইতে সে কিছুতেই পারিল না। কুলী ডাকিয়া সমস্ত মালপত্র তাহাদের মাথায় চাপাইয়া দিয়া অলকা ফিরিয়া দেখিল গোলমালে সতীশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সতীশ উঠিয়া বসিয়াছে বটে, কিন্তু ঘুমের ভাব তখনও তাহার যায় নাই।

মৃদু হাসিয়া অলকা বলিল, উঠুন, পোলটা পার হয়ে ওদিকে যেতে হবে যে। এ গাড়ী আপনাকে নিয়ে দেওঘর যেতে ত আর রাজী হবে না।

হাসিয়া সতীশ বলিল, যশীডি এসে গেছে তাহলে, ভালই হ’ল।

অলকা বলিল, না এলে বোধ হয় আপনার পক্ষে আরও ভাল হ’ত, ঘুমটা অমনভাবে মারা যেত না। কিন্তু নামবেন কি? ওরা কতক্ষণ আর মোট ঘাড়ে ক’রে দাঁড়িয়ে থাকবে?

সতীশ নামিয়া পড়িয়া বলিল, মোট-ঘাট সব চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে? সেকথা আগে বলতে হয়—সেই ভয়েই ত’ নামতে

চাইছিলুম না। কিন্তু এখনও ঘুম পাচ্ছে, গাড়ীতে ত' বসে থাকতে হবে অনেকক্ষণ, আমি আরও একটু ঘুম দিতে চাই—সেকথা আগে থেকেই ব'লে রাখছি।

অলকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বেশ তাই হবে, উঠেই সে ব্যবস্থা ক'রে দেব। এখন চলুন।

দেওঘরের গাড়ীতে উঠিয়া অলকা বিছানা পাতিয়া দিল এবং তাহা শেষ হইবামাত্রই সতীশ টান হইয়া শুইয়া পড়িল। ঘুমাইবার জন্যই যেন সে গাড়ীতে উঠিয়াছে, হাতের খবরের কাগজটা মুখের উপর চাপা দিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে এতটুকু না নড়িয়া শুইয়া রহিল।

অলকা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার ঠোঁটের উপর একটা মৃদু হাসি ভাসিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতেছিল মুখের উপর হইতে কাগজটা টানিয়া লইয়া জোর করিয়া তাহাকে উঠাইয়া দেয়—পুরুষ মানুষের এত ঘুম ভাল নয়, মেয়েরা তাহা সহ্য করিতে পারে না।

আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিতেছিল। দূরে এবং নিকটে অসংখ্য পক্ষী নানা জাতীয় শব্দ করিতে করিতে কুলায় ফিরিতেছিল। ঘরের আহ্বান তাহাদের কানে আসিয়াছে, সকলের কানেই সেই আহ্বান পৌঁছিয়াছে। অলকা উৎসুক হইয়া উঠিল—দেওঘরে কোন এক নূতন বাড়ীতে চলিয়াছে তাহারা, সেই গৃহকেই আপনার করিয়া লইতে হইবে। যদি ওই লোকটির চক্ষুর প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে তাহাদের ফিরিবার প্রয়োজনও সহজে হইবে না। একা উহার সঙ্গে থাকিতে আর তাহার এতটুকু আপত্তিও নাই। একদিনের ঘটনাই সে তাহাকে চিনিয়া লইয়াছে, চক্ষে বিষাদের চিহ্ন দেখিলেই যে নিজেকে সামলাইয়া লইতে পারে, ক্ষমার জন্য যাহার মন আকুল হইয়া উঠে তাহাকে আর যে যাহাই করুক মামার নিকট

শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সে কিছুতেই ছোট মনে করিতে পারে না। সতীশ রামহরিকে লইয়া আসিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে নিজেই তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছে। প্রতুলের জন্যই সে তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছে। সেই যে সে গিয়াছে আজিও ত আসে নাই, আসিবামাত্রই রামহরি তাহাকে খবর দিবে তারপর সে দেখিবে দিদিকে ফেলিয়া সে আবার কেমন করিয়া দূরে চলিয়া যায়। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক কথা তাহার মনের দুয়ারে আসিয়া ঘা দিতে লাগিল, সতীশ কিন্তু তখনও নিশ্চিন্ত মনেই মুখে কাগজ চাপা দিয়া শুইয়াছিল। জানালার বাহিরে দৃষ্টি ফিরাইয়া অলকা দূরের আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

অকস্মাৎ কে যেন দরজার বাহিরে আসিয়া ডাকিল, মণি এসেছিস্, আমার মণি? অলকা দৃষ্টি ফিরাইয়া সেইদিকে চাহিল, লাঠি-ভর করিয়া একটি বৃদ্ধ তাহাদেরই কামরার দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অলকা বলিল, কই না মণি ব'লে ত এ গাড়ীতে কেউ নেই।

বৃদ্ধ বলিল, নেই? তবে সে কোন্ গাড়ীতে আছে?

অলকা বলিল, তা ত' ব'লতে পারি না, এগিয়ে গিয়ে দেখুন।

বৃদ্ধ লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে আগাইয়া গেল, অলকা আবার জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ বৃদ্ধের কাতর ক্রন্দন ভাসিয়া আসিল। অলকা চমকাইয়া উঠিল, সতীশ উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি হ'ল, এ সেই বুড়োরই গলা না—যে মণিকে খুঁজতে এসেছিল?

অলকা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, খুব ঘুমচ্ছিলেন ত'?

সতীশও হাসিয়া বলিল, আমি একটু দেখে আসি অলকা—তোমার ভয় করবে না ত?

অলকা বলিল, না, ভয় আমার করে না, কিন্তু আপনি যাবেন কি ক'রে? অন্ধকারে ভাল দেখতে পাবেন না যে।

মৃদু হাসিয়া সতীশ বলিল, সে ঠিক অলকা, দৃষ্টিশক্তি ফুরিয়ে যেতে আর বেশী দেরী নেই আমার, কিন্তু আজও যে আমি কিছু কিছু দেখতে পাই। তুমি একটু ব'স, আমার দেরী হবে না।

সতীশ নামিয়া গেল, দরজা বন্ধ করিয়া মাথা বাড়াইয়া দিয়া অলকা তাহার দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া এই অন্ধকারের মধ্যেও উহাকে ঘিরিয়া রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রতুলকে সে জানে, বহুদূরের ক্রন্দন ভাসিয়া আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়, তাহারই বন্ধু হইয়া সতীশ কেমন করিয়া বৃদ্ধের ক্রন্দন শুনিয়াও অলসের মত চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবে?

সতীশ নামিয়া গিয়া দেখিল নিকটেই বৃদ্ধকে ঘিরিয়া কয়েকজন লোক জটলা করিতেছে। ঘটনা শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল যে, মণিকে খুঁজিবার সময় অন্ধকারে কাহার ধাক্কা খাইয়া বৃদ্ধ পড়িয়া গিয়া অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছে।

রেলের একজন কর্ম্মচারী নিকটেই আসিয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধকে দেখিয়াই সে আস্তে আস্তে বলিল, তাইত, এ-যে অরবিন্দবাবু দেখ্‌ছি, বেচারা!

সতীশ তাহারা কথা শুনিতে পাইয়া বলিল, আপনি ওঁকে চিনেন নাকি?

কর্ম্মচারী বলিল, চিনি এবং ভাল ক'রেই চিনি। উনি এখানকারই কর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু অবসর নেবার আগেই অন্ধ হয়ে যান।

সতীশ বলিল, অন্ধ হ'য়েও কি ক'রে তবে উনি মণিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন? আর মণিই বা কে?

কর্ম্মচারী বলিল, মণি ছিল ওঁর একমাত্র সন্তান। ছেলেটি খুবই ভাল ছিল, অন্ধ হওয়ার পর চাকরী গেলেও ছেলের ভরসাতেই তিনি

টিঁকে ছিলেন। ছেলেও চাকরী পায় এখানে। কিন্তু একদিন দেখা যায় যে, সে রেলে কাটা প'ড়ে আছে। তার আগের দিন রাত্রে তার ডিউটি ছিল—অনেকে সন্দেহ করে এ কুলীদের কাজ। মালগুদাম থেকে কতকগুলি কুলীকে চুরি করতে দেখে কিছুদিন আগে সে তাদের ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটার কোন কিনারাই আজ পর্য্যন্ত হয়নি। এখন এখানকার কর্ম্মচারীদের সাহায্যেই ওঁর দিন চলে। উনি কিন্তু ছেলের মৃত্যু-সংবাদ বিশ্বাস করেন না, ভাবেন কাজের উন্নতির জন্যে ছেলে বিদেশে গেছে, আসবেই একদিন। রোজ প্রত্যেকটা গাড়ীতেই উনি খোঁজ করেন তার।

সমস্ত ঘটনা শুনিয়া আগাইয়া গিয়া বৃদ্ধের হাত ধরিয়া সতীশ বলিল, উঠুন আর দেরী করবেন না, গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে মণি এলি ?

সতীশ বলিল, উঠতে পারবেন কি ? আমার কাঁধের ওপর ভর দিন। গাড়ী ছাড়বার আর কিন্তু বেশী সময় নেই।

বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সতীশের হাতে ভর দিয়া আগাইয়া চলিলেন। আনন্দে উৎসাহে তিনি তাহার সমস্ত বেদনাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এতদিনকার সঙ্গী লাঠিটাও যে পড়িয়া রহিল তাহাও ভুলিয়া গেলেন।

সেই বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া লইয়া সতীশকে আসিতে দেখিয়া অলকা বিস্মিত হইয়া উঠিল। ইহারা যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত সৃষ্টি তাহা সে বুঝিয়াছিল।

কোন প্রশ্ন না করিয়া অলকা দরজা খুলিয়া বৃদ্ধের হাত ধরিয়া তাহাকে উপরে উঠিতে সাহায্য করিল। উপরে উঠিয়া আসিয়া সতীশ তাহাকে নিজের বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

কয়েক মিনিট পরেই বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

অলকা বলিল, আর একটু দেরী করলেই হয়েছিল আর কি। দেওঘর ষ্টেশনে গিয়ে আমাকে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে থাকতে হ'ত, আর এদিকে—

তাহাকে বাধা দিয়া হাসিয়া সতীশ আস্তে আস্তে বলিল, মাথায় হাত দিয়ে ব'সে থাকতে হবে কেন! আর একদিনের মতই লোকের অভাব হ'ত না।

সতীশের প্রতি শ্রদ্ধায় অলকার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, দৈবক্রমে আজ যাহার সঙ্গিনী সে হইয়া পড়িয়াছে সে যে মহৎ ইহা মনে করিয়া সে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাইতেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, না আর কারও সাহায্য আমি চাই না। যা পেয়েছি তাই আমার যথেষ্ট আর বেশী সাহায্য সহ্য করবার মত শক্তি আমার নেই।

শুইয়া শুইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, কে বৌমাও সঙ্গে আছে নাকি? বেশ হ'লো; কিন্তু তুমি কে বাবা? আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি যে আমার মণি বেঁচে নেই। মানুষ যে ভাল হতে পারে তাও ভুলে গিয়েছিলাম, তাই মনে হ'ত মণি আমাকে ফেলে রেখে চলে গেছে। কিন্তু তোমার দয়া দেখে বুঝতে পারছি এ অসম্ভব—মণির পক্ষে আমাকে ফেলে যাওয়া অসম্ভব। তুমিই আমাকে বুঝিয়ে দিলে আজ যে সে বেঁচে নেই।

সতীশ বলিল, আমাকে মণির মতই মনে করবেন।

বৃদ্ধ বলিলেন নিশ্চই, তা যদি মনে করতে না পারতাম ত' তোমার সঙ্গে আসতাম কি করে? ছেলে আমার হারিয়েছিল, সুদশুদ্ধ আসল আজ আমি পেলাম। বৌমা কি রাগ ক'রে ব'সে আছে নাকি, একটা কথাও যে আর শুনছি না? বৃদ্ধের মুখে ম্লান হাসি ভাসিয়া উঠিল।

সতীশ অলকার মুখের দিকে চাহিল, অলকাও একান্ত লজ্জায় সতীশের মুখের দিকে একবার চাহিয়া উঠিয়া গিয়া বৃদ্ধের নিকটে বসিয়া বলিল, এই ত' আমি, রাগ করে থাকব কেন? আপনি চোখে দেখতে না পেলেও আমি ত' পাই।

বৃদ্ধ হাত বাড়াইয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, তাই ত' সেকথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার চোখ দিয়েই এবার সব কিছু আমি দেখব। তারপর উঠিয়া বসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন তোমার স্বামীর পরিচয় দাও মা। কি করেন উনি?

অতি লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া অলকা বসিয়া রহিল। মুখ তুলিয়া সতীশের মুখের দিকে অথবা ওই বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাইবার মত মনের অবস্থাও তখন তাহার ছিল না।

বৃদ্ধ এইবার একটু জোরেই বলিলেন, লজ্জা কি মা, এ প্রশ্নে লজ্জা পাবার দিন ত' আর নেই। পরিচয়টা দাও, কি করেন উনি?

তেমনিভাবে বসিয়া থাকিয়াই অলকা বলিল, কি করেন তা আমি জানি না।

বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, এইবার একটা শক্ত কথা বলেছ মা। এর ওপর আর কথা নেই অথচ এর চেয়ে মজার কথাও আর নেই। তারপর সম্মুখের দিকে চাহিয়া সতীশকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, তোমার পরিচয়টা ত এখনও পেলাম না বাবা।

সতীশের যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল, ব্যস্ত হইয়া সে বলিল, আমাকে ব'লছেন?

হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, বেশ ত, তোমরা দু'জনেই দেখছি সমান। তোমাকে ছাড়া আর কাকে বল্‌ব বল?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সতীশ বলিল, এমনি কাজকর্ম্ম কিছুই করি না, তবে কয়েকখানা বই লিখেছি এ পর্য্যন্ত। নিতান্ত অপ্রস্তুতের মত থামিয়া থামিয়া সে কথাগুলি শেষ করিল।

বৃদ্ধ সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, লেখক তুমি! তাই বুঝি পরের জন্যে এত ভাবনা?

সতীশ অলকার মুখের দিকে চাহিল, অলকাও তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। মুহূর্ত্তের জন্য চারি চক্ষের মিলন হইল, অলকা দৃষ্টি নত করিল, সতীশ বাহিরের দিকে চাহিল।

ধীরে ধীরে গাড়ী ষ্টেশনের ভিতর প্রবেশ করিল। সমস্ত কথা শেষ করিয়া এইবার নামিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

* * * *

অন্ধকারাচ্ছন্ন অপরিচিত পথ দিয়া ঘোড়ার গাড়ার একঘেয়ে শব্দ শুনিতে শুনিতে তাহারা শহরের নির্জ্জনতম অংশের ছোট একখানি বাড়ীতে আসিয়া পড়িল। ইহাই তাহাদের নূতন আশ্রয়, যেখানে কোন প্রশ্ন আসিয়া তাহাদের বিপদগ্রস্ত করিবে না, মানুষের ঘৃণা তাহাদের স্পর্শ না করিয়া দূরেই সরিয়া থাকিবে। সঙ্গের বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া তাহাদের মনে একটা সংশয় জাগিলেও, তাহা বেশীক্ষণ টিঁকিয়া থাকিল না। যাহার চক্ষু নাই, তাহার সমস্তই গিয়াছে—তাহার নিকট হইতে সমস্ত কিছুই লুকাইয়া রাখা সম্ভব। কিন্তু গোপন করার যে লজ্জা, তাহা হইতে তাহারা মুক্তই বা হয় কেমন করিয়া! কেন যে গোপন করিতে হইবে, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কি গোপন করিতে হইবে, তাহা মনে হইলেই অলকার বুকের সমস্ত রক্ত জল হইয়া যাইতে চায়। এমন করিয়া থাকা যায় না, অথচ কিভাবে যে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

পরদিন শহরটাতে প্রাথমিক দেখা দেখিয়া লইবার জন্য সতীশ বাহির হইয়া পড়িল। অলকা আসিয়া অরবিন্দবাবুর সম্মুখে দুধের বাটী রাখিয়া বলিল, একটু খেয়ে নিন দেখি।

অরবিন্দ বলিলেন, সতীশ বেরিয়েছে বুঝি? কিন্তু তুমিও গেলে না কেন মা? একটু না বেড়ালে স্বাস্থ্য ভাল হবে কি করে?

অলকা বলিল, স্বাস্থ্য আর ভাল হয়ে কাজ নেই আমার। যা আছে, তার ধাক্কা সামলানই দায়।

হাসিয়া অরবিন্দ বলিলেন, আজও হয়ত তা আছে, কিন্তু তাই বলে অহঙ্কার ক'ব না—ভবিষ্যৎ ত' এখনও পড়ে আছে। বাঙালীর মেয়েরা কুড়ি পার হ'লেই বুড়ি তা জান ত'?

বাটী তুলিয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে লইয়া অলকা বলিল, থাক সে-সব কথা এখন এটুকু খেয়ে নিন, নইলে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কাজ একটু বেড়ে যাবে আর তাতে স্বাস্থ্যও খারাপ হ'তে পারে।

অরবিন্দ বলিলেন, আমি নিজেই খেতে পারব মা। এ বুড়োর চোখ নেই বলে এতটা অক্ষম মনে করে লজ্জা দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি তুমি এসব কাজের ছুতো করে সতীশের সঙ্গে না বেরোও ত' আমাকে কিছুতেই খাওয়াতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি। আমি মাঝে পড়ে তোমাদের শান্তি ভঙ্গ করতে চাই না। এ জীবনের বাকী দিনগুলা আমার শান্তিতে কাটবে, তা আমি জানি, কিন্তু আমার মনের শান্তিও যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার ব্যবস্থা ত' করতে হবে।

অলকা বলিল, সকালে কি আমাদের আর কোন কাজই থাকে না, যে বেড়াতে গেলেই হ'ল। এসেছি যখন, তখন দেখবই ত' সব, কিন্তু আজ সকাল থেকেই কি যেতে হবে নাকি?

অরবিন্দ বলিলেন, না মা আমার কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না।

এরা সাহিত্যিক, এরা মস্ত বড়। আমাদেরই মনের দুঃখ, মনের সমস্ত কথা আমরা প্রকাশ করতে না পারলেও এরা প্রকাশ করে দেয়। এদের এতটুকু ক্ষতি হলে আমাদেরই ক্ষতি। তুমি ঠিক বুঝছ না মা, ওর সঙ্গে সব সময়েই তোমার থাকা একান্তই উচিত। সঙ্গে থেকে ওর মনে সব সময়েই আনন্দ জাগিয়ে রেখ।

অলকার হাত কাঁপিয়া উঠিল, বুকের ভিতরটা কে যেন নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইল। এ সমস্ত কথার অর্থ সে বোঝে। তাহাকে উহারই স্ত্রী মনে করিয়াই না আজ বৃদ্ধের এত উপদেশ। স্ত্রী কথাটা মনে হইলেই তাহার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া যায়। সে স্ত্রী সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণে যাহাকে তাহার স্বামী বলিয়া মনে করে, সে তাহার কেহই নহে এবং সে যে তাহার কেহই নহে; একথা বলিবারও পথ অনেক সময় খোলা থাকে না। অন্য কোন মেয়েকে এমনি বিপদে পড়িতে হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হয় না, হয়ত এমনি করিয়াই তাহাকে ডুবিতে হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত কোথায় যে তল মিলিবে, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।—কিন্তু যাহাই হউক, এ বৃদ্ধকে আর কিছুই বলা যায় না। উহার বাকী জীবনের শান্তির কোন বিঘ্ন ঘটিতে দিতে আর সে চাহে না। তাহার নিজের জীবনের সমাপ্তি কোথায়, তাহা সে জানে না, কিন্তু উহার সমাপ্তি যে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, তাহা সে বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়াছে বলিয়াই নীরব থাকিতে চায়।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অরবিন্দ বলিলেন, আমার একটা ছেলেকে আমি হারিয়েছি, কিন্তু তার বদলে যাকে পেয়েছি, তার এতটুকু অসুবিধেও আমি সইতে পারব না। আমি অন্ধ বলে যে আমাকে ফাঁকি দেবে, তাও চলবে না। ওকে অবহেলা করে কেউ আমার ক্ষমা পাবে না, বউ বলে তুমিও নও।

ধীরে ধীরে অলকা বলিল, অবহেলা তাঁর কোনদিনও হবে না, এ ভরসা আমি আপনাকে দিতে পারি। অন্তত আমি যতদিন আছি সে ভয় আপনাকে করতে হবে না।

মহা খুশী হইয়া হাসিয়া হাত বাড়াইয়া অলকার মস্তক স্পর্শ করিয়া অরবিন্দ বলিলেন, সে আমি জানি মা। সে যেখানেই থাক, তোমার স্নেহচ্ছায়া যে সেখানেও তাকে ঘিরে থাকবে, এ আমি জানি। অনেক কষ্টে এ জ্ঞান আমার হয়েছে। আজ মণির মাও নেই, মণিও নেই, আমি কি সে-সব না বুঝে পারি। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিযা চক্ষু মুছিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অলকা বলিল, আগে খেয়ে নিন, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে ভারী অসুবিধা হবে যে।

বৃদ্ধের সারা মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আর কোন কথা না বলিয়া তিনি নিঃশব্দে সমস্তটা পান করিয়া ফেলিলেন।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া অলকা বলিল, এবার একটু শান্ত ছেলের মত চুপ করে থাকুন, আমি ও দিককার কাজগুলা শেষ করে নি।

অপরাহ্নে সতীশকে আহারে বসাইয়া অলকা একটু দূরে বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে অরবিন্দ আগাইয়া আসিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, আমাকে ত' আগেই খাইয়ে দিযেছে, বুড়োকে সবাই করুণা করে, সে আমি জানি। কিন্তু দেবী হয়ে যাবে বলে ভয় দেখান আমাকে কেন। আমি কি সময়টা ঠিক বুঝতেই পারি, যে, আমাকে ও-সব মনে করিয়ে দেওযা? কাদনেই অকেজো হয়ে যাব দেখছি। এর আগে কেই বা খাইযে দিত, আর কেই বা অমন করে ব্যস্ত হয়ে উঠত। অবাক হয়ে যাই মানুষের ভাগ্য দেখে!

সতীশ মাথা তুলিয়া বলিল, ভালই করেছেন। আমার জন্যে এতক্ষণ বসে থাকা আপনার পক্ষে মোটেই উচিত হ'ত না, আর তাহ'লে সত্যি

আমার নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হ'ত। এই ত' বেশ হয়েছে—কাছাকাছি বসে থাকাটাই ত' আসল কথা।

হাসিয়া অরবিন্দ বলিলেন, তা ঠিক, আর যা কড়া প্রহরী আছে, তাতে কোনদিকেই অনিয়ম হবার ভয় নেই। তবে তোমার বেলা যেন একটু বেশীরকম ছাড়পত্র আছে দেখছি। এতক্ষণ ছিলে কোথায় ?

সতীশ বলিল, গিয়েছিলুম কাছেই একটা মাঠে বেড়াতে। কয়েকটা বড় বড় পাথরও দেখতে পেলুম। কে একজন অদ্ভুত আবিষ্কার করেছেন সেখানে। সুর-অসুরের সময়ে সমুদ্র মন্থন হয়েছিল নাকি ওখানেই। বাসুকী, শঙ্খ, চক্র, এমন কি, শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকা পর্যান্ত আছে, অবশ্য আজ সবই পাথর। দেখলুম সব, নিজেও একটা আবিষ্কার করে ফেললুম—সেই ঐরাবত। ভাবছি সেই আবিষ্কারককে ধরে সেটাও দেখিয়ে একটু বাহাদুরী নেব। কয়েকটা ফুলও দেখলুম সেই সব ভগবানের মাথায় আর পায়ে। কথা শেষ করিয়া সতীশ হাসিয়া উঠিল।

অরবিন্দ বলিলেন, আমরা বুড়ো মানুষ, এসব নিয়ে তামাশা করবার ভরসা এখন আর আমাদের নেই। তারপর একটু নড়িয়া বসিয়া বলিলেন, ওই মাঠেই এতক্ষণ এসব আবিষ্কার করা হচ্ছিল বুঝি ?

সতীশ হাসিয়া বলিল, না, ওখানে গিয়েছিলুম আর এক জায়গায়। এ জায়গটার গুণ আছে বলতে হবে—সমস্ত কিছুতেই একটা নূতনত্বের ভাব আছে আর মজাও আছে বেশ। ওই মাঠেই আর কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হল। তাঁদের কাছে শুনলুম, কাছেই একজনের বাড়ীতে একটা গানের জলসা হবে। গেলুম সেখানে—সাধারণের প্রবেশ নিষেধ না হলেও অসাধারণ নিমন্ত্রিতও ছিলেন সেখানে। আসর বসেছিল ঘরের মধ্যে আর আমরা, যাঁরা সাধারণ, বসেছিলুম বারান্দায়। মনে হচ্ছিল চলে আসি, কিন্তু একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে বলেই বসে রইলুম।

অলকা আর না থাকিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল, সাধারণ অসাধারণ ত' বুঝলুম, কিন্তু সে-সব এখন একটু থামবে কি? থালার ওপর যে-সব জিনিষ আছে, সে-সব যে শক্ত হয়ে উঠবে।

অরবিন্দ বলিলেন, ঠিক বলেছ মা, আমার খেয়ালই ছিল না। না আর কথা নয়, তুমি চুপ করে খেয়ে ওঠ তারপর সব কিছু শোনা যাবে।

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া মনোযোগের সহিত আহার করিয়া মাথা তুলিয়া সতীশ বলিল, বসে থেকে কিন্তু ভালই করেছিলুম। বেশ একটা নূতন অভিজ্ঞতা হ'ল। কতকগুলী লোক থাকেই যাদের ব্যবহারের সঙ্গে আমাদের কোথাও কোন মিল নেই। আমরা যদি ভগবানের কারখানায় মিস্ত্রীর হাতে তৈরী হয়ে থাকি ত' তারা যে ভগবানের নিজের হাতের তৈরী তা আমি জোর করেই বলতে পারি। আজ যদি নিজের সম্মানটাকে বড় মনে করেই ওখান থেকে চলে আসতুম ত' আমার অভিজ্ঞতার ইসিহাসে মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে যেত।

অলকা বলিল, একটা জিনিষ মানুষকে কতবার মনে করিয়ে দিতে হয়? সবাই এমন কিছু বিরাট পুরুষ নয় যে, একসঙ্গে দুটো কাজ করতে পারবে। কথা বেশী বললে খাওয়া আর হয় না।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া অরবিন্দ বলিলেন, বুড়ো হলে মানুষের বুদ্ধি যে সত্যিই কমে যায়, তা এতদিন বিশ্বাস করতুম না। আমি উঠে যাচ্ছি, খাওয়া শেষ হলে সমস্ত কথা শুনব।

সতীশ বাধা দিয়া বলিল, না আপনি উঠবেন না, আমি আর কোন কথাই বলব না। মাথা নীচু করিয়া সে আহারে মন দিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই, মাথা তুলিয়া অলকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আর কিন্তু খেতে পারছি না। পেটটা ভয়ানক ভরে গেছে—আর এতটুকু খেলেই, উঃ। হাত তুলিয়া সে অলকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অলকা বলিল, না পেট যে ভরেনি. কথাগুলাই পেটের মধ্যে ভর্ত্তি হয়ে আছে। কিছুক্ষণ ও-সব ভুলে গিয়ে একটু মন দিয়ে খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

অরবিন্দ বলিলেন, না খেয়ে নিলে আমিও আর কিছু শুনব না।

আরও দুই এক গ্রাস মুখে তুলিয়া অত্যন্ত মিনতিপূর্ণ ভাবে অলকার দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল, সত্যি আর হবে না। পেট আমার অনেকক্ষণই ভরে গেছে।

হাসিয়া ফেলিয়া অলকা বলিল, আচ্ছা কথা বলতে বলতে খেলেও আর আমি আপত্তি করব না।

অরবিন্দ হাসিয়া বলিলেন, এরা পাগল মা, একেবারেই পাগল। খাওয়া-পরাই কি এদের কাছে খুব বেশী বড় নাকি? আর সাধারণের মত এদের হ'তেও বলি না আমি। ওরাও যদি বিশেষত্বহীন হয়ে পড়ে, তবে আমাদের মত লোকদের দেখবে কে?

কথাটা অলকাকেও কি জানি কেন আঘাত করিল। একবার মাত্র সতীশের দিকে চাহিয়াই সে মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল। অরবিন্দ নিজের জন্য যে কথা বলিলেন, তাহাই যে কতখানি সত্য হইয়া অলকার জীবনেই প্রকটিত হইয়াছে, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। এ সত্য সে সারা দেহ-মনকে একত্রিত করিয়া অতি শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিয়াছে। এমনি স্বেচ্ছায়ই যদি উহারা পরকে বহিয়া না বেড়াইত, তাহা হইলে তাহার নিজের যে কি হইত, তাহা ভাবিতেও সে চাহে না। এমনি নিঃস্বার্থ উপকারকেও যে কেমন করিয়া কুটীলতাপূর্ণ মনে করিয়া মানুষ মানুষকে ঘৃণিত মনে করিয়া দূরে সরিয়া যায়, কেমন করিয়া যে তাহার অন্তরকে দলিত-মথিত করিয়া ধূলায় মিশাইয়া দিতে চাহে, তাহা সে ভাবিয়াও পায় না।

সতীশ বলিল, না, থাওয়ার আর কোন উপায় রইল না। এবার মহাত্মা উপাধিটার জন্যে একটা দরখাস্ত করে দেব।

অরবিন্দ বলিলেন, এর জন্যে দরখাস্ত করতে হয় না, এ-সব আপনি এসে কখন যে কাঁধে ভর করে, তা' কেউ জানতেও পারে না, আর একবার কাঁধে চেপে বসলে মুক্তি পাবারও কোন উপায় থাকে না।

হাসিয়া সতীশ বলিল, আপনার সোজা মতটা বেশ সহজ ভাবেই পাওয়া গেল, এবার আর একজনেরটা পেলেই কাগজে নাম ছাপাবার ব্যবস্থা করা যাবে। সতীশ অলকার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

অলকা হাসিয়া ফেলিয়া আগাইয়া আসিয়া থালাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, খাওয়া ত' হয়েছে, এবার উঠলেই ত' হয়। বসে বসে বক্তৃতা দিয়ে নিজেকে প্রচার না করলেও চলবে।

সতীশ বলিল, আরও একটু খাব ভেবেছিলুম যে, কি মুস্কিল।

অলকা বলিল, আর না খেলেও চলবে। আমার ক্ষিদে পেয়েছে, আর দেরী করতে আমি পারব না।

সতীশ বলিল, থালাটা ত' তোমার নিয়ে যাবার কথা নয়। লোক ত' আছেই, তবে—।

অলকা বলিল, থালা সামনে থাকলে কথাও সমানে চলবে। থালাটা নামাইয়া রাখিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল।

সতীশ অরবিন্দবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনি বসুন গিয়ে, আমি এখনি আসছি—গল্পটা শেষ করতে হবে ত'। অবশ্য গল্প না বলে ঘটনা বলাই ভাল।

অরবিন্দ ঘরে যাইতে যাইতে বলিলেন, সে হবে না বাবা, বৌমাকেও আসতে দিতে হবে। আমরা দু'জনেই তোমার শ্রোতা ছিলুম, একজনকে বঞ্চিত করতে আমি চাই না।—

সতীশ আর কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল।

দুপুরে ইজিচেয়ারে শায়িত অরবিন্দবাবুর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অলকা বলিল, এবার সেই গল্পটা ত' হতে পারে।

অরবিন্দ বলিলেন, গল্প নয় মা,—ঘটনা। গল্প বললে সতীশ রাগ করতে পারে।

সতীশ বলিল, রাগ করতে পারে নয়—রাগ করবেন, হয়ত এতক্ষণ করেই বসেছি।

অরবিন্দ বলিলেন, সাধারণভাবে এমনি অনেক কিছুই আমরা ব্যবহার করে থা'ক, যার সত্যিকার মানেই হয়ত অন্যরূপ। এই যে তোমার রাগ হচ্ছে, সেই রাগ কথাটাই চলিত অর্থ ছেড়ে দিয়ে আসল অর্থে চলে গেলে কি অবস্থা হয় বলত? অবশ্য এক্ষেত্রে সে অর্থও রাগ হতে পারে, নয় মা? অলকার হাতটা তিনি সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলেন।

অলকা তাহারই চেয়ারের আড়ালে নিজের মুখখানা লুকাইয়া ফেলিল। কথাটা যেন একটা বিশেষ অর্থ লইয়া তাহাকে এবং তাহারই সম্মুখে উপবিষ্ট আর একটি লোককে কেন্দ্র করিয়া সেই কক্ষেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে না পারিল কথা কহিতে, না পারিল মুখ তুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিতে। নিজের মুখের স্পষ্ট রূপ তাহার নিজের কাছেই তখন ধরা পড়িয়া গিয়াছিল।

অরবিন্দ বলিলেন, এবার তোমার সেই ঘটনা সুরু কর।

অলকার দিকে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সতীশ আরম্ভ করিল, ওখান থেকে উঠে আসব ভেবেও ব'সে রইলুম, কারণ আমারই মত সবিশেষ অভ্যাগত আরও কয়েকজন ছিলেন সেখানে। তাঁদের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দিয়ে নিস্তব্ধ মালগাড়ীর মতই একপাশে প'ড়ে রইলুম। ঘরের ভেতরে একটু জায়গা ছিল, বাইরের

কয়েকজন আমাকে লক্ষ্য ক'রে ব'ললেন,—ভেতরে যাওয়া যায় না ? ও আসরের নিয়ম আমার জানা ছিল না, ব'ললুম ঠিক ব'লতে পারিনে, তবে জায়গা যখন আছে, তখন গিয়ে দখল ক'রলে এমন কিছু আপত্তি হওয়া ত উচিত নয়। এ যখন বিয়ের বাসর নয়, অন্দর মহলও নয়, বরং বাইরের লোকই এখানে প্রায় সব, তখন ওটুকু ভেতরে ঢুকলে কোন পক্ষেরই কোন বিপদ না ঘটাই সম্ভব।

ওদের একজন ব'ললেন, ব্যাপারটা আপনি আরও একটু গুরুতর ক'রে তুললেন দেখছি। সোজা যদি সাহস দিতেন ত যাওয়া যেত, কিন্তু এ অবস্থায়।—

আর একজন ব'ললেন, চলই না যাই, কি এমন আর হ'তে পারে, মার ত আর দিতে পারবে না।

হেসে ব'ললুম, না, মার দেবে না তবে একটু অপমান ক'রতে পারে। গিয়েই দেখুন না কি হয়, ওদের কৌলীন্যের সঙ্গে ভদ্রতাও আছে কি-না, সেটাও ত জান্‌তে পারবেন অন্তত।

অরবিন্দ হাসিয়া বলিলেন, অর্থাৎ এবার তুমি তাদের সোজাভাবে সাহস দিলে। গল্প শুনিতে শুনিতে অলকা কখন যে সহজ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা জানিতেও পারে নাই। অরবিন্দবাবুর কথা শুনিয়া সেও না হাসিয়া পারিল না।

সতীশ মৃদু হাসিয়া বলিল, কি ক'রব, একটু সাহস তাঁদের দিতেই হ'ল। ব'লেছি ত অভিজ্ঞতার জন্যে সম্মানকে কিছুটা বিসর্জ্জন দিতেই হয়। আমার কথা শুনে তাঁরা ভেতরে ঢুক্‌তে গেলেন। কর্ম্মকর্ত্তা অর্থাৎ গৃহকর্ত্তা বাধা দিয়ে ব'ললেন, আপনারা বাইরেই বসুন, এখানটায় আমাদের সভাপতি ব'সবেন। ভদ্রলোকেরা ভেতর ঢুকতে না পেরে দরজার সামনে ব'সে প'ড়লেন। আমার পাশে একটি বছর চব্বিশের

যুবক ব'সে ছিল। সে তাঁদের দিকে চেয়ে খুব জোরে হেসে উঠ্‌ল। তাঁরা অপ্রস্তুত হ'যে পড়লেন।

আমি ব'ললুম লজ্জার কিছু নেই এতে, আর হাসবারও কিছু নেই। অপমান যদি ওঁদের হ'যে থাকে ত আমরাও বাদ পড়ি নি।

যুবক আমার মুখের দিকে চেয়ে তেমনি হাসি হেসেই ব'ললে, আপনি লেখেন বুঝি ?

আমি অবাক হ'য়ে গেলুম, তার মুখের দিকে চেয়ে ব'ললুম, কেন একথা মনে হ'ল আপনার ব'লতে পারেন ?

যুবক ব'ললে, আপনার ব্যাখ্যা শুনে। অপমান যদি আপনার সত্যি হ'যেই থাকে ত তার শোধ নিন। কিছু যদি নাই পারেন ত' অসহযোগ ত' প'ড়েই আছে। তবে আমার মনে হয়, থেকে যান শেষ পর্য্যন্ত, মজা আরও বেশ খানিকটা হ'তে পারে। বেড়াতে এসেছেন, একটু আমোদ না ক'রলে কি শরীর ভাল হয়।

ব'ললুম, তাই বুঝি মজা ক'রতে ব'সেছেন ? নিজেদের অপমান দেখে আমোদও হ'চ্ছে, কি বলুন ?

যুবক ব'ললে, চটেছেন দেখছি। কিছু রক্ত আপনার মধ্যে আছে তা'হলে। কিন্তু ওদিকে চেয়ে দেখুন, ওঁরা আর এসব কথায় কানই দিতে চাইছেন না। অপমান হ'য়েছে কার ব'লুন ত ?

আর কোন কথাই ব'লতে পারলুম না। কিন্তু ওই শেষ কথাগুলোও মন থেকে তাড়াতেও পারলুম না। প্রত্যেকটা কথাই সত্য, যেন ওজন ক'রে বলা, অনুভূতি দিয়ে জানা অপমান ব'লে কোন কিছুর অস্তিত্বই আমাদের জানা নেই, তা কেউ কেউ বিশ্বাস ক'রতে না চাইলেও এরা যেন অতি সহজেই জান্‌তে পেরেছে। কেবল কতকগুলো কথা দিয়েই আমরা আমাদের ভুলিযে রাখি, মনের দুর্ব্বলতা স্পষ্ট বুঝতে

পেরে সবাইকে ক্ষমা করাই আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস। চ'লে আসব ভাবছিলুম, কিন্তু তার কথাতেই চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হ'ল।

একটু দম লইয়া সতীশ বলিতে লাগিল—সভাপতি কখন যে আমাদের অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে ছিলেন টের পাইনি। সভাপতি বরণের পর অসাধারণ অভ্যাগতদের করতালির ক্ষীণ ধ্বনিতে ভেতরদিকে চেয়ে দেখলুম সঙ্গীত আরম্ভ হবার ব্যবস্থা চলেছে। সেতার-বাদক মৃদু হাসির সঙ্গে তান তুলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, আর তবলচী ছোট হাতুড়ী নিয়ে তারও সঙ্গে সুরের মিল করবার জন্যে একটা কান আকুল আগ্রহে সেদিকে এগিয়ে দিয়েছেন। শ্রোতার দলের মধ্যে কিন্তু আগ্রহ নেই। সভাপতির পাশে বসে কর্ম্মকর্ত্তা ফিস্ ফিস্ করে কত কি আলোচনাই করে যাচ্ছেন বুঝলুম না। আমি দূরে বসে সব কিছুই লক্ষ্য করতে লাগলুম।

অরবিন্দ বলিলেন, চমৎকার, সমস্ত ঘরটাই আমার অন্ধ চোখের সামনেও ফুটে উঠেছে।—

সতীশ বলিল, এদিকে সেই যুবকটী পকেট থেকে ছোট একটা ক্যালেণ্ডার বার করে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন :—দিন পনের পরের একটা তারিখের ওপরই তার খুব নজর বলে মনে হল। পেনসিল দিয়ে অনবরত সেটার ওপর দাগ কাটছিলেন তিনি। আক্রোশ না আগ্রহ ঠিক বুঝলুম না।

অলকা বিস্মিত হইযা বলিল, জলসায় বসে ক্যালেণ্ডার, আশ্চর্য্য !—

সতীশ হাসিযা বলিল, আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। ওখানে বসে তিনি যদি অঙ্কও কসতেন তবু আমি আশ্চর্য্য হতুম না। ওদিকে সেতার সুরু হয়ে গেলো। বাদকের হাতের চেয়ে মাথা নড়তে লাগল বেশী। মনে হল মাথাটা বুঝি খুলেই পড়ে যাবে। মাথাটা সামনে ঘুরতে লাগল

লাটীমের মত, আমি অবাক হয়ে গেলুম -যুবক তখনও তার কাজেই ব্যস্ত। ক্যালেণ্ডারের ওই তারিখটাকে সে যেন খুবই ভালবেসে ফেলেছে। ওদিকে সঙ্গীত ও সঙ্গত পুরাদমেই চলতে লাগল।—অবাক হলেও আর থাকতে না পেরে তার দিকে চেয়ে বললুম আপনি কি গান শুনবেন না জায়গা জুড়ে বসে থেকে তারিখ দেখবেন?

ও আমার মুখের দিকে একবার মাত্র চেয়েই ঘরের ভেতর দৃষ্টিপাত করে জোরে হেসে উঠল।—

আমি চমকে গেলুম, পাশের লোকেরা চেয়ে দেখলে।

কর্ম্মকর্ত্তা বেরিয়ে এসে বললেন, কি করছেন মশাই? হাসতে যদি হয় ত এখানে নয় —ও সব নিজেদের আড্ডার জন্যে জমিয়ে রাখুন।—

অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া অলকা বলিল, সে ছেলেটী কি করলে? সে নিশ্চয়ই উঠে চলে গেল আর অন্য সবাইও—?

হাসিয়া সতীশ বলিল, না কোনটাই হয়নি।—কিন্তু যা হয়েছে তা বোধহয় আরও মজার।—

কর্ত্তার কথা শুনে যুবক বললে, আপনারা কি জেলে যেতে চান নাকি? হাসপাতালে নিয়ে জাবার জন্যে গাড়ী ঠিক করে রেখেছেন ত?

আমরা অবাক হয়ে গেলুম, কর্ম্মকর্ত্তা অবনীবাবু চমকে উঠে বললেন, বলছেন কি আপনি? জেল, হাসপাতাল? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।—

সঙ্গীত তখনও সমানেই চলছিল। এসব সামান্য গোলমালের প্রতি নজর দেওযার অবসর সেতার বাদক অথবা তবলচীর ছিল না। তাদের মাথা আর হাত যেন যন্ত্র, আর সেগুলো চলছিল যেন মন্ত্রের জোরে।—সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিযে যুবক বললে, ওর মাথা যদি ছিঁড়ে যায় অথবা অমনি কোন একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে তখন কি করবেন

আপনি ? ওকে একটু স্থির হ'তে বলুন না। অপঘাতে মৃত্যু হলে বাড়ীটারও যে একটা বদনাম দাঁড়িয়ে যাবে।—

কথা শুনে আমরা না হেসে পারলুম না, অবনীবাবুও হেসে ফেললেন।

অরবিন্দ হাসিয়া বলিলেন, সেই ছেলেটিকে একবার এখানে নিয়ে আসতে পার না ? চমৎকার তার মৌলিক গবেষণা আর তার চেয়েও চমৎকার তার গাম্ভীর্য্য।—

অলকা বলিল ওটা আপনার খোসামোদী কথা কাকাবাবু। একটু ভাল লাগলেই আপনি ওরকম উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। সত্যিকার দাম তার যা তার চেয়েও ঢের বেশী দাম তাকে আপনি দিয়ে ফেলেন—তারা যাই হ'ক আপনি যে মহৎ তাই শুধু তাতে প্রমাণ হয়।—

হাত বাড়াইয়া অলকাকে কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অরবিন্দ বলিলেন, তা নয় মা তা নয়। আমরা অনেক দেখেছি, মানুষকে চিনিতে আমাদের দেরী হয় না। তাই সতীশকেও যেমন সহজে বুঝতে পেরেছিলুম ঠিক তেমনি বুঝতে পারছি সেই ছেলেটিকেও।—তুমি নিজেই বা কম কিসে মা ! আমার চোখ নাই সত্যি, কিন্তু তাই বলে কি আমার বোধশক্তিও কমে গেছে ? আর মনে থাকে যেন আজ থেকে আমি তোমার কাকাবাবু।—কোন অবস্থাযেই আর আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।—

অলকার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের জন্য সতীশের দিকে চাহিয়াই সে দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, ফেলে গেলেই বা আমার চলবে কেন কাকাবাবু ? বাবাকে দেখবার সৌভাগ্য যে ভগবান দেননি সেই ভগবানই যে আপনাকে কাছে এনে দিয়েছেন।

অরবিন্দের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ধীরে ধীরে তিনি অলকার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, আমার মণি গেছে

কিন্তু সুদে আসলে আবার তা আদায় হয়ে গেছে।— তোমার গল্প থামিয়ে দিলে কেন সতীশ?

সতীশ আরম্ভ করিল, অবনীবাবু বলিলেন, সেতার বাজাতে গেলে মাথা অমন নড়েই।—গানের ওই ত আসল। তাল ঠিক রাখতে গেলে ওস্তাদদের কতরকম ভঙ্গাই দেখা যায়। আপনি থাকেন কোথায়, গান-টান শোনেন নি নাকি কোনদিন?

যুবক বলিলেন, হ্যাঁ ওস্তাদ বটে—মাথা নাড়াবার ওস্তাদিতে কেউ যে ওঁর সঙ্গে পারবে না তা আমি বাজী রেখেই বলতে পারি। আর এক আসরে দেখেছিলুম হাত নাড়ার কায়দা—চোখে এমন খোঁচাই লেগেছিল যে তা আজও আমার মনে আছে।—

আবার হাসতে হ'ল।—যাদের প্রতি প্রথমেই ও বিদ্রূপ করেছিল তাদেরই একজন শোধ নেবার জন্যেই বোধ হয় বললে, একটু চুপ করুন মশায় যথেষ্ট বাজে কথা বলেছেন। শুনতে দিন যা শুনতে এসেছি। ভাল না লাগে বাইরে গিয়ে যত ইচ্ছে গড়াগড়ি দিন গিয়ে।

যুবক হেসে ব'ললে, তা দেব, আপনাকে সঙ্গী হ'তে হবে কিন্তু। একজোড়া পা চাই আবার, আমি না হয় মাটীতেই শুয়ে পড়তে পারব আপনার ত পা না হলে শোযার সুবিধে হবে না। পর মুহূর্ত্তে অবনীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে ও বললে, ওঁকে ভেতরে একটু বসবার জায়গা করে দিন, সভাপতি মশায়ের পাশে হলেই ভাল হয়। আপনার হয়ে উনি বেশ দু' চারটে কথা বলেছেন।

অলকা যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, বলিল, বেশ বলেছেন।

এ ছেলেটিকে কিন্তু একবার নিয়ে আসা চাই-ই সতীশ।—

সতীশ বলিল, হঠাৎ আবার দেখা না হলে ত তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোথায় যে সে থাকে তা ত আর জিজ্ঞাসা করিনি।—

অরবিন্দ বলিলেন, আচ্ছা সে কথা পরে, এখন শেষ কর তোমার কথা।

সতীশ আবার আরম্ভ করিল, গোলমালটা এবার একটু বেশী হয়ে ওঠায় গান থেমে গেল। সেতার-বাদকের ভ্রূ কুঞ্চিত হযে উঠল। তবলচী হিন্দুস্থানী, বিরক্ত হইয়া সে বলিল, কেয়া হুয়া মাষ্টারবাবু, বড়া তাজ্জব।—গানা কেয়া ছোড় দেঙ্গে।···আদমী লোককো সব—

তাহার কথা আর শোনা গেল না, অবনীবাবু বলিলেন, এবার আপনারা একটু চুপ করুন দয়া করে। নইলে ওঁরা যদি রাগ করে উঠে যান ত আমার সমস্ত বন্দোবস্তই নষ্ট হয়ে যাবে।

ক্রুদ্ধ ভদ্রলোকটি বলিলেন, নষ্ট হবে কেন? যিনি গোলমালের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই আছেন যখন, তখন আর ভাবনা কি? উনিই বিরাট রাগ-রাগিণী তুলে সকলকে মোহিত করে দেবেন।

যুবক হেসে উত্তর করলে, তা আপনার আদেশে আমি রাজী আছি।

অলকা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তা'হলে বেশ একটু মজার ব্যাপারই হয়েছিল দেখছি। সামনে দাঁড়িয়ে উপভোগ করার মত।

সতীশ বলিতে লাগিল, একটু ভয় করছিল, শেষ পর্য্যন্ত না মারামারি সুরু হয়! কিন্তু সে যুবকের কথায় এতটুকু উত্তেজনাও ছিল না। তাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। পরিহাস এবং একটু কড়া জাতের পরিহাস ছাড়া আর কিছুই যেন তার স্বরের মধ্যে ছিল না।

'ওদিকে সঙ্গত এবং মাথা নাড়া থামাতে হওয়ায় সেতার বাদক উত্তেজিত হযে উঠেছিলেন, আর থাকতে না পেরে তিনি বললেন, আর হল না। দু'দশজন বাঙালী একজায়গায় হলেই গোলমাল সুরু হবে বিদেশে এসেও স্বভাব যায় না। আমি চললুম অবনীবাবু।

'যুবক হাতজোড় করে বললে, উঠবেন না, বসুন। বাঙালীদের স্বভাব তারা ছাড়বে কি করে বলুন? আপনিও সেই বাঙালীই দেখছি, নইলে

এমন করে উঠে যেতে চাইবেন কেন? সমস্ত-কিছু মাটি করবেন না—অবনীবাবু অনেক কষ্টে সমস্ত বন্দোবস্ত করেছেন, সে সব অমন করে নষ্ট করে দেওয়া কি আপনার মত লোকের পক্ষে উচিত হয়?

কে একজন বলে উঠল উনি হচ্ছেন ভীমাপদ বাবু—ক'লকাতার একজন প্রসিদ্ধ বাদক। উনি যে এখানে এসেছেন, সেটা কি কম সৌভাগ্যের কথা?

যুবক তেমনিভাবেই বললে, উঠবেন না, আপনি যে ভীমাপদবাবু অথবা অমনি একজন প্রসিদ্ধ বাদক তা আমি আগেই বুঝেছিলাম, বসুন।

ভীমাপদবাবু বোধ করি একটু খুশী হলেন, বসে পড়ে বললেন, বেশ, গোলমাল মিটিয়ে ফেলুন। ক্রুদ্ধ ভদ্রলোক কিন্তু মোটেই সন্তুষ্ট না হতে পেরে বললেন, ইনিও নাকি মস্তবড় বাজিয়ে, আদেশ পালন করতেও আপত্তি নেই ওঁর। দিন না সেতারটা এঁরই হাতে—দেবর্ষির সঙ্গত শুনতে শুনতে পরলোকের পথ পরিষ্কার করি।

যুবক হেসে বললে, বেশ, পথ পরিষ্কার করতে যত হচ্ছে ঝাঁটা চালান আমার বাজনা শুনতে শুনতে। কিন্তু দেখবেন—শেষ পর্য্যন্ত যেন হতাশ হবেন না।

যুবক আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে সেতার নিয়ে বসে তবলচীকে প্রস্তুত হতে ইঙ্গিত করল। সবাই বিস্মিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তবু কেউ কিছু বলতে পারল না। কি-ই বা বলবে? কিছুক্ষণের মধ্যে সেতারে ঝঙ্কার উঠল। আমরা আরও বিস্মিত হয়ে গেলুম। ভীমাপদবাবুর মহাভারতীয় ভীম-রস যেন কোন্ রসাতলে তলিয়ে গেল। অপূর্ব্ব সে ঝঙ্কার,—কোনদিন অমন শুনিনি, শুনবও না। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুধু চেয়ে রইলুম, ভীমাপদবাবু মাথা হেঁট করতেও ভুলে গেলেন, আর সেই ভদ্রলোকের মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল - পলকহীন চোখে আমরা শুধু চেয়েই রইলুম।

ধীরে ধীরে সেতার থেমে গেল। হেসে নমস্কার করে যুবক উঠে দাঁড়াল। সবাই চেঁচিয়ে উঠল, আর একটু হক, আর একবার। যুবক কিন্তু আর বসল না, বললে, আর নয়, চলি। বেশী দেরী করতে চাই না আর। তারপর সেই ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে তাব একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সে বললে, ঝগড়ার মধ্যে দিয়েই আজ আমাদের পরিচয় হল, আশা করি, আবার দেখা হবে।

অবনীবাবু উঠে এলেন তাকে এগিয়ে দেবার জন্যে। আমিও উঠে পড়লুম। তার সঙ্গে আরও ভাল করে আলাপ করবার জন্যে খুবই ব্যস্ত হয়েছিলুম তখন। রাস্তায় এসে তাকে বললুম, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় খুবই সুখী হলুম, কিন্তু আপনার নামটি এখনও অজানা রয়ে গেল।

যুবক হেসে জবাব দিলে, নামটা আমার মন্দ নয়। বাবা আর মা বেশ পছন্দসই নামই দিয়েছিলেন। আমি দিলীপ—দলাপ সিং নয় তা ব'লে।

অরবিন্দ বাললেন, তাকে আসতে বললে না কেন? সে কোথায় থাকে?

অলকা কোন প্রশ্ন না করিয়া সতীশের মুখের দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সতীশ সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া বলিল, তার ঠিকানা জানতে পারিনি কিন্তু তাকে আসতে বলেছিলুম। সে শুধু জবাব দিয়েছিল, এমনি যদি হঠাৎ আমাদের দেখা হয় ত যাব আপনার ওখানে। বললুম, সেখানে এমন লোক আছে যারা আপনাকে পেলে খুবই সুখী হবে। তাই এমনিভাবে আকস্মিকতার ওপর বরাত না দিয়ে আসুন আজই।

ও শুধু মৃদু হেসে নমস্কার করে অন্য দিকের পথটা ধরে এগিয়ে গেল। প্রতি-নমস্কার করবার সুবিধেও পেলুম না, তবু তার এমনি সহজ উপেক্ষায় বিরক্তও হতে পারলুম না। মনে পড়ে গেল প্রতুলের কথা—এই যুবকও

যেন তারই মত করে গড়া। একই দেবতা যেন একই ভাবে এদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছে। কিছুই বলতে পারলুম না, অথচ ওর দিক থেকে চোখও ফেরাতে পারলুম না। যতক্ষণ দেখা গেল শুধু পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হয়ে চেয়ে রইলুম।

হঠাৎ পেছনে অবনীবাবুর কথা শুনতে পেলুম, তিনি কাকে যেন বলছিলেন, আগা ওর নামটা জেনে নিতে যে ভুলে গেলুম। কাগজে কি দেওয়া যাবে?

লোকটি উত্তর দিলে, সবার নামের দরকারই বা কি? শুধু আপনার নামটা দেবেন আর বলবেন অনেক ভদ্রলোক এবং মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

অবনীবাবু বললেন, মহিলা?

লোকটি সপ্রতিভভাবেই জবাব দিলে, নয়ই বা কেন? ওসব লিখতে হয়—এসব ত খুবই সাধারণ চাল, ও একটু-আধটু দিতেই হয়।

মাথা নীচু করে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে এলুম। এমনি কত চালই না মানুষ দিয়ে বেড়ায়, সত্যকে মিথ্যা বলে আর মিথ্যাকে সত্য বলে—আসল ঘুচিয়ে দিয়ে মেকীর মাহাত্ম্য গেয়ে কত বিভিন্ন উপায়েই না মানুষ নিজের জয়গান করে।

অরবিন্দ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, বুদ্ধিমান হয়েও তার ঠিকানাটা তুমি জেনে আসতে পারলে না সতীশ!

অলকা বলিল, তার দরকারই বা কি কাকাবাবু? তার সঙ্গে দেখা হবার সত্যিকার যদি কোন আগ্রহই থাকে ত দেখা হবেই। এখন থাক ও-সব কথা, বেলা কম হয়নি—চায়ের জল চড়াতে হবে।

অলকা উঠিয়া পড়িল—সতীশও আর বসিয়া থাকিতে পারিল না।

* * * *

এমনি করিয়া আরও কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। অরবিন্দকে মাঝে রাখিয়া সতীশ ও অলকা পরস্পরের নিকট অতি সহজ হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদের মধ্যে আসিয়াছেন বলিয়াই যেন উহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে দিন কেমন করিয়া কাটিত, তাহা অলকা ভাবিতেও পারে না।

সেদিন অরবিন্দ বলিলেন, আমার জন্য তুমি যদি ঘরে বসেই থাক, তবে ত আমি শান্তি পাব না মা। এ বুড়োকে কেন নিজের কাছে অপরাধী ক'রে তুলছ বলত?

অলকা তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার নিঃশেষ-প্রায় চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালনা করিতেছিল। তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে বিন্দুমাত্র দেরীও তাহার হয় নাই, তথাপি যেন কিছুই বোঝে নাই এমনিভাবে বলিল, কি করতে হবে তাই বলুন দেখি কাকাবাবু? বুড়োকে ফেলে কোমরে কাপড় বেঁধে বাইরে ছুটাছুটি ক'রলেই বুঝি শান্তি মিলবে? আর তাই বা দেখবেন কি ক'রে—আমার চোখ আছে ব'লেই না আপনার দৃষ্টি ফোটে!

অলকার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া অরবিন্দ বলিলেন, সে খবর আমার চেয়েও তুমি ভাল করে জান সে ত' জানিই মা, কিন্তু আর একটা খবর ত' তোমার জানা নেই। অন্ধ যারা হয়, এ তাদেরই নিজস্ব জিনিষ, বাইরের চোখ গেলেও মনের চোখ তাদের খুলে যায়। সে চোখই কার্য্যকরী হয় তখন এত বেশী যে, সে চোখ দিয়ে না দেখলে কোন আনন্দই মেলে না।

অভিমানভরে অলকা বলিল, আমাকে কি তবে কোন দরকারই নেই কাকাবাবু?

তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে সম্মুখে টানিয়া আনিয়া অরবিন্দ বলিলেন, এ তোমার অভিমানের কথা মা। ছেলে দেখতে পায় বলে কি আর

আছাড় খায় না? সে সময় কে তাকে দেখে বল দেখি? মা না এলে তার কান্না কি থামে?

হাসিয়া অলকা বলিল, মা যদি সব সময়েই কাছে থাকে, তবে ত' সেই আছাড়টাও বেঁচে যায়।

অরবিন্দও হাসিয়া বলিলেন, এবার মস্ত একটা ভুল ক'রে বসলে মা, আছাড় না খেলে ছেলের ভালই বা লাগবে কেন? গায়ে ব্যথা না পেলে, মনের মধ্যে কান্না জমে না উঠলে স্নেহের মাধুর্য্য কি বোঝা যায়?

অলকা বলিয়া উঠিল, কিন্তু—।

তাহাকে জোর করিয়া থামাইয়া দিয়া অরবিন্দ বলিলেন, না কোন কিন্তুই এর মধ্যে নেই, তর্ক করতে তোমায় আমি দেব না। আজ বিকেলেই তোমাদের বেরোতে হবে, না হ'লে তোমার কোন কথাই আমি শুনব না। কাকাবাবুর কথা যদি না শোন ত' মায়ের কথাগুলাও অগ্রাহ্যই থেকে যাবে।

এমনি সময় সতীশ আসিযা বলিল, আজ কি হয়েছে জানেন, ঠিক ধর্ম্মশালাটার সামনে, যেখানে একটা পোল আছে—

অরবিন্দ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, হ্যাঁ তুমি যখন বলছ, তখন পোল একটা সেখানে আছে, একথা অস্বীকার করি কি ক'রে, কিন্তু কি জান সতীশ আমি অন্ধ মানুষ, ওসব দেখিনি কোনদিন—পোলটাও নয়, ধর্ম্মশালাও নয় আর মা-টিরও ত' সেই অবস্থা, কে-ই বা দেখায়, কে-ই বা কি করে বল।

একটু অপ্রতিভ হইয়া সতীশ বলিল, তা সে কথা ঠিক—কিন্তু কি করি বলুন—। হ্যাঁ সেই পোলটার কাছে—।

তাহার কথা শেষ হইতে পাইল না। অরবিন্দ তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, ও সব কথা আর আমরা শুনতে চাই না। আমার না হয়

উপায় নেই, কিন্তু তাই বলে আর একজনই বা শুধু কল্পনা নিয়েই থাকবে কেন? আজ বিকেলে, শুধু আজ বিকেলেই নয়, রোজই একে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে তোমায়। রাস্তায় যা কিছু দেখে আসবে, তার একটা ফিরিস্তি দিলেই যদি সব কিছু ঢুকে যেত, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মনের সৃষ্টি না করলেও ত হত। তা হবে না আজ থেকেই এ কাজ তোমায় করতে হবে।

অলকা সতীশের দিকে চকিতে চাহিয়াই বৃদ্ধের মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বোধ করি-বা পাকা চুল লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

সতীশ ক্ষণকাল অলকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার বুকের ভিতর কি যেন বার কয়েক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অন্ধকারে পাশাপাশি চলিতে গিয়া তাঁহার বুকের স্পন্দন যে থামিয়া যাইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? অনেকদিন আগেকার একটি রাত্রির কথা মনে পড়িল, সে রাত্রিটা তাহার জীবনের একটা বিরাট কলঙ্ক হইয়া আজিও অক্ষয়, অমর হইয়া আছে। অনেক সৎকাজে ব্যয়িত রাত্রিই হয়ত' মুছিয়া গিয়াছে—মুছিয়া যাইবে না শুধু ওইটাই। কেহ কি উহা মুছিয়া ফেলিতে পারে না, সে তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে তাহা হইলে। ওই মেয়েটি সে-কথা হয়ত' গভীরভাবে মনে রাখিয়াছে, হয়ত' বা সম্পূর্ণই ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার স্থিরতা, তাহার অবিচলিত ভাব আজিও স্পষ্ট চোখে পড়ে। নিজের মনের দুর্ব্বলতার পাশে উহার ওই ধ্যানগম্ভীর ভাব মনে পড়িলে, আজিও লজ্জায় মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ভয় ত' তবুও কমে না।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অরবিন্দ বলিলেন, আমার কথা শুনে তোমারা দেখছি একেবারে পাথর হয়ে গেলে, ব্যাপার কি মা?

হয়ত' সতীশের মনের একটা দিক অলকা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই তাহাকে সহজ করিবার জন্য সে তেমনি মাথা নীচু রাখিয়াই বলিল, কেউ

যদি নিজের ইচ্ছায়ই কোন কাজ করে ত তাকে বোঝালেই কি কোন ফল হবে? যুক্তির জোরে ওকালতী ক'রে মামলা জিততে হয়ত' আপনি পারেন, কিন্তু যেখানে যুক্তির বদলে শুধু বিশ্বাসটাই আছে, সেখানে আপনি ত' পারবেন না কাকাবাবু। বিশ্বাস কি যুক্তি মানে?

একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিয়া সতীশ বলিল, সবাই মিলে একজনকে কোণঠাসা করা আধুনিক যুদ্ধরীতি হ'লেও মহাভারতীয় নীতিতে কিন্তু বাধে কাকাবাবু।

অরবিন্দ হাসিলেন। উত্তর করিল অলকা। মুখের উপর চমৎকার একটা হাসি ফুটাইয়া সে বলিল, মহাভারতীয় নীতি যারা অপরের ওপর খাটাতে চায় না, তাদের জন্য কথা এ ছাড়া আর কোন পথও যে নেই।

হাসি মুখেই অরবিন্দ বলিলেন, তুমি যা-ই বল সতীশ আমার এই মা টিকে হারাতে তুমি কোনদিনই পারবে না। তাই ত' আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা ওদের শক্তিরূপিণী বলে গেছেন। যাই হ'ক তর্ক করতে গিয়ে খেই হারিয়ে তর্কের সুরুতে আমার যে কথাটা আছে, সেটাকে ভুলে যেও না যেন।

অরবিন্দের প্রথম দিককার কথাগুলিতে যে ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে তাহারা উভয়েই অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতেও আর তাহারা পারিল না। নিতান্ত অপরিচিত হইলেও আজ তাহারা এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাকে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। কোন সম্বন্ধই তাহাদের নাই, অথচ লোকের মুখে, চোখের ইঙ্গিতে যে সম্বন্ধের কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, তাহা তাহাদের মনে না আসিয়াও পারে না, লজ্জায় তাহাদের চোখ আপনা—হইতেই নত হইয়া আসে—সতীশ মনে মনে বার বার শিহরিয়া উঠে।

কিন্তু তবুও কথা না বলিয়া উপায় নাই। মনের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে একটা রসস্তকে চাপিয়া রাখিয়া বাহিরে সহজ ভাব না দেখাইয়া কোন উপায়ই যে নাই। ধীরে ধীরে কোনক্রমে সে তাই বলিল, হ্যাঁ, সে ত' বটেই, তা মনে না থাকলে—।

অরবিন্দ হাত বাড়াইয়া অলকার হাতটা ধরিয়া বলিলেন, এত অনিচ্ছা কেন সতীশ!

সতীশ এতক্ষণে নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিল, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, অনিচ্ছা নয় কাকাবাবু অনভ্যাস।

অলকা ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বলিল, আপনাকে ফেলে আমি নিজেই ত' যেতে পারিনি, আজ হঠাৎ একজনকে ধরে তার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিলে চলবে কেন কাকাবাবু। দোষ যদি কারও থেকেই থাকে সে আমার। আমরা বেড়াতে গেলেই যদি আপনার অপরাধ ঘোচে ত' আমরা কোন আপত্তিই করব না আর।

অলকাকে আরও কাছে টানিয়া আনিযা অরবিন্দ বলিলেন, কে বলে মা, শিক্ষার গর্ব্বে এদেশের মেয়েরা শেষ হ'তে বসেছে? স্বামীর দোষ যে নিজের কাঁধে তুলে নেবার একটা চিরকেলে রোগ এদেশের মেয়েদের মধ্যে রয়েছে, সে ত' কই শিক্ষা তোমার কাছ থেকে মুছে নিতে পারে নি।

কথাটা অলকাকে আঘাত করিল। তাহার কর্ণ-মূল পর্য্যন্ত যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, এ আপনার অন্যায় দোষারোপ—এদেশের মেয়েরা যাদের শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, তাদের মনের দুঃখ পর্য্যন্ত নিজেদের মাথায় তুলে নেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে, একি আজও আপনার অজানা আছে বলতে চান?

অরবিন্দ কোন কথাই বলিলেন না, প্রশান্ত মুখে আস্তে আস্তে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

আরও দুইটা দিন কাটিয়া গেল। অলকা রোজই সতীশের সঙ্গে বেড়াইতে যায়। আজও বিকালে তাহারা বাহির হইয়াছে, গত দুই দিনের মত অনির্দ্দিষ্টভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য আজ তাহারা বাহির হয় নাই, আজ তাহারা চলিয়াছে বিদ্যাপীঠের দিকে।

বাজারের কাছাকাছি আসিয়া সতীশ বলিল, একটা গাড়ী নিলে হ'ত, অনেকটা পথ, আমাদের পক্ষেও হাঁটা মুস্কিল।

অলকা হাসিয়া বলিল, নিজেদের দিয়ে বিচার করাটা পুরুষদের একটা মস্তদোষ, আপনি হাঁটতে পারবেন না বুঝি ?

সতীশ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, সত্যি অনেক দূর, হেঁটে যেতে কেউ যদি না-ই পারে ত' তাকে দোষ দেবার কিছু নেই।

অলকা বলিল, আজ আপনাকে হেঁটেই যেতে হবে। অনেকদিন বেরোই নি পথে, আজ অনেক, অনেক দূর হাঁটতে ইচ্ছে করছে।

নিতান্ত লজ্জিত হইয়া সতীশ বলিল, বেরোবার যদি সত্যি এতই ইচ্ছে ছিল ত' আমাকে বলনি কেন ? আমি যে ভাবতেও পারিনি।

অলকা বলিল, সেটা আমার দোষ নয় আপনার। আপনি সাহিত্যিক —এত কম কল্পনা শক্তি যাদের, তারা লেখে কেন ?

একটু ইতস্তত করিয়া সতীশ বলিল, রাত হ'য়ে যায় বলেই বলবার সাহস আমার হয়নি।

সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ গলায় অলকা বলিল, আপনি অদ্ভুত। তারপর একটু থামিয়া বলিল, মামা বলতেন, ভুল জিনিষটাকেও অগ্রাহ্য ক'র না মা—এমনি ভুলের বেদীতেই সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। পাকা

পথ করতে হলে 'ইট চাই, জলও চাই, ঠিক তেমনি সত্যে পৌঁছবার পাকা পথে ভুলেরও প্রয়োজন।

লজ্জায় সতীশের মাথা নীচু হইয়া আসিল, চক্ষু দিয়া দুই-এক ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িল। কি অদ্ভুত ওই মেয়েটি, মানুষের বিরাট অন্যায়কেও কত সহজেই না সে ক্ষমা করিয়া ফেলে।

অলকা তাহার লজ্জা, তাহার অশ্রু দেখিয়া ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, আপনি দুঃখিত হয়েছেন, কিন্তু তার লজ্জা যে আমার কত বড় তা' বুঝিয়ে বলবার শক্তি আমার নেই। আমার জন্য আপনার অনেক বন্ধুই আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে, একথা মনে হ'লে আজও আমি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাই।

কোনমতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সতীশ বলিল, তারা যে আমার সত্যিকার বন্ধু নয়—এ শুধু তোমার জন্যেই আমি বুঝতে পেরেছি অলকা, এত' আমার কম লাভ নয়।

সম্মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উদাসভাবে অলকা বলিল, তাদেরও কিছু দোষ নেই। শত সহস্র বছর ধরে যে সংস্কার আমাদের মনের মধ্যে দৃঢ় হ'য়ে গেছে, তা কি মুহূর্তেই আমরা বদলাতে পারি?

'তোমার ত' অত সংস্কার নেই অলকা!

অলকা হাসিল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, সংস্কার আমারও ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। তার ওপর মামার কাছে ছেলেবেলা থেকেই যে শিক্ষা পেয়েছি, তাও একেবারে ব্যর্থ হয়নি। মেয়েরা যা ধরে, তা বড় শক্ত করেই ধরে।

'কিন্তু প্রতুল? সে ত' পারলে না আমায় ছেড়ে যেতে।'

প্রতুলের কথা মনে হইতেই অলকার চক্ষু দুইটি আপনা হইতেই বুঁজিয়া আসিল, তাহার কথা মনে হওয়ার মধ্যেও যে কত বড় আনন্দ, তাহা সে

বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। প্রতুল তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকে—সে কাহারও দিদি নহে—অথচ এমন একটি লোকের দিদি হইয়া বসিয়াছে, যাহার তুলনা মেলে না। উজ্জ্বল চক্ষে সম্মুখের দিকে চাহিয়া অলকা বলিল, সংসারটা শুধু একদিক থেকেই যায় নি; এখানে প্রতুলের মত লোকও আছে। আমরা সাধারণ মানুষ, তাকে দেখে লজ্জায় মরে যাই, তাই তাকে আমরা দেবত্ব দিয়ে দূরে বসিয়ে রাখতে চাই। সে মানুষ, কিন্তু আমরা? সব কিছু মিলিয়েই না এই জগৎ।

কথা বলিতে বলিতে তাহারা বিদ্যাপীঠের নিকটে আসিয়া হাজির হইল; তার দিয়ে ঘেরা বিরাট মাঠের মধ্যে সুন্দর শাদা গুটিকয়েক বাড়ী।

ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে সতীশ বলিল, এই যে বিদ্যাপীঠ-এর পেছনেও আছে কত বড় একটা ইতিহাস। মানুষের কর্ম্মশক্তির প্রেরণায় গড়ে ওঠা এমনি প্রতিষ্ঠানগুলোর কতটুকু ভিতরে আমরা যাই। ওই শাদা দালানের আড়ালে গৈরিক বসনাবৃত যে কয়টি অতীত মানুষ আছে, তারা আমাদের ক'জনকে ভাবিয়ে তোলে? কেউ না, আমরা আসি হাওয়া খেতে, বুঝি না ওই হাওয়ার পেছনে কত বড় শক্তি কাজ করে।—

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সতীশ বলিল, এদের ব্যবস্থা অতি চমৎকার; নিয়ম, শৃঙ্খলা এরা মেনে আসছে অনেক দিন থেকে, কিন্তু সে-সবগুলো পুরাণো হ'য়ে গেছে বলেই ভেঙ্গে ফেলবার আগ্রহও ওদের নেই। যেখানে আদর্শ নেই, শুধু সেখানেই যে শৃঙ্খলা না থাকলেও চলে, এ বোধ ওদের খুব ভাল রকমই আছে।

যেখানে একদল ছেলে মনের আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া খেলিতেছিল, অলকা সেইদিকেই স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সে ভাব সম্বন্ধে কোন

.ধারণাই হয়ত' ইতিপূর্ব্বে তাহার হয় নাই। বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ—আর সেই মানুষের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ওই কচি মুখগুলি, ইহা যে কত বড় সত্য, তাহা সে আজ নিজের সমস্তখানি সত্তা দিয়া অনুভব করিতেছিল। উহারা যেন আপনাদের জন্য আসে নাই, আসিয়াছে শুধু অপরের মনের আনন্দ বাড়াইয়া দিতে—বুভুক্ষু হৃদয়ের বুভুক্ষা উহারা বাড়াইয়া দেয় নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই।

অকস্মাৎ সতীশের চীৎকারে তাহার চমক ভাঙিয়া গেল। সতীশ তখন একটি লোকের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছিল, ওই সেই ছেলেটি অলকা, একটু দাঁড়াও ওকে আমি ধরে নিয়ে আসছি।

সতীশ যাহাকে ধরিয়া লইয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়া অলকা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল। রংটা ময়লার ধার ঘেঁসিয়া গেছে, নাকটা একটু বেশীরকম লম্বা, টানা টানা বড় চক্ষু দুইটিতে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি, কিন্তু আভিজাত্যের কোন ছাপই নাই। তাহার পোষাকের মধ্যে যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আভিজাত্য নাই, দৈন্যও নাই, অথচ এমন একটা শান্তশ্রী আছে, যাহা সহজে চোখে পড়ে না, আর একবার পড়িলে মুছিয়াও যায় না।—তাহাকে দেখিবামাত্র আর একজনের কথা স্বতই মনে হয়। এই উনিশ কুড়ি বৎসর বয়েসের ছেলেটিকে দেখিলে মনের মধ্যে স্নেহ, মায়া, মমতা জাগিয়া ওঠে, ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বিরাট বলিয়া শ্রদ্ধায় মাথা নত করিতে ইচ্ছা হয় না।

তাহাকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া সতীশ বলিল, এই সেই দিলীপ, সেই গানের আসরের।

নমস্কার করিবার কথা অলকার মনেও ছিল না, বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে বলিল, এই এতটুকু? আমি কিন্তু ভেবেছিলাম—।

জোরে হাসিয়া উঠিয়া দিলীপ বলিল, বিরাট একটা কিছু, না? আপনি বেশ ক'রেছেন দাদা আমার প্রশংসা করে। বাঙলা দেশের কাগজগুলো ত' আর আমাদের জয়ঢাক বাজাবে না, সে ভারটা যদি আপনারা নেন ত' মন্দ হয় না। আপনাদের মুখ আর কলম যে কত বড় প্রচার-পত্র, তা' আমি বুঝে নিয়েছি।

হাসি মুখে অলকা বলিল, মন্দ ব্যবস্থা করেন নি দেখছি, দু'জনেই দু'জনের প্রশংসা সুরু ক'রে দিলেন যে। কিন্তু আমার করে কে?

দিলীপ বলিল, আমরা দুজনেই সে ভার নিলুম দিদি, তবে হয়ত' শেষ পর্য্যন্ত দু'জনে কুলিয়ে উঠবে না। কিন্তু একটা কথা, আমাকে আপনি বলা চলবে না।

অলকা বলিল, বেশ ত' আপনিটা দু'পক্ষ থেকেই মুছে নেওয়া যাক্, তাতে কাজটাও সহজ হ'য়ে যাবে। তোমার কথা প্রথম দিন শুনেই যে ইচ্ছে হয়েছিল, সে ইচ্ছেটা কিন্তু তোমাকে পালন করতেই হবে আজ।

'ইচ্ছেটা কি?' দিলীপ জিজ্ঞাসা করিল।

অলকা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তার আগে কথা দাও যে, সেটা পালন করবে।

যুবকের ঠোঁটের উপর দিয়া এক ঝলক হাসি খেলিয়া গেল, সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, দিদি ত' ভয়ানক দেখছি, একেবারে শাদা কাগজের ওপর নাম সই করিয়ে নিতে চায়।

সতীশ বলিল, দিদি যদি তা-ই চায় ত' আপত্তি কি? এখানে ত' অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই।

দিলীপ বলিল, উঃ এ যে ঘোরতর ষড়যন্ত্র দেখছি।

হাসিয়া ফেলিয়া অলকা বলিল, তবেই ত' বুঝতে পারছ যে, আর কোন উপায় নেই। অতএব যা বলি নির্ব্বিবাদে শুনে ফেল।

'বেশ, আমি প্রস্তুত।' দিলীপ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত অলকা বলিল, তোমাকে আমরা বন্দী করেছি তাই তোমার সমস্ত মালপত্র নিয়ে আজই আমাদের সঙ্গে তোমায় যেতে হবে আমাদের ওখানে।

একটু ইতস্তত করিয়া দিলীপ বলিল, কিন্তু—।

তাহাকে থামাইয়া দিয়া হঠাৎ তাহার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া অলকা সস্নেহে বলিল, তা হবে না ভাই, তোমাকে যেতেই হবে। পৃথিবীর 'কিন্তু'গুলোর এমন কোন জোরই নেই যে, ছোট ভাইকে দিদির কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারে। তোমাকে যেতেই হবে দিলীপ, নইলে সত্যিই বড় দুঃখ পাব।

আপত্তি করিবার দিলীপের আর কোন উপায়ই রহিল না।

সতীশ বলিল, রাত হ'তে চলেছে ওদিকে, আর দেরী করে লাভ কি অলকা? হোটেল থেকে ওর জিনিষ-পত্র নিয়েই ত' আমাদের যেতে হবে।

দিলীপ বলিল, আজ রাতে না হয় না-ই হ'ল দিদি, কাল সকালেই আমি গিয়ে উপস্থিত হব। একটা রাতের জন্যে মিছিমিছি কষ্ট করে লাভ কি!

অলকা বলিল, কষ্টটাই কি বড় করে চোখে পড়ছে ভাই, ওর আড়ালে যে-সব জিনিষগুলা র'য়ে গেল, সেগুলা কি কিছুই নয়?

দিলীপ আর কোন কথা বলিতে পারিল না—দিদির অন্তরের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হয়ত' শত সহস্র প্রণাম জানাইল।

দিলীপ বলিল, তবে তাই হ'ক, দিদির কাছে ছোট ভাইয়ের মতামতের কোন দামই ত' কোনদিন স্বীকৃত হয়নি, আজও না হয় সে নিয়মটাই র'য়ে গেল।—

পরদিন বৈকালে সতীশ বাহির হইয়া গিয়াছিল। দিলীপ তাহার সহিত যায় নাই, সতীশের নিকটে বৈকালিক জলযোগে বসিলে যে উহা ভূরিভোজনে পরিণত না হইয়া জলযোগই থাকিয়া যাইবে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল বলিয়াই দিলীপ তাহার সঙ্গে বসে নাই। সতীশ বাহির হইয়া যাইবার পর রান্নাঘরের মধ্যেই পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া গরম গরম লুচির সদ্ব্যবহার করিতে করিতে দিলীপ গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল।

মৃদু হাসিয়া অলকা বলিল, গল্প জুড়ে দিলেই ওদিকে সংখ্যাটা হিসেবের বাইরে থাকবে না। এ চোখকে অত সহজেই ফাঁকি দিতে পারবে না ভাই।

উচ্চ হাসিতে ঘর ভরাইয়া দিয়া দিলীপ বলিল, চোখকে ফাঁকি দিতেই কি চাই নাকি আমি, ছোট ভাইয়ের পেট ভরে নি দেখলে কি দিদির হাত বন্ধ হয় কখনও?

হাসি থামাইয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া অলকা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ঠিক তোমার মত আরও একটা ভাই পেয়েছিলুম আমি, সে ছিল আমার দাদা আর আমি তার দিদি। অদ্ভুত সে, কোথায় যে চ'লে গেল হঠাৎ তা জানিয়েও গেল না—মমতা নেই, মায়া নেই, অথচ শুনেছি পরের জন্য কত না দরদ।

দিলীপ বলিল, অন্য কোন ভাইয়ের কথা বলবেন না দিদি, আমার কিন্তু ভারী হিংসে হবে। আমি হতে চাই একচ্ছত্র অধিপতি—একমাত্র ভাই।

দিদি মাথা নাড়িয়া বলিল, তাইত হওয়া উচিত, কিন্তু পারি কই? তোমাকেও বিশ্বাস নেই ভাই, হয়ত তারই মত কোনদিন ভীড়ের মাঝে লুকিয়ে পড়বে, তোমরা যে একই জাতের।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া দিলীপ বলিল, আপনাদের মত দিদি আছে ব'লেই না আমরা কিছুদিন বেঁচে যাই। এই যে ঘর-সংসার ছেড়ে এক-

দল লোক মাথা কুটে বেড়ায়, তারা টিঁকে আছে ত শুধু বিভিন্ন ঘর-সংসারের জন্যই। সাধ্য কি তাদের যে, এদের ফাঁকি দিয়ে যায়, আর সে সাধ্য যেন তাদের কোনদিনই না হয়। সে দুই হাত তুলিয়া বোধ করি বা সেই ঘর-সংসারের উদ্দেশ্যেই নমস্কার জানাইল।

দিদি নিঃশব্দে তাহার পাতে আরও কয়েকটা লুচি তুলিয়া দিল। দিলীপের তখন সেদিকে নজর ছিল না, সে আপন মনেই বলিয়া চলিল, এদেশের মেয়েদের স্নেহ-মমতাকে অগ্রাহ্য করবার বা এড়িয়ে যাবার দুর্বুদ্ধি যদি সত্যই তাদের হয় ত সেদিন থেকে এদের মাথা কুটে বেড়ানই সার হবে। আমি ঠিক ব'লতে পারি দিদি, ওই যার কথা তুমি বলছিলে, সে ওদেরই একজন, তার সমস্ত স্নেহ-মমতাই তুমি পেয়েছ, কিন্তু বন্ধন বলে কোন কিছুই ত ওদের নেই। তুমি তাকে বুঝেছ, তার অন্তরের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহই তোমার নেই, তাই তার সেই কোন কিছু না বলে চলে যাবার জন্য আজও ত কই তুমি তার ওপর রাগ করতে পারলে না—শুধু ভেবেই মর, আজও এবং ভবিষ্যতেও তাই হবে।

অলকা কোন কথাই বলিতে পারিল না, ইহা যে সত্য তাহা সে জানে এবং বেশ ভাল করিয়াই জানে।

হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া দিলীপ বলিয়া উঠিল, তুমি বেশ ত দিদি, আমি ব'কে মরছি, আর তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুনেই চলেছ আর এদিকে এগুলো যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আর আমাকে বুঝি দেবার ইচ্ছে নেই।

উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিঃশ্বাসটি কোনমতে চাপিয়া ঠোঁটের উপর হাসি ফুটাইয়া অলকা বলিল, না, আর একটাও না, খাওয়াতেও আমি, আবার অসুখের সেবা করতেও সেই আমাকেই কষ্ট করতে হবে ত? সে আমি পারব না ভাই।

দিলীপ বলিল, বেশ পেট আমার খালিই থেকে যাক, দিদির স্নেহ-মমতা না থাকলে ছোট ভাইয়ের কপালে এমনি দুঃখই থাকে।

স্নিগ্ধ হাসি হাসিযা অলকা বলিল, তোমার সঙ্গে আমার দাদাটির একটু পার্থক্য আছে দেখ্‌ছি, তোমাকে থামান যায়, কিন্তু তাকে যায় না। এখনি না দিলে হয়ত জোর করেই সে তুলে নিত। আমাদের মত যারা আপন-পর তাদের জন্য থাকবে কি-না সে কথা ভাববারও যেন তার কোন দরকার হ'ত না।

হাসি মুখেই কৌতূহলীভাবে দিলীপ বলিল, তিনি হয়ত আমার চেয়েও বড়, দিদি।

'হ্যাঁ, বড় বয়সে তোমার চেয়ে আট-দশ বছরের ত বটেই। অলকা বলিল।

দিলীপ বলিল, বয়েসটাই ত আসল নয়, আসল যেটা, সেটাতে হয়ত' তিনি আরও বড়। তাঁর নামটা কি দিদি, হয়ত কোনদিন দেখা হ'য়েছে, চিনে ফেলা ত আশ্চর্য নয়।

অলকা বলিল, তার নাম প্রতুল—প্রতুল রায়।

বিস্ময়ের উত্তেজনায় দিলীপ প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, প্রতুলদা? প্রতুলদা'র দিদি আপনি! আর কোন কথাই সে বলিতে পারিল না, চক্ষু দিয়া যেন রাজ্যের বিস্ময়, শ্রদ্ধা, ভক্তি একসঙ্গেই বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ঠেলাঠেলি লাগাইয়া দিল।

অলকাও কম বিস্মিত হয় নাই, একজনের নাম শুনিয়াই অমন হয় কেমন করিয়া? হইলেই বা সে তাহার প্রতুলদা, হইলেই বা সে তাহার পূর্ব্ব পরিচিত, তথাপি তাহার দিদি হইয়াছে বলিয়াই এত শ্রদ্ধা ভক্তির কি কারণ হইতে পারে, তাহা সে ভাবিয়াও পাইল না। ভাবিবার জন্যও বিশেষ সময় পাইলাম না।

নিজেকে সংযত করিয়া দিলীপ বলিল, প্রতুলদা'র জন্য ভাববেন না দিদি, আমরা কেউ তার জন্য কোনদিন ভাবি নি— তিনি কিন্তু সবার জন্যই ভাবেন। শুধু আপনি নন, আমার মত অনেকের জন্যই তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়, অথচ দেখে সে-সব বোঝে কার সাধ্য ?

অলকা হঠাৎ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমিও বুঝি সেই ঘর-ছাড়ার দলেরই একজন ? না ভাই, সে হবে না, মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে কি কোন সাধনাই সফল হয় ?

দিলীপের মুখের উপর দিয়া এক ঝলক হাসি খেলিয়া গেল, কোন উত্তরই সে করিল না।

রুদ্ধরোষে অলকা বলিল, এমনি ক'রে হাসলেই কি সমস্ত প্রশ্ন উড়ে যাবে ?

শান্তভাবে দিলীপ বলিল, কিন্তু সত্যি সত্যি গেল ত।

অলকা আর কোন প্রশ্নই করিল না, জ্বলন্ত উনানটার দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিল। ওই উনানটার মতই তাহার মনের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কে বলে উহাদের মধ্যে মায়া-মমতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি আছে ? কি সহজ অবহেলায়ই না উহারা সকলকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। মনের এমন কোন নিভৃত স্থানও হয়ত উহাদের নাই, যেখানে মায়ের কথা, ছোট ছোট ভাই-বোনের কথা এবং আরও অনেকের কথা ক্ষণেকের জন্যও আসন পাতিয়া বসিতে পারে। স্ত্রীও হয়ত উহাদের কাছে অতি সাধারণ প্রয়োজনহীন একটি নারী। সমস্ত কিছু ছাপাইয়া একটি লোকের কথা বার বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল, তাহার মুখ, তাহার প্রতিটি অঙ্গ, তাহার চলার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত স্পষ্ট করিয়াই মনে পড়ে— সর্ব্বাপেক্ষা আপনজন হইলেও তাহার পরিচয় সে জানে না, তাহাকে চেনে না বলিলেও মিথ্যা হয় না—হয়ত সেও ঠিক ইহাদের মত নিশ্চিন্ত

হইয়াই আছে, হয়ত তাহাকে ভুলিয়া যাইতে তাহার এতটুকু বিলম্বও হয় নাই। বন্ধুরা, আত্মীয়েরা হয়ত মাঝে মাঝে তাহার কথা মনে করাইয়া দেয়, কিন্তু ঠিক ইহাদের মতই সেও হয়ত সমস্ত প্রশ্ন হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। হয়ত—হয়ত আর একটি নারী আসিয়াছে তাহার স্থানে—পুরুষ সবই করিতে পারে। তাহার চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল, আগুনের আভায় তাহার চোখে কয়েক ফোঁটা জলও চিক্ চিক্ করিতে দেখা গেল।

তাহার ভাবান্তর দেখিয়া দিলীপ বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার চোখে জল দেখিয়া আর সে নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না, অত্যন্ত ম্লানভাবে সে আস্তে আস্তে ডাকিল, দিদি।

টপ্ করিয়া এক ফোঁটা জল অলকার চক্ষু হইতে গড়াইয়া পড়িল। অলকা সচকিত হইয়া উঠিল, নিজেকে দৃঢ় করিয়া সে ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, কি ভাই, অবাক হ'য়ে গেছ? ও কিছুই নয়।

দিলীপ তেমনিভাবেই বলিল, দোষ যদি কিছু ক'রে থাকি, নিজের হাতেই কেন শাস্তি দিলে না, চোখের জল—ও যে গুরুদণ্ড দিদি।

তাহার দিকে ফিরিয়া অলকা এবার সত্য সত্যই হাসিল।

দিলীপ বলিল, এমনি করে মা-বাপ ছেড়ে আসায় তাদের প্রতি অবিচার করা হয় জানি, কিন্তু ওর বাইরে আর কিছুই কি চোখে পড়ে না? শুধু একটা দিক নিয়েই যদি বিচার করতে হয়, তবে চোখের জলের নদী বইয়ে দিলেও ত শান্তি মিলবে না, কিন্তু আর কোন দিকই কি নেই এর মধ্যে?

সম্মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অলকা বলিল, বুঝেছি, কি বলতে চাও তুমি, অস্বীকার করতে চাই না, পথও নেই। এমনি দুঃখ-কষ্টের পাকা রাস্তা না হ'লে পথের শেষে গিয়ে পৌছান যায় না জানি, কিন্তু সে-সব ত আমাদের চোখে পড়ে না!

দিলীপ বলিল, পড়ে না ব'লেছে কে ?

অলকা গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিল, তোমরা অনেক কিছুই বোঝ, মামাও ব'লতেন, বিচার না ক'রে কোন কিছুই ক'র না মা। এ জগতটা বড় অদ্ভুত ! কিন্তু বিচার করতে কি পারি আমরা, চোখ দুটো যে আমাদের স্নেহ মমতায় অন্ধ ভাই।

দিলীপ বলিল, তোমাকে বলতে বাধা নেই দিদি, আমার এই দেওঘর আসবার পেছনেও একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। আমি যখন সুস্থ শরীরে কাজ ক'রছিলাম তখন প্রতুলদা একদিন আমাকে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় বেড়াতে যাবার আদেশ দিলে। আমার না-কি শরীর খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। আমি আপত্তি ক'রেছিলাম ; কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে আর কিছুই বলতে পারিনি। কি যে ছিল সেখানে তা জানি না, ভয় পাবার কোন কিছু নয় ; কিন্তু তবু আর কিছুই বলতে পারিনি। একটা তারিখ ঠিক করে দিয়ে প্রতুলদা জানালে তার আগে আমার ফেরা নিষেধ। উঃ, এক মাস কেটে গেছে ; কিন্তু আর সাতটা দিন মাত্র বাকী—তারপর, আঃ। সেই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের তারিখটা দেখবে দিদি ? বুক পকেট হইতে একটা ক্যালেণ্ডার বাহির করিয়া সে অলকার সম্মুখে খুলিয়া ধরিল—সাত দিন পরের একটা তারিখ কে যেন শত সহস্রবার দাগ কাটিয়া একেবারে লুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

অলকার বুকের ভিতর প্রচণ্ড একটা ঝড় উঠিল, এমনি করিয়া একে একে সকলেই তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে। অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ তাহাকে কোথায় লইয়া যাইবে কে জানে ? ভবিষ্যতের অজানা অন্ধকূপের কথা মনে হওয়ায় সে বারবার শিহরিয়া উঠিল। নিতান্ত অভিশপ্ত সে, কাহার অভিশাপ লইয়া পৃথিবীর একপ্রান্তে জন্মিয়া চলায়মান জগতের কোন্ প্রান্তে যে সে আসিয়া ঠেকিবে তাহা কে বলিতে পারে ! যাহাদের মধ্যে

সে আসিয়া পড়িবে তাহারাও অভিশপ্ত হইয়া যাইবে, তাহার মামা, মামী, তাহার স্বামী এমন কি ওই সতীশকেও সে অভিশপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রতুল, দিলীপ এমনি দুই একজন আসিয়া কিছুদিনের জন্য তাহাকে সজীব করিয়া তুলিলেও বুদ্বুদের মত মিলাইয়া যাইতেও তাহারা দেরী করে না। এ যেন তাহাকে লইয়া কি খেলা চলিতেছে অথচ এ খেলায় আর তাহার প্রবৃত্তি নাই, সমস্ত কিছু ছাড়িয়া দিয়া এইবার সে বিদায় লইতে চায়।

ক্যালেণ্ডারটা পকেটে রাখিয়া দিলীপ বলিল, আচ্ছা দিদি বলুন ত' আমি কি সত্যিই অসুস্থ? প্রতুলদা কিন্তু তবু বিশ্বাস করেনি। পর-মুহূর্ত্তেই চক্ষু তুলিয়া অলকার চক্ষুর দিকে স্থিরভাবে চাহিয়া সে বলিল, পরের ওপর এত স্নেহ যার সে কি কেবলমাত্র বাজে কাজে বেড়াবার জন্যেই মা ভাই-বোনকে ছেড়ে আসতে পারে?

পারে না ইহা সত্য। অলকা তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। যাহারা পরকে আপন করিয়া লইয়া তাহাদের জন্য ভাবিয়া মরিতে পারে, তাহাদের পক্ষে উহা সম্ভব নয়। বিশ্বাস না করিয়াও উপায় নাই, বিশ্বাস করাও সহজ নয়।

অকস্মাৎ সমস্ত কথার মোড় ফিরাইয়া দিয়া দিলীপ বলিল, আর সাত দিন মাত্র বাকী, চলুন না এর মধ্যে একদিন গিরিডি গিয়ে পরেশনাথ পাহাড়ে বেড়িয়ে আসি।

হাসিয়া অলকা বলিল, ঠাকুর দেবতার ওপর হঠাৎ এত' টান হ'ল যে! হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া দিলীপ বলিল, ঠাকুর-দেবতা মাথায় থাকুন, তাঁদের চোখের আড়ালে রাখাই ভাল। মানুষ নিয়েই আমাদের কাজ, সেই মানুষেরই একটা আস্তানা দেখে আসা যাবে আর সেই সঙ্গেই দেখে আসা যাবে দরিদ্র-সাধারণের মাঝে তোমাদের দেবতার সাজ-সজ্জা।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া অলকা বলিল, অর্থাৎ সেখানে যেতে চাও শুধু দেবতার সমালোচনা করতে, মানুষের প্রত্যেক কাজকেই তোমরা তীব্রভাবে বিদ্রূপ করতে চাও এই-ত' ?

গম্ভীর হইয়া দিলীপ বলিল, তা নয় দিদি, সমালোচনা ক'রতে চাই না, আলোচনা করলেই হবে, আমার সঙ্গে তোমার মতেরও অমিল হবে না। আর বিদ্রূপ করার কথা যদি বললেই ত' বলি ওটা না হলে তোমাদের চলেও না যে। তোমাদের মনের দৃঢ় বিশ্বাসকে তীব্রভাবে আক্রমণ না করলে ও-যে কখনই ঠিক হবে না। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ত' তর্ক চলে না, বিদ্রূপ ক'রে ঠিক উল্টো চাপ দেওয়াই ওখানে কর্ত্তব্য। বিশ্বাস ভেঙ্গে গিয়ে যেদিন বিচার-বুদ্ধি হবে সেদিন তর্কেরও আর প্রয়োজন থাকবে না দিদি, সবই সোজা হ'য়ে যাবে।

হাত ধুইয়া আঁচলে হাত মুছিয়া অলকা বলিল, তা হয়ত পারবে কিন্তু সেই সঙ্গে আর কোন কিছু বিশ্বাস করার শক্তিও আর ওদের থাকবে না। অল্পবুদ্ধি যাদের তাদের কি বোঝাবে বিচারবুদ্ধির কথা! বিশ্বাসই যে তাদের বেঁচে থাকার মূল। সে মূলটাই যেদিন ধ্বংস হ'য়ে যাবে সেদিন তাদের থাকবে কি ? তার চেয়ে যা বিশ্বাস করাবে তাই বিশ্বাসের উপযোগী। ক'রে তোল না কেন ?

হাসিয়া দিলীপ বলিল, বিশ্বাস করাতে শেখাব কি ? কোন সত্যই যে চিরকালের জন্যে নয়, অথচ বিশ্বাসটা এমন একটা জিনিষ যা রক্ত মাংসের সঙ্গে জড়িয়ে গিযে ভবিষ্যতের মানুষের সংস্কার হ'য়ে দাঁড়ায়। আজকের সত্য যা দুদিন বাদে মিথ্যে হ'য়ে যাবে তাকেই বা তখন ভাঙ্গাবে কে ? মানুষের মনটাকেই তাই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলতে চাই, বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখবার কোন পথই যেন না থাকে, যার যতটুকু শক্তি সে তাই দিয়েই বিচার ক'রে দেখবে—তাতে লজ্জার কিছু নেই,

ঠকবারও নয়। কিন্তু থাক'গে সে-সব, যেতে তুমি রাজী আছ কিনা তাই বল?

অরবিন্দ কখন তাহাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন কেহই টের পায় নাই। দিলীপের কথা শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া তিনি বলিলেন, কথাগুলো হয়ত' তোমার সত্যি দিলীপ কিন্তু ওসব আমাদের শুনতে নেই। যে-কটা দিন আছি সে কটা দিন আমাদের একটা কিছু আঁকড়ে ধ'রেই থাকতে হবে। কোথায যাবার ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে?

দিলীপ বলিল, পরেশনাথে কাকাবাবু, দিদি নাকি খুব হাঁটতে পারেন তাই দেখ্‌তে চায় ওপরে উঠতে গেলে মাটীর টান তাকে কেমন বিপদগ্রস্ত ক'রে ফেলে।

সম্মুখের দিকে মুখ তুলিয়া হয়ত' বা বহুদিন আগে হারাইয়া যাওয়া দিনের কথা মনের মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিতে করিতে অরবিন্দ বলিলেন, পরেশনাথ? হ্যাঁ, গিয়েছিলাম অনেকদিন আগে, তখন আমার চোখে ছিল দৃষ্টি, দেহে ছিল বল। মণি বলেছিল, ডুলিতে চেপে যেতে; কিন্তু তাই কি পারি? কি চমৎকার লাগছিল ওই ওপরে উঠে যেতে, মনে হচ্ছিল আমি শক্তিশালী, প্রতি পদক্ষেপে সে কি অসীম নির্ভরতা কিন্তু সেদিন আর নেই মা। ওপরে উঠে নীচে মেঘের দিকে তাকিয়ে, এঁকে বেঁকে যাওয়া নদীটাকে দেখে হাসি পাচ্ছিল, ওদের প্রতি করুণা হচ্ছিল—কোনদিনই ত' ওরা ওপরে উঠে আসতে পারবে না। গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডটা সেখান দিয়েও গিয়েছে, মনে হ'চ্ছিল একবার ওখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারলেই ব'লতে পারব' এই আমাদের রাস্তা—সোজা কলকাতায় চ'লে যাওয়া যায় ওটার উপর নির্ভর ক'রেই। একটা মোটর নীচে দিয়ে যাচ্ছিল, ছোট্ট, খেলনার গাড়ীর মত, তারপর আরও কত কি—কিছুই আর মনে পড়ে না, সে আলো আর নেই, সে শক্তি? তিনি আর কোন

কথাই বলিতে পারিলেন না, মুখের উপর এক টুক্‌রা হাসি ভাসিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল।

উৎসাহিত হইয়া দিলীপ বলিল, সেখানেই নিয়ে যেতে চাই দিদিকে। নূতন মানুষ তাদের নূতন উৎসাহ নিয়ে, যৌবন নিয়ে, সেখানে যাবে কিন্তু পরেশনাথ আর তার নীচেকার সৌন্দর্য্য তাদের সেই পুরানো মূর্ত্তি নিয়েই তাদের অভ্যর্থনা ক'রবে।

অলকা বলিল, আমার যাওয়া হয় না দিলীপ, তুমি আর তোমার দাদা যেতে পার কিন্তু আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব।

অরবিন্দ বলিলেন, না মা, দিন থাকতে তাকে অগ্রাহ্য ক'রতে নেই। প্রতিদিনই মানুষ বার্দ্ধক্যের দিকে এগিয়ে যায় তাই যখন যে সুবিধে পাবে তাকেই গ্রহণ ক'রবে।

অলকা বলিল, আপনাকে ফেলে আমি কি ক'রে যাব কাকাবাবু?

অরবিন্দ হাসিলেন, ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, এইবার তুমি একটা হাসির কথা ব'লেছ মা। আমি ত' তোমার জীবনের কুগ্রহ হ'য়ে আসিনি যে, আমার কথা মনে ক'রেই পদে পদে তোমাকে পিছিয়ে যেতে হবে। তুমি কি বোঝ না ও আমাকে শুধু আঘাতই করে। পথে পথে যখন ঘুরে বেড়াতাম তখন কে দেখত আমাকে? একটা লাঠি আর দশজনের ভিক্ষে, এইত' ছিল আমার সম্বল। দু'টো দিন এ বুড়োকে ঠাকুর চাকরের ওপর ছেড়ে দিয়ে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে না মা।

অলকা তাহার দিকে ফিরে বলিল, আমি না থাকলে আপনার ভারী কষ্ট হবে কাকাবাবু।

অরবিন্দ বলিয়া উঠিলেন, না, মা, কষ্ট একটু হ'লেই যে—।

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দিলীপ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, তারপর ধীরে ধীরে হাসি থামাইয়া বলিল, কাকাবাবুর কষ্ট হবে না তাত' আমি বলি না দিদি। তবে আমার মনে হয় তোমার কষ্টই হবে আরও বেশী।

অরবিন্দ বলিলেন, না, তুমি না গেলে আমি অসন্তুষ্ট হব মা। এমন সময় সতীশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সোৎসুক কণ্ঠে দিলীপ বলিয়া উঠিল, কতদূর বেড়িয়ে এলেন? আমরা ত অনেক দূর চ'লে গিয়েছিলাম, পরেশনাথ পর্য্যন্ত। কাল আর হবে না, পরশু খুব ভোরেই গাড়ী—কল্পনাকে পাশে ফেলে রেখে বাস্তবভাবেই সবাই মিলে যাব সেখানে। ফ্লাস্ক, টিফিন-কেরিয়ার সব ঠিক ক'রে রাখতে হবে আজ থেকেই।

অলকা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আজ থেকেই?

দিলীপ সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, নয়-ই বা কেন? আমার একার কতখানি লাগে তার একটা পরখ ক'রতে গেলে আজই সব কিছু ভ'রে দেখতে হবে ত'! জানেন দিদি আর একবার গিয়েছিলাম ওই পাহাড়ের ওপর, হাতে ছিল একটা শাল গাছের ভাঙ্গা লাঠি, সঙ্গে এক ফোঁটা জলও ছিল না—পায়ের ছেঁড়া স্যাণ্ডেলটাকে ওখানেই রেখে আসতে হ'য়েছিল, পথপ্রদর্শকও ছিল না, লোকজনও বিশেষ দেখিনি ওপরে, শুনেছি বাঘ নাকি আছে অনেক—এবারে তারই শোধ নিতে হবে ত'? আজ থেকেই কাজে লেগে না গেলে কোন কিছু বাদ থেকে যায় যদি?

সতীশ বলিল, তোমরা যাও, আমি না হয় থেকেই যাই।

দিলীপ বলিল, কাকাবাবুর কথা মনে হ'চ্ছে ত'। কিন্তু আপনি থেকে তাঁর সুবিধে ক'রবেন না অসুবিধে বাড়াবেন?

অলকা হাসিয়া ফেলিল, অরবিন্দ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না আমাকে তোমরা পাগল ক'রে দেবে দেখ্‌ছি। তুমিই দেখছি কাজের লোক দিলীপ, আমাকে নিয়ে গিয়ে বশিডা ষ্টেশনে রেখে আসতে পার? এই শেষ বয়সে আর কোন অপরাধই ঘাড়ে তুলে নেবার শক্তি আমার নেই।

সতীশ বলিয়া উঠিল, কি যে বলেন তার ঠিক নেই। আপনার কাঁধে অপরাধ চাপিয়ে দিয়েই কি আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারব' নাকি? বেশ ত' পরশুই যাওয়া যাবে, তুমি সব ব্যবস্থাই ক'রে ফেল দিলীপ, এ অভিযানের নায়ক তুমিই।

দিলীপ হাসিয়া বলিল, নেতৃত্ব করবার সুবিধে এর আগে আর কোনদিন মেলেনি, এবার সে সুযোগ ছাড়ব' না, গৌরীশৃঙ্গ আক্রমণকারী নেতাদেরও হারিয়ে দেব' আমার নৈপুণ্যে। কেবল একটা অনুরোধ দাদা, সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যেই গাড়ী, খুব সকালে উঠবেন পরশু। যত বড় অভিযানের নেতৃত্ব ক'রতেই সক্ষম হই না কেন আপনার ঘুম ভাঙ্গাবার বিরুদ্ধে আমার কোন কূটনীতিই বোধ করি টিকবে না।

তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, কথা দিন যে দেরী করে এ অভাজনকে যাওয়া থেকে বঞ্চিত ক'রবেন না।

সতীশ ও অলকা তাহার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, অরবিন্দও তাহার অদ্ভুত স্বর শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, চমৎকার! এমন মানুষ থাকতে মানুষের দুঃখ কি?

দিলীপ হাসিয়া বলিল, শুনে রাখুন দিদি, ভবিষ্যতে ঠাট্টা ক'রবেন না যেন।

উচ্ছ্বসিত আবেগ দমন করিয়া অলকা আস্তে আস্তে বলিল, শুনে রাখব কেন ভাই, এ মত যে আমারও। তোমাকে সেদিন আনতে পেরেছিলাম ব'লে আমি নিজেই নিজেকে ধন্যবাদ দিই।

দিলীপ বলিল, এইরে, এবার দাদার পালা, উনি আবার সাহিত্যিক। —এমন কতকগুলো কথা হয়ত ব'লে ব'সবেন যার মানেও বুঝব' না তার চেয়ে আগেই পথ দেখা ভাল। আজ আমার বেড়ানো হয়নি, চললাম দিদি। আর কাহাকেও কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া সে হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল, অলকা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, হয়ত বা প্রতুলের কথাই তখন তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতেছিল। ইহাদের জন্ম পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে হয় না, নিতান্ত সাধারণভাবেই পথ চলিতে চলিতে নিজেরই বাড়ীর আশেপাশে অতি সাধারণের মধ্যেই এই সব অসাধারণদের দেখা মেলে। ইহাদের দেখিয়া কোন কিছুই বুঝিবার উপায় নাই কিন্তু দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্য দিয়া যে-ভাব মনের মধ্যে উহারা নিজেদেরই অজ্ঞাতে ফুটাইয়া দেয় তাহাও মুছিয়া ফেলিবার কোন উপায়ই থাকে না। উহাদের প্রশংসা করিলে হাসিয়া বিদ্রূপ করিয়া অপদস্থ করিয়া দেয়, প্রশংসা না করিলেও নিজেকে নিজের কাছেই ছোট বলিয়া মনে হয়। অতি আপন যাহারা তাহাদের ছাড়িয়া আসিতে পারিয়াছে বলিয়াই অপর কাহাকেও আপন করিয়া লইতে এতটুকু দেরীও ইহাদের হয় না। কোন কথাই না বলিয়া মূক বিস্ময়ে ইহাদের দিকে চাহিয়া থাকাই ভাল।

* * * *

যশিডীতে গাড়ী বদল করিয়া যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তাহারা উঠিয়া বসিল তাহাতে একটি মাত্র ভদ্রলোক ছাড়া আর কেহই ছিল না। ভদ্রলোক কোন্ দেশীয় দেখিয়া ঠিক বোঝা যায় না, হয়ত' বা বাঙালী, বাঙলার বাহিরে থাকিয়া আকৃতি এবং প্রকৃতি যতটা সম্ভব বদ্লাইয়া ফেলিয়াছেন। বাঙলা কথা কহিতেও পারেন, কেমন একটা বিহারী টান তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। দেহের ওজন দুই মণের কম হইবে

না, মাথার মধ্যখানের ছোট্ট একটু গোলাকৃতি টাককে ঘিরিয়া কয়েক-গাছি চুল যেন নিজেদের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্যই টিকিয়া আছে। গিলে করা ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবী ভেদ করিয়াও তাঁহার ভুঁড়ি যেন আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। পাশে বেঞ্চির উপর ফেলিয়া রাখা চশমার খাপ হইতে চশমা বাহির করিয়া নাকের উপর আঁটিয়া তিনি খবরের কাগজ পড়িবার ফাঁকে ফাঁকে ওই নবাগত তিনজনের বিশেষ করিয়া একজনকে অতি সাবধানে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

অলকা লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লইল; দিলীপ হাসিয়া ভদ্রলোকের নিকট আগাইয়া গিযা নমস্কার করিয়া বলিল, আজকের কাগজ নাকি, দেবেন একটু?

ভদ্রলোক ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, নিশ্চয়, কি বলে গিয়ে, আজকেরই ত', তবে মফঃস্বলের আজকে আর কি।

দিলীপ হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ মফঃস্বলে ওইত' মুস্কিল, বাসী খবর। কিন্তু বাসী হ'লেও বাজে নয়, আমাদের কাছে ত' টাট্‌কাই, কি বলুন?

ভদ্রলোক বলিলেন, নিশ্চয়। তা' যাচ্ছেন কতদূর? হাওড়া পর্য্যন্ত ত? বেশ যাওয়া যাবে গল্প ক'রতে ক'রতে।

মুখে একটা করুণ ভাব ফুটাইয়া দিলীপ বলিল, না অতদূর আর যাওয়া হ'ল কই? মধুপুরেই নেমে যেতে হবে, একটা ষ্টেশন মাত্র—আধ ঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিট।

ভদ্রলোকের মুখের ভাব অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, তাইত' নেমে যাবেন এত তাড়াতাড়ি। গাড়ী যতক্ষণে না ভ'রে যায় ততক্ষণ আর নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, কি জানি কা'রা উঠে পড়ে, হয়ত' দু'টো কাবুলী কিংবা একটা ফিরিঙ্গিই উঠে বসে।

দিলীপ বলিল, আর কতক্ষণ বাকী গাড়ী ছাড়তে?

হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া এবং চকিতে ওই দিকের বেঞ্চে উপবিষ্ট অলকার দিকে চাহিয়া মনে মনে যেন একটু হিসাব করিয়াই তিনি বলিলেন, আর মাত্র তিন মিনিট, ছাড়লেই ত' পৌঁছে যাবেন, ভাবনা কি ?

এমন সময় জানলার বাহিরে একটি ফিরিওয়ালা ডাকিয়া উঠিল, কেলা চাই বাবু, কেলা।

ভদ্রলোক যেন লাফাইয়া উঠিয়া ডাকিলেন, এই ইধার আও, এই কেলা।

কলাওয়ালা চলিয়া যায় নাই দাঁড়াইয়াই ছিল।

তাহার ঝুড়ি হইতে মাঝারি গোছের একটা ছড়া তুলিয়া লইয়া বেশ করিয়া বার দুই গণিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, কেতনা হো ? তারপর ভিতর দিকে মুখ ফিরাইয়া দিলীপকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কলা খেতে আমি খুব ভালবাসি, প্রত্যেকেরই খাওয়া উচিত, স্বাস্থ্যের এমন চমৎকার কোন অসুধ আর আছে কি না জানি না।

তাহার শরীরের দিকে চাহিয়া অস্বীকার করিবার কোন উপায়ই ছিল না, ওই ভূঁড়ির অন্তরালে স্বাস্থ্য বৃদ্ধির কতগুলি এমনি অসুধ যে আত্ম-গোপন করিয়া আছে তা কেই বা জানে।

হিসাব করিয়া বিক্রেতা বলিল, ছে' পয়সা বাবু।

ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। ভদ্রলোক বলিলেন, নেহি চার পয়সা, হাঁ, হাঁ, হোগা।

লোকটি মাথা নাড়িয়া ছড়াটি ফেরত চাহিল, বাবু, কিন্তু ফেরত দিলেন না। গার্ডের বাঁশী বাজিল, ট্রেনও চলিতে সুরু করিয়া দিল। বিক্রেতা ব্যস্ত হইয়া গাড়ীর সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল। ভদ্রলোক নিতান্ত নির্ব্বিকার ভাবেই ছড়াটি বেঞ্চির উপর রাখিয়া পকেট হইতে একটি আনী তাহার হাতে গুজিয়া দিলেন।

লোকটি প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, নেহি বাবু আউর দোঠো।

কিন্তু আর সময় ছিল না, গাড়ী প্লাট্‌ফরম ছাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল, কলা বিক্রেতা সক্রোধে গালি দিতে লাগিল, পকেট হইতে একটা আনী বাহির করিয়া দিলীপ তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিল। লোকটা ব্যস্ত হইয়া খুঁজিতে লাগিল, দিলীপ ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল, গাড়ী হুস্ হুস্ করিয়া আগাইয়া গেল—আর কিছুই দেখা যায় না, হয়ত' সে উহা খুঁজিয়া পাইয়াছে।

স্থির হইয়া বসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, একটা জলজ্যান্ত আনী দিয়ে দিলেন? অচল বুঝি, তা বেশ করেছেন, চ'লবে না-ই যখন তখন ওকে ঠাণ্ডা ক'রে মন্দ করেন নি।

তাহার কথা শুনিয়া দিলীপের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, না অচল কিছু আমাদের পকেটে থাকে না।

মুখ তুলিয়া চাহিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, তবু দিয়ে দিলেন? রোজগার ক'রতে হয়না বুঝি? বেশ, বেশ। অতগুলো কলা কিনেও যে আনীটা আমি দিয়েছি, দেখে আসুন গিয়ে, কেমন ঘশা আর একটু কাটাও আছে, সহজে চালানো যাবে না। আর আপনি কি না, ছিঃ। বাঙালীর ছেলে এত' বোকা তা ত' কখনও ভাবিনি, আশ্চর্য্য।

দিলীপের আর কোন কথা বলিবার প্রবৃত্তি ছিল না, সে অন্যমনস্কের মত বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

ভদ্রলোক আপন মনেই বলিয়া চলিলিন, গাছ থেকে কতকগুলো কলা ছিঁড়ে নিয়ে এসেছে তার আবার দাম! আমার জমীদারীতে গিয়ে দেখুন না, যা চান সবই পাবেন, আমার নাম করুন, কোন্ কি বলে গিয়ে, ইয়ের সাধ্যি পয়সা নেয়। বলে এ হচ্ছে গিয়ে মাধব রায়, রায় রায়ান

ব'ললেই বা কে আট্‌কাতে পারে! বিশ বছর পুলিসে চাকরী ক'রেও যদি মানুষ না চিনতে পেরে থাকি ত' আমি একটা আস্ত গজ-কচ্ছপ। তারপর গোটা চারেক কলা দিলীপের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, নিন না এ'কটা, আপনাদের—।

দিলীপ মাথা নাড়িয়া বলিল, না ও খাবার ইচ্ছে আমাদের নেই। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, বিলক্ষণ, কলা খাবার আবার ইচ্ছে! পুলিসে যখন চাকরী করি তখন হেঁ হেঁ। তারপর সেই জমীদারী পাওয়াটার কথা জানেন না বুঝি? একেই বলে গিয়ে বুদ্ধি। ওখানকার জমীদার খুনের দায়ে ধরা প'ড়ে গেল, একেবারে নির্ঘাৎ ফাঁকী, আমারই হাতে তদারকের ভার ছিল কি না, ফাঁসী বেঁচে গেল আর কিছু টাকা দিয়ে জমীদারকে বুঝলেন না? তারপর সমস্ত জমীদারীটাই এসে গেল হাতে, একটু বুদ্ধির খোঁচা আর কি। এসব শিখতে হয়, শিখতে হয় বাপু। একটা আস্ত কলা মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নিতান্ত তুচ্ছভাবেই খোসাটাকে ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া মোটা কম্বলটাকে পায়ের কাছে নামাইয়া বালিশে হেলান দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন।

মধুপুরে আসিয়া গাড়ী থামিল। সতীশ ও অলকাকে নামাইয়া দিয়া বিছানা দুইটা কুলীর মাথায় চাপাইয়া ছোটখাট জিনিষগুলি লইয়া দুই হাত একত্র করিয়া মাধববাবুকে নমস্কার করিয়া দিলীপ বলিল, চল্‌লাম, আপনার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকলে আরও কিছু শেখা যেত। যাই হ'ক আপনার মূল্যবান উপদেশ দিয়ে যদি কয়েকজনকেও অন্তত তৈরী ক'রে যেতে পারেন ত' বাঙলা দেশের জন্যে আর ভাবতে হবে না।

কথাটাকে অত্যন্ত প্রশংসাসূচক মনে করিয়া মাধববাবু টানিয়া টানিয়া হাসিয়া বলিলেন, সে আর ব'লতে, আমিও ত' তাই মনে করি। কি বলে গিয়ে, শিক্ষাটাই ত' আসল, আপনার মত যদি দু'একজনও পেতুম, হেঁ

হেঁ। যাবেন আমাদের ওদিকে, কিচ্ছু অসুবিধে হবে না, মাধব রায়ের জমীদারী, বুঝলেন কি না? বাঘে গরুতে একসঙ্গে জল খায়, এও তাই, বিশ বচ্ছর পুলিসে ছিলুম ত'। আচ্ছা, নমস্কার, যাবেন। মাধব রায় দুই হাত একত্র করিয়া নমস্কার করিলেন, শেষবারের মত অলকার দিকে চাহিতেও ভুলিলেন না।

গিরিডীর গাড়ীতে উঠিযা বসিয়া দিলীপ বলিল, চমৎকার ওই মাধব রায়, ভারতবর্ষের সৌভাগ্য ব'লতে হবে, এমনি বুদ্ধির জাহাজ কত মাধব রায়ই না জানি এর পল্লীতে পল্লীতে লুকিযে আছে।

অলকা হাসিয়া বলিল, বেশ ভাব ক'রে নিয়েছিলে কিন্তু তুমি। ঘসা আনি দিয়ে কেনা অত সাধের স্বাস্থ্যের বীজের ভাগও বসিয়েছিলে আর একটু হ'লেই।

হাসিয়া দিলীপ বলিল, ওটা মাধব রায়ের রায রাযান স্বভাবের সুগম্ভীর চাল।

সতীশ বলিল, আশ্চর্য্য লোকটার নির্লজ্জতা, আনিটা তোমায ফেরত দেবার কথা একবারও মনে হ'ল না ত'? নিজের দোষকে কেমন সুন্দর গুণ ব'লে চালিয়ে দিয়ে গেল, আশ্চর্য্য।

দিলীপ বলিল, বিশ বচ্ছর পুলিসে চাকরী ক'রেছে, ফাঁকী দিয়ে জমীদারী নিয়েছে তার সমকক্ষ কি আমরা হ'তে পারি? আপনার সাহিত্যে এদের টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে পারেন না? উত্তেজনায় উঠিয়া পড়িয়া দিলীপ সমস্ত কামরাটার মধ্যে পায়চারী করিযা বেড়াইতে লাগিল।

তাহার উত্তেজনা সতীশ ও অলকার নিকট অত্যন্ত অভিনব বলিয়াই মনে হইল। রায় রায়ানের সম্মুখে বসিয়াও যে মুহূর্ত্তের জন্য উত্তেজিত হয নাই তাহার হঠাৎ এ কি হইল? কিন্তু কেহই কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না।

উত্তেজনা কতকটা উপশম হইলে সতীশের সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া দিলীপ বলিল,খেলোয়াড়দের আর আপনাদের সাহিত্যিকদের ওপর আমার ভয়ানক রাগ হয় দাদা। আপনাদের নাকি রাজনীতির সঙ্গে কোন সংস্রবই নেই। আমি ভেবে পাই না, জাতীয়তার কোন কথাই কি আপনাদের মনে আঘাত করে না। আপনাদের কলমের যা শক্তি সে যদি কাজে লাগাতেন! থাক্‌গে। সে উঠিয়া গিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল। ওই দূরের শালবনের দিকে চাহিয়া মনের উত্তেজনা সে উপশম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এ সমস্তই নিজেদের অথচ কিছুর উপরই যেন জোর নাই। হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া অলকার সম্মুখে বসিয়া বলিল, কেমন যেন হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেছে দিদি, বোধ হয় ক্ষিধে পেয়েছে, না?

কোন কথাই না বলিয়া শান্তভাবে একটা রেকাবীতে খাবার সাজাইয়া অলকা তাহার সম্মুখে আগাইয়া দিল দিলীপও মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করিয়া আহারে মনোনিবেশ করিল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই রেকাবীটা খালি করিয়া ফেলিয়া সে হাসিয়া বলিল, উঃ, ক্ষিধে পেয়েছিল ব'লে কি বক্তৃতাই সুরু ক'রে দিয়েছিলুম। যে কটা দিন কলেজে প'ড়েছিলুম তাতেই বুঝেছিলুম যে খালি পেটে পথ চ'লতে চ'লতে দর্শনের যে ব্যাখ্যা অতি সাধারণ ছেলেরাও ক'রতে পারে সে ব্যাখ্যা বৈদ্যুতিক পাখার তলায় ব'সে বিরাট অধ্যাপকের পক্ষেও সম্ভব নয়। আমার উত্তেজনা দেখে রাগ করেননি ত' দাদা?

সতীশ বলিল, রাগ করার মত কোন কিছুই ত' তুমি বলনি। যা সত্যি তাই শুধু তুমি ব'লেছ।

লজ্জিত হইয়া দিলীপ একটু হাসিল। ক্ষণকাল পরে মৃদুস্বরে বলিল, রাগ ক'রতে আপনাকে কেউ কোনদিন দেখেছে বলেও ত' আমার বিশ্বাস হয় না।—

অলকা বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, এমনি ধরণের কথা তাহার এখন ভাল লাগিতেছিল না। উহাদের মধ্যে একজনের যে নিস্পৃহ ভাব এবং অপরজনের যে সহজ শিশু-সুলভ ব্যবহার সে এতদিন দেখিয়া দেখিয়া অভ্যস্ত হইয়াছে তাহার বাহিরের কোন অবস্থাতেই যেন সে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিল না। নিজেদের ভুলিয়া উহারা এই যে গম্ভীর আলোচনায় মাতিয়া উঠিয়াছে ইহা যেন উহাদের এতটুকুও মানাইতেছিল না। আজ এই সহজ আনন্দের দিনে, এই দুইটা দিনের আনন্দ অভিযানের একটা ছক আঁকিতে না বসিয়া এমনি আলোচনা করিয়া কি যে ফল হইবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। দূরের মাঠে দুই চারিটা গরুর পিছনে যে সাঁওতালের ছেলেটা দৌড়াইতেছিল তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অলকার আশা মিটে না। এমনি সহজ আনন্দেই নিজের খুসী মত যদি সবাই দিন কাটাইতে পারিত? রাখাল বালকটিকে আর দেখা যাইতেছিল না। দৃশ্যের পর দৃশ্য বদল হইয়া যাইতেছে, চোখের উপর নূতন নূতন ছবি ভাসিয়া উঠিতেও বিলম্ব হয় না, কিন্তু যাহা চিরন্তন, যাহার জন্য মানুষের দুঃখের অন্ত নাই তাহাকে এমনি করিয়া পাওয়া যায়?

দিলীপ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, যাক্‌গে ও-সব, উপস্থিত এ দুটো দিনের কথা নিয়েই ভাবতে হবে আমাদের। চায়ের আসরের বক্তৃতার মত করে কোন গভীর বিষয়েই মন দেওয়া যায় না। এ দু'দিনের একটা পাকা বন্দোবস্ত হ'য়ে যাক্‌ কি বলুন দিদি?

অলকা মুখ ফিরাইয়া চাহিল, কিন্তু তাহার চক্ষের ভাব দেখিয়া মনে হইল যে, সে তখন কোন্‌ এক স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে।

হাসিয়া ফেলিয়া দিলীপ বলিল, দিদিও কি আমাদের সঙ্গে সমাজের স্তরে স্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন নাকি? কিন্তু আর ত অন্যদিকে মনটাকে রেখে দিলে চলবে না, বর্ত্তমানে ফিরে আসুন।

এতক্ষণে অলকা সহজভাবে হাসিয়া বলিল, আমি বেশী দূরে যেতে পারিনি, তোমাদের সঙ্গে সমানভাবে হেঁটে পথ চলা কি আমাদের সাধ্য মনে কর ?

কপালে করাঘাত করিয়া দিলীপ বলিল, আপনার আশে পাশে থেকে অনেকেই অনেক ভাল ভাল কথা শিখে নিলে দাদা, কিন্তু এ অভাগার কপালে তা আর হ'ল না। কি আশ্চর্য্য, দু-চারটে বেশ ভাল ভাল কথাও কি মনে আসতে পারে না ছাই।

অলকা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, বেশত, আমিই শিখিয়ে দেব না হয়। যাক এ দুটো দিনের কথা কি ব'লছিলে যেন।

দিলীপ বলিল,—পরেশনাথে যেতেই ত' এসেছি এখানে। কিন্তু বেচারা উশ্রী বাদ প'ড়ে যায় কেন ? আজ ত' আর আমাদের পরেশনাথ যাওয়া হবে না, কাল। এর মধ্যে আজ বিকালে উশ্রীর ওপর যদি আমরা একটু দয়া দেখাই ত' এমন কিছু অন্যায় হবে কি ?

কথাটা সমর্থন না করিবার কোন কিছুই ছিল না। অলকা মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিয়া বলিল, হ্যাঁ এখানে উশ্রীরও একটা পদমর্য্যাদা আছে, তাকে অপদস্থ করার আমাদের কোন অধিকারই নেই।

প্রস্তাব উঠিলেই সাধারণত তাহা পাশ হইয়া যায়, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না।

গিরিডী ষ্টেসনে নামিয়া বাহিরে কয়েকটা ভাড়া মোটর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সতীশ বলিয়া উঠিল, তুমি এদিকের সব ঠিক ক'রে নাও দিলীপ, আমি ততক্ষণ একটা গাড়ীতে উঠে ব'সে পড়ি।

হাতজোড় করিয়া তাহার পথ আটকাইয়া ঘাড়টাকে একটু কাৎ করিয়া দিলীপ বলিল, ব্যস্ত হবেন না দাদা, মোটর, সে ত' ক'লকাতার জিনিষ, এখানে তা হয় না, যে দেশের যে রীতি।

ভয় পাইয়া সতীশ বলিল, হেঁটে যেতে হবে নাকি, কতদূর ?

তাহার ভয় দেখিয়া হাসিয়া দিলীপ বলিল, না হেঁটে নয়, টাঙ্গা—এ দেশের মহাসম্মানীয় রথ।

বাহিরে আসিয়া দুইটা টাঙ্গা ভাড়া করিয়া একটাতে মালপত্র-সমেত অলকাকে বসাইয়া দিয়া অপরটাতে সতীশকে লইয়া দিলীপ উঠিয়া পড়িয়া টাঙ্গাওয়ালাকে বলিল, ডাক-বাঙ্গলোতে নিয়ে চলত' বাপু, আর দেখ হে, রথটা যেন একটু জোরেই চলে।

টাঙ্গাওয়ালা সসম্ভ্রমে বলিল, বলেন কি বাবু, উড়িয়ে নিয়ে যাবে। পাঁচ ছ' মিনিটেই, সে দেখতে হবে না, বাবু।

টাঙ্গাওয়ালার পিছনেই দুইজনের বসিবার মত একটু স্থান। ঘাস এবং খড়ের একটিমাত্র গদীর উপরেই সকলকে বসিতে হয়। পুষ্পকরথ দুইটি চলিতে সুরু করিল।

দিলীপ হাসিয়া বলিল, গাড়ী যে-দিকে চ'লেছে তার ঠিক উল্টোদিকে মুখ ক'রে ব'সে থাকা, এ যেন গাড়ীর চলাকে অগ্রাহ্য করা মন্দ নয়, কি বলেন দাদা ?

টাঙ্গাওয়ালা মুখ ফিরাইয়া সেলাম জানাইয়া বলিল, আমার পাশের জায়গাটাতেও ব'সতে পারেন বাবু, তিনটে ক'রে জায়গা আছে প্রত্যেক গাড়ীতে।

দিলীপ বলিল, সে ত' দেখতেই পাচ্ছি বাপু, বেশ তিনজনেই চড়া যাবে খ'ন, কিন্তু টাট্টু তোমার টানতে পারবে ত' ?

নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে হাসিয়া টাঙ্গাওয়ালা বলিল, তিনজন ! ও আর শক্ত কথা কি বাবু। এই ত' সেদিন কলকাতা থেকে দু'জন বাবু এসেছিলেন, তাদের এক একজনই আপনাদের তিনজনের সমান, মোটর গাড়ী থেকে কেড়ে নিলুম তাদের, উঃ তাদের সে কি ভয়।

কিন্তু হ'ল কিছু? হুঁ, সে রকম টাট্টুই নয়, এ তল্লাটে আছে নাকি এর জুড়ি!

তাহার বীরত্বব্যঞ্জক কথা শুনিয়া হাসিয়া দিলীপ বলিল, বেশ'ত বাপু, এস দেখি আজ গোটা দু'যেকের সময়. উশ্রী নিযে যেতে পারবে ত?

হাসিয়া নড়িয়া চড়িয়া লোকটা বলিল, উআর শক্ত কথা কি বাবু, পরেশনাথ নিয়ে যেতে পারে—তিন ঘণ্টায় উড়িয়ে।

কথাটাকে এতটুকু বিশ্বাস না করিয়া দিলীপ বলিল, না হে বাপু, সে পরীক্ষায় কাজ নেই। তোমাকে যা বললুম তাই কর, এস ঠিক সময়।

'দুটা গাড়ীই আসবে ত? লোকটা জিজ্ঞাসা করিল—মাথা নাড়িয়া দিলীপ বলিল, কেন হে, তিনজনকে না নিয়ে যেতে পারবে বললে?

লোকটা সেলাম করিয়া জানাইল. বহুত, খুব, ঠিক সময়েই এসে যাব, কিছু ভাবতে হবে না। মেহেরবাণী করিয়া কিছু বকশীশও যাহাতে তাহাকে দিতে বাবুরা ভুলিয়া না যান তাহাও সে বারকযেক মনে করাইয়া দিল।

ডাক বাঙ্গলো আসিয়া গিয়াছিল। টাঙ্গা বিদায় দিয়া, বাঙ্গলোয় আশ্রয় লইয়া আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইতেও দিলীপের বিলম্ব হইল না।

বেলা প্রায় তিনটার সময় টাঙ্গাওয়ালা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং এই ঘণ্টাখানেক বিলম্ব হইলেও তাহার পক্ষীরাজের পক্ষে যে উহা অকিঞ্চিৎ-কর তাহা বার বার জানাইয়া লোকটা তাহাদের সমস্ত ভাবনা দূর করিয়া দিল বলিয়াই মনে করিল।

সতীশ কিন্তু মোটেই প্রসন্ন হইতে পারিতেছিল না। এ দেশে এত-গুলি মোটর থাকিলেও টাঙ্গার প্রতি দিলীপের এই অহৈতুকী প্রীতি দেখিয়া সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নিতান্ত হতাশ হইয়া সে মাথা নাড়িয়া বলিল. নাঃ, তুমিই শেষ পর্য্যন্ত আমায় মারবে দেখছি, সমস্ত গায়ে

যা ব্যথা হবে। আর ওখানে পৌঁছাতেও ত' সন্ধ্যে পার হয়ে যাব—শুনেছি বাঘ নাকি বেরোয় মাঝে মাঝে।

টাঙ্গাওয়ালা সসম্ভ্রমে বলিল, না বাবু বাঘ আর কই। ওদেরও ত' একটা ভয় আছে। হায়না লেক্‌ড়ে দেখা যায় মাঝে মাঝে—ও কিছু নয়। এক ঘণ্টার রাস্তা, উঠে যান্ বাবু।

একটু ইতস্তত করিয়া সতীশ টাঙ্গাওয়ালার পাশে বসিয়া পড়িল। অলকা আর দিলীপ পিছনে উঠিয়া বসিতেই টাঙ্গা চলিতে সুরু করিল।

হাসিয়া দিলীপ বলিল, এ রথগুলো বেশ, মনে হয় যেন বসে বসে হেঁটে যাচ্ছি। যুধিষ্ঠিরের সময় থেকে এ যানটি সম্মান পেয়ে আসছে, আমরা সামান্য মানুষ, দু'হাত তুলে একে কুর্নিশ করি।—

তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিয়া অলকা বলিল, নূতন একটা অভিজ্ঞতা হ'ল একথা কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই।

দিলীপ বলিল, দাদা একেবারে চুপ করে আছেন যে, অভিজ্ঞতার জাল বুনছেন হয়ত'।

সতীশ আর নিজেকে সংযত রাখিতে না পারিয়া বলিল, কাল আর আমার কোথাও যাওয়া হবে না। এলুম পরেশনাথ দেখতে তোমার পাল্লায় পড়ে, তা নয় ত পক্ষীরাজের রথে চাপিয়ে হাড়গুলো গুঁড়ো করে ছাড়লে। আজ সারা রাত গা টিপিয়ে তবে ছাড়ব।

টাঙ্গাওয়ালা বিস্মিত হইয়া বলিল, বলেন কি বাবু গুঁড়ো হবে কি? সেই মোটা বাবুরা পর্য্যন্ত বকশীশ দিয়েছেন যে।

সতীশের ইচ্ছা হইল যে বলে সেই মোটাবাবুদের কি আর হাড় আছে। কিন্তু কোন কথা বলিবারই আর তাহার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়াই সে চুপ করিয়া রহিল।

নিতান্ত ভালমানুষের মত দিলীপ বলিল, এ-ত বেশ ভাল

রাস্তা দাদা, বাজার ছাড়িয়ে খানিকটা গেলে দেখবেন কেমন চড়াই আর উৎরাই।

সতীশ হতাশ হইয়া বলিল, আরও আছে?

লোকটা হাতের চাবুক ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, গাড়ীর দোষ কি বাবু, রাস্তাটাই যা একটু! তা ভাবতে হবে না কিছু, একটু ঝাঁকানি লাগবে, টাট্টু আমার ঠিক আছে।

সতীশ হতাশভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, যাহা হইবার হউক সে আর কিছুই বলিতে চাহে না। দিলীপ, এমন কি অলকাও যদি হাসিয়া ইহাকে কৌতুক বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকে ত' তাহার ভাবিবারই বা কারণ কি!

বাজারের শেষ প্রান্তে আসিয়া টাঙ্গাওয়ালা বলিল, ভাড়ার একটা টাকা দিন বাবু, একটু কাজ আছে এখানে।

দিলীপ বলিল, কি হে বাপু, পৌছবার আগেই টাকা?

লোকটা মাথা চুলকাইয়া বলিল, আজ্ঞে বাবু যা শীত পড়বে আর টাট্টুর জন্যও কিছু সওদা করে নিতুম। আপনারাও নিন্ না কিছু খাবার কিনে।

সতীশ বলিল, তুমি দেখছি আরও দেরী করাবে, আজ কপালে বাঘই লেখা আছে। অর্ব্বাচীনের পাল্লায় পড়ে কোন কাজই করতে নেই দেখছি।

দিলীপ বলিল, আমি কানে তুলো গুঁজে বসে আছি, ওতে আমার কিছু হবে না।

লোকটার হাতে একটা টাকা দিয়া অলকা বলিল, একটু তাড়াতাড়ি ক'রে নিও, দেরী হয়ে গেলে দেখবার সময় ত বেশী পাওয়া যাবে না।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই লোকটা ফিরিয়া আসিল। সতীশ অন্যদিকে তাকাইয়াছিল, পাশের দোকানে দোদুল্যমান একটি রবারের বানরকে

চোখ পিট্ পিট্ করিতে দেখিয়া অলকা সেইদিকেই চাহিয়াছিল, লোকটা যে একটা বোতল আনিয়া লুকাইয়া ফেলিল তাহা উহারা দুইজনে না দেখিতে পাইলেও দিলীপের চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারিল না।

টাঙ্গা চলিতে সুরু করিল।

দিলীপ হাসিয়া বলিল, খুবই শীত পড়বে, কি বল হে ?

লোকটা তাহার কথা শুনিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, কি করব হুজুর, আপনাদের মত শীতের কাপড় যে আমাদের নেই। মূর্খ গেঁয়ো লোক আমরা।

লোকটা যে অনেক দিন হইতেই বাবুদের দেখিয়া আসিতেছে এবং অনেক ভাল ভাল কথাও যে সে শিখিয়াছে সে সম্বন্ধে দিলীপের আর কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু যেকথা এইমাত্র ওই লোকটা বলিয়া বসিল তাহার সত্যই কি কোন সদুত্তর দিবার আছে ?

অনেক দূর চলিয়া আসিবার পর ওদেশীয় একটা ছোট্ট নদী পার হইতে হইল। কোন যাত্রী লইয়া ওই ছোট্ট খালটুকু পার হওয়া কোন পক্ষীরাজের পক্ষেই নাকি সম্ভব নয়। অলকাকে লক্ষ্য করিয়া লোকটা কিন্তু বলিল, আপনি বসে থাকুন মা, আমার টাট্টু সবার সেরা, আপনাকে নিয়ে অনায়াসেই—। লোকটা টানিয়া টানিয়া বার কয়েক হাসিয়া যেন তাহাকে ভরসা দিতে চাহিল।

অলকা এতটুকুও ভরসা পাইল না বরং তাহার টাট্টুর শক্তির কথা শুনিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। অত শক্তিমান টাট্টু যে কখন সোজা রাস্তা ফেলিয়া অসমান রাস্তা দিয়া দৌড়াইতে সুরু করিয়া দিবে তাহা কে বলিতে পারে !

অলকাকে নামিয়া পড়িতে দেখিয়া একটু দুঃখিতভাবে লোকটা বলিল, টাট্টুকে বিশ্বাস হ'ল না মা।

অলকা তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বসিয়া থাকিতে পারিল না, এপারে আসিয়া খানিকটা হাঁটিয়া শরীরের জড়তা কাটাইয়া আবার তাহারা উঠিয়া বসিল।

হাতের ঘড়ীর দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল আর কতক্ষণ লাগবে বাপু?

'আর বাবু এসে গেছে।' লোকটা উত্তর করিল।

আরও আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

দুই চারিটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ সাঁওতাল শিশু টাঙ্গার পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল এবং তাহাদের একত্র কলধ্বনির মধ্য হইতে 'পয়সা' কথাটাই বার বার শোনা গেল।

টাঙ্গাওয়ালা বলিল, দিয়ে দিন মা, দু'একটা পয়সা, নয়ত' এমনি ক'রে ওরা মাইলখানেক ছুটে আসবে।

হাসিয়া হাত বাড়াইয়া অলকা তাহাদের ডাকিতে লাগিল। উৎসাহে, আনন্দে তাহারাও হেলিয়া দুলিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কিছু যে মিলিবে সে সম্বন্ধে আর কোন সংশয়ই তাহাদের ছিল না, এমনি করিয়া কেহ তাহাদের ডাকে নাই। অলকা প্রত্যেকের জন্য একটি করিয়া পয়সা ফেলিয়া দিল, তাহাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল, কেহ পাইল না, কেহ বা বেশী পাইল। অপরকে বঞ্চিত করিবার সুযোগ পাইলে কেহ ছাড়িয়া দেয় না, দূর গ্রামের প্রান্তে থাকিয়া ইহারাও স্বতসিদ্ধভাবেই তাহা শিখিয়া ফেলিয়াছে। দূরে আরও কয়েকটা উলঙ্গ ছেলে মেয়েকে আসিতে দেখা গেল।

দিলীপ তাহাদের আসিতে দেখিয়া বলিল, একটু জোরে চালাও হে, শেষকালে কি এখানেই আটকে পড়তে হবে নাকি?

টাঙ্গা আগাইয়া চলিল। আরও মিনিট পনের কাটিয়া গেল। ছোট্ট একটা লাঠি হাতে অর্দ্ধ-উলঙ্গ একটি বার তের বৎসরের ছেলেকে তাহাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিতে দেখা গেল।

দিলীপ তাহাকে দেখিয়া বলিল, এরা দেখছি ব্যাধির মত, গন্ধও পায় ত' বেশ।

তাহার দিকে ফিরিয়া টাঙ্গাওয়ালা বলিল, ও বাবু পয়সা চাইতে আসছে না, ও আসছে আপনাদের উশ্রীতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। দু'আনা পয়সা পেলেই ও আপনাদের সব ঠিক্ ঠিক্ দেখিয়ে নিয়ে আসবে।

সতীশ বলিল, তবে এসে গেছে বল ?

লোকটা হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, আধ মাইল আর হবে।

ততক্ষণে ছেলেটা নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। সাঁওতালের শরীরের সে লাবণ্য তাহার দেহে নাই, সভ্যতার মাঝে আসিয়া দেহের স্বাস্থ্যকে ইহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ছেলেটা টাঙ্গার পাশে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, উশ্রী যাবি ত বাবু, হামি পথ দেখাইয়ে লিয়ে যাব।

টাঙ্গা থামাইতে আদেশ দিয়া দিলীপ বলিল, উঠে এস হে বাপু, এমনি ক'রে আর কতকক্ষণ দৌড়বে।

ছেলেটা তাহার কথা না বুঝিলেও তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, নেহি বাবু, হামি ঠিক আছি, তুরা চল্ না।

টাঙ্গাওয়ালাও হাসিয়া বলিল, ওদের এই অভ্যেস বাবু, বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলোকে দেখলেন ত' একটা পয়সার জন্যে কত মেহনৎ করে।

এমনি করিয়া অর্দ্ধমাইলেরও উপর দৌড়াইয়া আসিয়া বাবুদের বোঝা ঘাড়ে করিয়া ইহারা তাহাদের সুখ-সুবিধা করিয়া দেয় এবং তাহারই

পরিবর্ত্তে দুই এক টুক্‌রা রুটি এবং আনা দুই পয়সা লইয়া সানন্দে গৃহে ফিরিয়া যায়।

ধীরে ধীরে টাঙ্গা থামিয়া গেল। তাহারা তিনজনেই নামিয়া পড়িল, ছেলেটা একটু পিছাইয়া আসিয়া হাতের ছোট লাঠিটাকে কাঁধের উপর ফেলিয়া বলিল, তুদের সঙ্গে ধোঁয়া কল নাই?

দিলীপ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, কি দরকারই বা তার?

ছেলেটা ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া হাসিয়া বলিল, হামার সঙ্গে টাঙ্গি ভি নাই। আচ্ছা চল্‌, শের কুথাকে মিলবে?

সতীশের মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, অলকা তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিল।

দিলীপ তাহার হাসি দেখিয়া বলিল, যাকে ঠাট্টা ক'রেই হাস না কেন দিদি, বিপদের ভয় কিন্তু তোমার জন্যই বেশী।

অলকা হাসিয়াই বলিল, আমি ত' আর সাধারণ মেয়েদের মত বোঝা নই ভাই যে আমার জন্যে তোমাদের ভেবে সারা হ'তে হবে।

দিলীপ বলিল, অসাধারণটাই বা কিসে?

অলকা বলিল, তাত' জানিনে ভাই, কিন্তু নিজেকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না, সদুত্তর হয়ত মিলতেও পারে। তারপর হঠাৎ সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া সে ছেলেটার দিকে চাহিয়া বলিল, তোর নাম কিরে?

ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া ছেলেটা উত্তর করিল, হামি লছমন আছি মা।

পকেট হইতে একটা ধারাল বড় ছুরি বাহির করিয়া পথের দুই পাশের শালগাছের মধ্য হইতে তিনটা লাঠি কাটিয়া উহাদের দুইজনের হাতে দিয়া এবং নিজেও একটি সামরিক প্রথায় কাঁধে তুলিয়া লইয়া দিলীপ বলিল, এইবার আক্রমণকারীরা প্রস্তুত, অভিযান সুরু হ'ক, চল হে দূত।

চলিতে চলিতে অলকা বলিল, বাঘ এলে কি লাঠিরই জয় হবে নাকি!

হাসিয়া দিলীপ বলিল, না সে-সময়ে তোমাকে সামনে রেখে আমরা পিছু হ'টে আসব, ধর্ম্মযুদ্ধে নারীর গায়ে হাত তোলা নিষিদ্ধ, তুমি ত বেঁচে যাবে, আমরাও।—

অলকা বলিল, পুরুষদের পক্ষে সে খুব আশ্চর্য্যের নয়।

উশ্রীর ধারে পৌঁছিয়া ছেলেটা বসিয়া পড়িয়া বলিল, তুরা ঘুরে দেখ, হামি এখানেই আছি।

কিন্তু কোথায়ই বা ঘুরিয়া বেড়াইবে, দিলীপ খানিকক্ষণ লাফালাফি করিয়া ফিরিয়া আসিল।

সতীশ বলিল, কি যে হ'ল এখানে এসে, কি আছে দেখ্‌বার?

দিলীপ বলিল, এ ত' কলকাতা নয় দাদা যে খানিক ভিক্টোরিয়া হল দেখে বেড়াবেন। আমার ত মনে হয় ওই পাথরটার ওপর শুয়ে শুয়েই আমি রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতে পারি। আপনার লেখা পড়ে কি করে যে লোকে আনন্দ পায় তা' ত' ভেবে পাইনে।

এইবার সতীশ হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু কোন কথাই বলিল না।

অলকা জলের ধারে গিয়া বসিয়াছিল, উপর হইতে জল নীচে আসিয়া পড়িতেছে আর জলকণা ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া ফেণার সৃষ্টি করতেছে। তাহার শাড়ী ভিজিয়া উঠিযাছিল কিন্তু তথাপি সেই স্থান ছাড়িয়া সে উঠিয়া যাইতে পারিতেছিল না।

দিলীপ সেই দিকে চাহিয়া বলিল, একেবারে ভিজে যাবেন যে দিদি, ফেরবার সময় শীত কেমন লাগে বুঝবেন। আমার চাদরটা দিতে পারব না তা'বলে।

অলকা হাসিয়া বলিল, দিতে হবে কেন ভাই, লাগলে আমি কেড়েই নিতে পারব।

সতীশ শঙ্কিত হইয়া বলিল, পড়ে গেলে কিন্তু—। পড়িয়া গেলে যে কি হইবে তাহা না বলাই ভাল। জল যে খুব উপর হইতে আসিয়া পড়িতেছে তাহা নহে কিন্তু যে ভাবে আসিয়া পড়িতেছে তাহাতে একবার ফস্‌কাইয়া পড়িয়া গেলে জীবন্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়।

লছ্‌মন দূর হইতেই বলিল, ছবি তুলবিনে তুরা! ফুটুস করে যে ফটোক ওঠে সে নাই তুদের কাছে?

দিলীপ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না সে-সব নেই।

লছ্‌মন ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, তবে তুরা কি বাবুরে? কত কত বাবু আরও আস্‌ছে, হামার ভি ফটোক্ লিছে, পাঠাইয়া দিবে বলে ঠিকানা ভি লিছে।

হাসিয়া অলকার দিকে একবার চাহিয়া দিলীপ বলিল, পাঠিয়েছে নাকি রে, দেখাবি?

ঘাড় নাড়িয়া লছ্‌মন জানাইল যে, যদিও অনেকদিন হইয়া গিয়াছে কেহই তাহাকে ছবি পাঠায় নাই, তথাপি ছবি যে আসিবেই, সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

বাবুদের ফাঁকির খবর গেঁয়ো লছমন কি জানিবে। আজিও ইহার ভরসা আছে, বাবু যাহারা তাহারা মিথ্যা বলিবে না, এই বিশ্বাসে আজিও সে হয়ত উৎসুক হইয়া আছে। সমবয়সী এবং মাতব্বরদের নিকটে সে সেই ছবি দেখাইয়া কেমন গর্ব্ব অনুভব করিবে, তাহাও হয়ত সে মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। ভবিষ্যৎ যে তাহার জন্য কি লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে, ভাবিয়া দিলীপ সত্য-সত্যই দুঃখিত হইল। নিজেদেরই গোষ্ঠির ভদ্র-সন্তানদের কথা মনে করিয়া সে লজ্জিত হইয়া পড়িল। ফটো তুলিবার যন্ত্র যাহাদের সঙ্গে না থাকে, তাহারা কি রকম বাবু, তাহা আজ ওই

ছেলেটি ভাবিয়া পায় না, একথা মনে হওয়ায় সে আনন্দিতই হইল। বাবুর পর্য্যায়ে পড়িয়া ভবিষ্যতে উহারই চক্ষে সে ছোট হইয়া যাইতে চাহে না।

অকস্মাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সতীশকে লক্ষ্য করিয়া দিলীপ বলিল, এখানে এই উশ্রীর মূর্ত্তি দেখে নদীটা সম্বন্ধে একটু ভাল ধারণাই হয়, কিন্তু আসল নদীটায় পায়ের পাতাও ডোবে না। মানুষের মাঝেও হঠাৎ যে সাজসজ্জা চোখে পড়ে, তাতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিন্তু তার আসল দৈন্যটা ধরা পড়ে একটু তলিয়ে দেখলে। তারপর হঠাৎ জোরে হাসিয়া উঠিযা বলিল, যাক্‌গে, অন্ধকার হ'যে আস্‌ছে, এবার উঠে পড়ুন দাদা।

অলকা হাসিয়া বলিল, ভয় কি, লাঠিই ত আছে, বাঘ এসে করবে কি?

দিলীপও হাসিয়া বলিল, লাঠি হ'চ্ছে সাপের জন্য, বাঘের জন্যে ত তুমিই রয়েছ।

সতীশ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, না, আর দেরী ক'রে কাজ নেই। বাঘের চেয়েও শীতের ভয় আমার বেশী, সন্ধ্যে হ'য়ে আস্‌ছে।

ফিরিয়া আসিতে বেশীক্ষণ লাগিল না। লছ্‌মনের হাতে একটা আধুলি গুঁজিযা দিয়া অলকা বলিল, সত্যি শীতটা একটু বেশীই প'ড়েছে, দেরী করা ভাল হয নি।

লছ্‌মন বুকের উপর দুই হাত রাখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আশাতিরিক্ত পুরস্কার পাইযা সে মাথা নোয়াইযা অলকাকে প্রণাম জানাইল।

টাঙ্গা চলিতে আরম্ভ করিল, লছ্‌মন গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গান করিতে করিতে মাঠের উপর দিয়া দৌড়াইতে লাগিল।

সেদিকে চাহিয়া দিলীপ বলিল, এরা বড় গরীব দিদি, এই শীতে গায়ে দেবার মত এতটুকু কাপড়ও জোটে না, সম্বল হচ্ছে গান আর ছুটে চলা।

জঙ্গল থেকে পাতা আর কাঠ কুঁড়িয়ে এনে তাই জ্বালিয়ে ছেলে-বুড়ো চুপ ক'রে ব'সে থেকে পুরনো দিনের গল্প করে।

অলকা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু অস্বীকার করিতে পারিলেই যেন বাঁচিয়া যাইত। সেই উলঙ্গ শিশুগুলির কথা তাহার কেবলি মনে হইতেছিল। এই শীতে তাহাদের অমনি উলঙ্গ থাকিতে হয়, এতটুকু বস্ত্র দিয়া কেহ তাহাদের সযত্নে ঢাকিয়া দেয় না। সন্ধ্যার অন্ধকারে কুঁড়ের সম্মুখে যে আগুন জ্বালিয়া সকলে বসিয়া থাকে তাহারই একপাশে হয়ত ইহারা বসিয়া বসিয়াই ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে। ইহাদেরও মা আছে। অলকা নিজেও নারী, মায়ের মনের প্রতি কথাই তাহার নিজের ভিতরও লুকাইয়া আছে। দূরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে যে-সব কুটীর নজরে পড়ে, অলকা সেইদিকে চুপ করিয়া চাহিয়াছিল। উহারই কোন কোনটার ভিতর সেই শিশুরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, পয়সার কথা আর তাহাদের মনে নাই, গৃহে পৌঁছিয়াই মায়ের হাতে হয়ত তাহারা নিজের সম্পত্তি তুলিয়া দিয়াছে, যাহারা দেয় নাই, অজস্র মার খাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আর তাহাদের লুব্ধ মায়েরা সেই অবসরে তাহাদের মুঠি খুলিয়া পয়সা বাহির করিয়া লইয়াছে। অলকা আর ভাবিতে চাহে না, কিন্তু ভাবনাও তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিতেছিল না। গাড়ীর এক-পাশে মাথা রাখিয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

পরের দিন খুব ভোরে চা-পানের পর তাহারা তিনজনেই মোটরে উঠিয়া বসিল। আজ অভিযানের শেষ দিন। পুরাতন কয়লা-খনির পাশ দিয়া পোল পার হইয়া নির্জ্জন রাস্তাকে সচকিত করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল।

দুই পাশের জঙ্গলের দিকে চাহিয়া দিলীপ বলিল, একদিন এখানে বাঘ ছিল, আজকালও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, আর ছিল ডাকাতের দল। আজ কিন্তু প্রায় সব কিছুই শেষ হ'য়ে গেছে।

ড্রাইভার বলিল, এই ত কিছুদিন আগেও কয়েকটা ধরা পড়েছে বাবু। পুলিসকে কিন্তু বড় ব্যস্ত ক'রে তুলেছিল তারা।

অন্যমনস্কের মতই দিলীপ বলিয়া চলিল, একদিন এখানে মেরে পুঁতে রাখালেও টের পাওয়া যেত না, আজ আর সে-সব হবার যো নেই। তাদের অনেকেই জেলের মধ্যে প'চছে, কেউ হয়ত সেখানেই শেষ হ'য়ে গেছে। ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে তা কিন্তু আজও আমি ভেবে পাইনে দিদি।

সতীশ বিস্মিতভাবে বলিল, তার মানে ?

সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া দিলীপ তেমনিভাবেই বলিয়া যাইতে লাগিল, প্রতুলদা বলেন, সমস্ত মানুষকে সমান করে দিতে হবে, পরস্পরকে ঈর্ষা করার কোন কিছুই যেদিন না থাকবে, সেদিন সব ঠিক হয়ে যাবে, একথা আমি বিশ্বাস করি দিদি, নিজের মনেও আমি তা বুঝি—সে'দনটা কিন্তু দেখে যেতেই হবে।

পরেশনাথ নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। ওই উচ্চে তাহারা উঠিয়া যাইবে, এখান হইতে যাহা দেখা যায় না, তাহারই পাশ দিয়া ছুঁইয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে আগাইয়া যাইবে। আনন্দে অলকার বুকের ভিতরে যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এমনি করিয়া উচ্চে উঠিবার বাসনা যে প্রথম কাহার মনে জাগিয়াছিল, তাহা সে জানে না, কিন্তু তাঁহার মনের আকাঙ্ক্ষা যে কত বড় ছিল, তাহা সে এতটুকু না ভাবিয়াও বলিয়া দিতে পারে। মানুষের মনে চিরকালের জন্য সে আকাঙ্ক্ষার বীজ যিনি রাখিয়া গেছেন, তাঁহার কাছে মনে মনে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া সে পারিল না।

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, কত উঁচু হবে ওটা ?

দিলীপ হাসিয়া বলিল, সেটা এমন কিছু বেশী নয় যে মনে ক'রে

রাখতে হবে। উঠ্‌তে কষ্ট হবে না, সোজা রাস্তা বাঁধা আছে, তবে পা একটু ব্যথা করতে পারে।

অলকা বলিল, অনেক উঁচু ব'লে মনে হচ্ছে না?

সতীশ বলিল, বেশ উঁচু, পায়ের কথা থাক্, আমার ত মাথা ব্যথা আরম্ভ হ'য়ে গেছে এখন থেকেই। পরের কথা শুনে কোন কিছু করাই পাপ দেখছি।

উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া দিলীপ বলিল, আপনার এ-সব মতামত আমি বিশ্বাস করি না দাদা, ওপরে উঠে হয়তো আপনি নিজেই এমন চুপ ক'রে বসে চারিদিকে চেয়ে দেখবেন যে, আপনাকে তোলাই মুস্কিল হয়ে প'ড়বে। দিদিরও কি ওই মত নাকি? কতকগুলো অসুখ নিয়ে এলে হ'ত দেখ্‌ছি।

অলকা বলিল, না আমার ও মত নয়। আমি ভাবছি, ওই রাস্তাটার কথা। এই যে আমরা মোটরে চ'লেছি, যে রাস্তাটি দিযে, সে রাস্তা দিয়ে কত লোকই না গেছে; কিন্তু ওপরের ওই রাস্তা দিযে গেছে আরও অনেক কম লোক, আমিও সেই কমেরই একজন। আমার সত্যি আনন্দ হ'চ্ছে ভেবে যে, ওই ওপরে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে থাকতে পারব। ওপর থেকে একটা ছোট পাথর গড়িয়ে দিতে পারব নীচে, আর সেটা কি জোরেই না নেমে আসবে, আমারই ফেলা সেটা, সত্যি খুব ভাল লাগছে আমার। আচ্ছা, কতক্ষণ লাগবে উঠতে।

দিলীপ বলিল, প্রায় ছ'মাইল রাস্তা, ঘণ্টা দুই আড়াই হ'লেই চলে, তবে আজ আমাদের তিন ঘণ্টারও ওপর লাগবে। সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

অলকাও হাসিয়া বলিল, আমি কিন্তু খুব বেশী পিছিয়ে প'ড়ব না।

সে দেখা যাবে। দিলীপ হঠাৎ সতীশের দিকে ফিরিয়া বলিল, একটা

ডুলি নিলে ভাল হ'তে না দাদা? পথ ত আর সোজা নয়, ওপর দিকে উঠ্‌তে হবে।

অলকার দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল, নেওয়াই উচিত, তবে তুমিই ত নেতৃত্ব পেয়েছ, আমার কথা কি টিঁকবে? নেতার কথা তবু না হয় মান্‌তে পারে কেউ, কেউ, দেখ না ব্যবস্থা ক'রে!

অলকা জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, ওসবে চ'ড়ে যেতে আমি পারব না, তার চেয়ে গাড়ীতে ব'সে থাকতেও আমি রাজী আছি।

দিলীপ বলিল, তোমার একার জন্যেই নয় দিদি, উনিও ব'সতে পারবেন মাঝে মাঝে।

সতীশ ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল, আমার জন্যে ভাবতে হবে না দিলীপ, প্রতুলের সাক্‌রেদী অনেকদিন আমিও ক'রেছি। সে তোমাদের দাদা, কিন্তু আমার কাছে আজও প্রতুল হ'য়েই আছে। ভয় শুধু আমি করি আমার চোখ দুটোকে, আর কিছুকেই নয়।

দিলীপ লজ্জিত হইয়া বলিল, মাপ করবেন দাদা ওকথা আর আমি ব'লব না।

অলকা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

গাড়ী আসিয়া পাহাড়ের নীচে ধর্ম্মশালার সম্মুখে থামিল। দিলীপ নামিয়া পড়িয়া ড্রাইভারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমরা মন্দিরগুলো ঘুরে আসি, ততক্ষণে তুমি একটা গাইড ঠিক ক'রে ফেল। তারপর তোমাকে নিমিয়া ঘাটের দিকে গাড়ী রাখতে হবে, ফেরবার সময় গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটাও ঘুরে যাব।

তাহারা তিনজনে মন্দিরে প্রবেশ করিল। পরেশনাথ, মহাবীর প্রভৃতি জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি চারিদিকেই সাজান রহিয়াছে, চক্ষে সাধারণ পাথরের বদলে মুক্তা প্রভৃতি বসান। ধনী জৈনদের ধনী দেবতা।

বহু নারী দামী শাড়ী আর গহনা পরিয়া মুখে কাপড় বাঁধিয়া দেবতার কাজে লাগিয়া গিয়াছে। কলিকাতার সুসজ্জিত দোকানে এরূপ দামী শাড়ী সহজে চোখে পড়ে না। পরেশনাথ পাহাড়ের তলায় চারিদিকের নিস্তব্ধতার মাঝে মন্দিরের কার্য্যে ব্যস্ত এইসব রূপসীদের দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহাদের অটুট স্বাস্থ্য দেখিয়া বাঙ্গালী নারীদের জন্য দুঃখ হয়।

অলকা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, ওরা মুখে কাপড় বেঁধে কাজ ক'রছে কেন?

হাসিয়া দিলীপ বলিল, দেবতার শুচিতা বজায় রাখবার জন্যে। অদ্ভুত ওদের ধারণা, মনে করে এতেই বুঝি দেবতা খুসী হবে। ধনী ব্যবসাদারদের ঘরণী ওরা, ঠিক তাঁদের মত ক'রেই বিচার করে। মানুষকে লুণ্ঠন ক'রে যে পাপ হয়, মনে করে এমনি ক'রে দেবতাকে সাজিয়ে রাখলেই সে পাপ ক্ষয় হ'য়ে যাবে।

সতীশ কোন কথা না বলিয়া তাহাদের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল।

ধর্ম্মশালা ছাড়াইয়া মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের পাশেই একটা ঘরে কয়েক জন লোক বসিয়া বসিয়া লাল মোটা খাতায় কি সব হিসাব লিখিতেছিল।

বাহির হইয়া আসিয়া অলকা বলিল, ব্যবসায়ের লোভ এদের কিছুতেই যায় না, এখানে ব'সেও হিসেব না ক'সলে যেন শান্তি নেই।

দিলীপ বলিল, ওটা দেবতার ব্যবসা দিদি, পাহাড়ের ওপর যে-সব গাছ আছে, তা থেকেও এরা রস নিংড়ে নেয়। ধর্ম্মপ্রীতি ওদের খুব বেশী ব'লেই দেবতার কাজে নিঃশ্বাস ফেলবারও সময় ওদের থাকে না।

বাহিরে আসিয়া দিলীপ বলিল, ওদিকে চলুন, আর একটা মন্দির আছে। এদের মধ্যেও দুটো সম্প্রদায় আছে যে। এদের ঝগড়া কোর্ট পর্য্যন্ত গড়ায়।

সতীশ বিস্মিত হইয়া গেল। অহিংসার প্রতীক ইহারা, ইহাদের মধ্যেও বিবাদের বিরাম নাই ?

দিলীপ বলিল, সব সময়ে এরা অহিংস থাকে না, তবে হিংসা ক'রতে যেটুকু সাহসের দরকার হয়, তাও বোধ হয় এদের নেই, পরকালের ভয় এদেরই বেশী কি-না। মাটির পৃথিবীতে সব চেয়ে আরামপ্রদ যে মোটর যান তাতেই চ'ড়ে বেড়িয়ে এবং আরও বহুবিধ উপায়ে আরাম উপভোগ ক'রে স্বর্গের মাটি-হীন জমিতে কষ্ট করার ইচ্ছে এদের নেই। স্বর্গের হাওয়া-গাড়ী না-কি মেঘ, তারই এক আধ টুকরো পাবার জন্যে ভগবানকে ভেট দিতে এরা কসুর করে না। তাই ত' লাঠির বদলে এরা অহিংস থেকে আইনের কাছে বিচার চায়।

'যার যা নেশা।' সতীশ আপন মনে বলিয়া উঠিল।

হাসিয়া দিলীপ বলিল, নেশা হয়ত, সত্যি' কিন্তু নিজেদের ঠকিয়ে এবং পরকে ঠকিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমক ক'রে ওরা নেশার গুণগান ক'রে বেড়ায় ব'লেই না আমরা মাঝে এসে পড়ি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাতলামি করলে পুলিশের হাতে পড়তেই হয়।

দুই সম্প্রদায়েরই মূর্ত্তি এক, তবে ওদের দেবতার গায়ে কোন অভরণ নাই, আবরণও নাই—ওরা দিগম্বরী সম্প্রাদায়। চক্ষে একই রকম মুক্তা বসান, একই রকম সব কিছু হইলেও মামলা বাধিতে বিলম্ব হয় না।

প্রধান মন্দিরের মেঝেতে টাকা, আধুলী গাঁথিয়া রাখা হইয়াছে। দেবতার মন্দিরে আসিলে টাকা পায়ের তলার বস্তু হইয়াই পড়ে ইহাই হয়তো তাহারা জানাইতে চায়, অথবা সম্প্রদায়ের বিশেষত্বের জন্য দেবতার গায়ে আভরণ দিতে না পারিলেও দিবার ক্ষমতা যে তাহাদের আছে, ইহাই বুঝাইয়া দিয়া মনের মধ্যে আনন্দ অনুভব করিতে চায় হয়ত'। কি যে

তাহারা বুঝাইতে চায় তাহা না জানিতে পারিলেও ইহা স্পষ্টই বোঝ যায় যে অর্থের জন্ম তাহাদের কোন কিছু আটকাইয়া থাকে না। সমস্ত কিছু দেখিয়া শুনিয়া দিলীপের হাসি পাইতেছিল, ইহা সে পূর্ব্ব হইতেই জানিত, কিন্তু চক্ষের সম্মুখে দেখিবা হাসি চাপিয়া রাখাও যায় না।

নিজের মনকে অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য সে বলিল, এরকম একটা থাকবার জায়গা যদি পেতাম কি আরামই না হত। চকচকে মেঝের ওপর টাকা বসান, তারই ওপর শুয়ে থাকা, আঃ।

তাহার কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ লুকায়িত ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া অলকা বলিল, কোন কিছুই কি তুমি ভাল চোখে দেখিতে পার না? সমালোচনা করাটা বুঝি স্বভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে?

হাসিয়া দিলীপ বলিল, তুমিই কি ভাল চোখে দেখতে পারছ দিদি?

অলকা মুখ ফিরাইয় হাসিয়া বলিল, জানি না।

'জানি না নয়, বলব' না।' দিলীপ সঙ্গে সঙ্গেই যোগ করিয়া দিল।

তাহার কণ্ঠে একটা প্রচ্ছন্ন দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া অলকা আর কোন কথাই কহিল না। স্তব্ধভাবে সে পরেশনাথজীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পাথরের সে মূর্ত্তি হাসিতেছে কি কাঁদিতেছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু স্থির হইয়া ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়াই তাহার মনে হইল মূর্ত্তি কাঁদিতেছে। তাহার মাথার ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল। বিশ্বমানবের কল্যাণে তাঁহারা আসিয়াছিলেন; কিন্তু আজ সকলের কল্যাণ হরণ করিয়া নিজেদের এ-কল্যাণ দেখিয়া না কাঁদিয়া তাঁহাদের উপায় কি? সকলের মনের মধ্যে আসন পাতিবার আর তাঁহাদের কোন উপায় নাই, মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ শুচিতা আঁকড়াইয়া ধরিয়াই তাঁহাদের টিঁকিয়া থাকিতে হইবে।

বাহিরে আসিয়া অলকার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে হাসিয়া দিলীপ বলিল, মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে দুটো সিপাহীর মূর্ত্তি দেখেছেন ত' দিদি ? হাতে তাদের আবার বন্দুকও আছে, অহিংসার প্রতীক, কি বলুন ? শুনেছি পাহাড়ের ওপর বন্দুক নিয়ে যাবার হুকুম নেই। এখানে কিন্তু সে বালাই নেই, মন্দিরের দরজা কিনা।

অলকা কোন কথাই না বলিয়া অত্যন্ত ম্লানভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া দিলীপ বলিল, দুঃখ দিলুম কি ?

অলকা মাথা নাড়িয়া বলিল, দুঃখ সত্যি কিন্তু তাতে তোমার কোন হাত নেই। এসব যেন আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রেই ছিল। এ আশা করিনি, নিজের চোখে না দেখলে কারও কাছে শুনেও বিশ্বাস করতুম না, হয়ত' তোমার প্রতুলদার কথাও নয়। আজ কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার হ'য়ে গেল, আসলে যে যাই হক না কেন, ভক্তরাই তাকে নামিয়ে আনে, বিকৃত ক'রে ফেলে। আজকের দুঃখ কোনদিনই ভুলব' না।

দিলীপ বলিল, দুঃখের ভেতর দিয়েই আসল জিনিষটা চোখে পড়ে দিদি। কোন আনন্দই আজ পর্য্যন্ত দুঃখের সংস্পর্শে না এসে খাঁটি হ'তে পারেনি।

ড্রাইভার যে লোকটিকে গাইড ঠিক করিয়াছিল সে নিকটে আসিয়া অলকাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। সে যে এ-কাজে পাশ হইয়া গেছে তাহা তাহার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়াই বোঝা যায়। নারী জাতীকে খুসী করিতে পারিলেই যে ভাল বখশিস্ মেলে সে অভিজ্ঞতা সে পূর্ব্বেই সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছে। লোকটার তামাটে রং, শক্তিশালী মাংসপেশী, চতুরতা মাখা চক্ষু, দেখিয়া তাহাকে কাজের লোক বলিয়াই মনে হয়।

আঁটিয়া কাপড় পরা, গায়ে আর একখানা কাপড় জড়ান, হাতে মাথা পর্য্যন্ত উঁচু বাঁশের লাঠী আর সর্ব্বোপরি তাহার সরলতা মাথা মুখ দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাহাকে বিশ্বাস করিলে ঠকিবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করিল, কত নিবিরে? যা লাঠী হাতে নিয়ে'ছিস্ ওপরে ওঠে মাথায় বসিয়ে দিবিনে ত'!

লোকটা হাসিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল, কি বলেন বাবু, এ লাঠী ত' আপনাদের মাথা বাঁচাবার জন্যে। যা খুসী দিবেন, আমি বাবু আপনাদের চাকর আছি।

মোটর ড্রাইভার ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, আট আনা দিলেই খুসী হ'য়ে যাবে।

অলকা বিস্মিত হইয়া গেল। সমস্ত বোঝা কাঁধে লইয়া এই ছয় মাইল রাস্তা পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে এবং ফিরাইয়া লইয়া আসিবে কেবলমাত্র আট আনা পয়সার বিনিময়ে! একটা পয়সাকে যেন ইহারা টাকার মত করিয়া দেখে। ইহাদেরই ঠিক পাশে মন্দিরের ওই ধন ঐশ্বর্য্য একটা বিরাট বিদ্রূপ বলিযাই তাহার মনে হইতে লাগিল। মন্দিরের দিকে ফিরিয়া চাহিতেও আর তাহার ইচ্ছা হইল না।

ঠিক সেইখানেই দিলীপ আঘাত করিল, বলিল, এই লোকগুলো বুকের রক্ত দিয়ে যে পয়সা উপায করে, সেই পযসাই কেমন সহজে ওই মন্দিরের লোকগুলো উড়িয়ে দেয়! ওদের শুচিতাকে ধন্যবাদ দিতে হয়, এদের ওরা ঘৃণা করে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ছাড়া কারও মন্দিরের বা পাহাড়ে উঠবার নিয়ম নেই—এরাই আবার পিঁপড়ের গর্ত্তে চিনি দিয়ে আসে দিদি, রাতে বিশেষ কিছু খায় না, পাছে না দেখতে পেয়ে জীব হত্যা করে বসে। এদের কি করা উচিত বলতে পার?

অলকা কোন কথাই বলিল না, সতীশ মনে মনে পাহাড়ের উচ্চতার হিসাব করিতেই বোধ হয় ব্যস্ত ছিল।

দিলীপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, আপন মনেই সে বলিয়া চলিল, লোহার ঘর করে ঠিক চিড়িয়াখানার জীবজন্তুর মতই এদের সাজিয়ে রাখতে হয় আর যে-সব পিঁপড়ের গর্তে এরা চিনি দিয়ে আসে সেগুলোকেই এদের গায়ে ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু থাক, যাবে যে দিদি?

টিফিন-ক্যারিয়ার প্রভৃতি কাঁধে ঝুলাইয়া গাইড ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল, দিলীপ ড্রাইভারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তুমি তা'হলে ওদিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক।

ড্রাইভার ঘাড় নাড়িয়া গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল। তাহারাও পাহাড়ের পথে পা বাড়াইয়া দিল। অলকার বুক কাঁপিয়া উঠিল, ওই অতদূরের পথ সে কি হাঁটিয়া যাইতে পারিবে? কিন্তু ডুলির কথা মনে হইতেই সে নিজেকে দৃঢ় করিয়া ফেলিল, লোকের কাঁধে দড়িবাঁধা দোলনায় ঝুলিয়া যাওয়ার কথা মনে হইলেই তাহার যেন হাসি পায়। বৃদ্ধদের যাহা সাজে তাহা নারী হইলেও তাহার সাজে না।—

অনেক দূর চলিয়া আসিয়া গাইড বলিল, এটা একটা ছোট পাহাড় বাবু, এটা পার হ'য়ে তবে আমাদের পরেশনাথে উঠতে হবে।

তাহার কথা শুনিয়া অলকা হতাশ হইয়া পড়িল। এই ছোট পাহাড়টা মিছামিছিই পথ আট্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া আছে? এতখানি উঠিয়া আসিয়া আবার নামিয়া যাইতে হইবে। তবেই মিলিবে পরেশনাথ?

একটি বুড়ি ছোট পাহাড়টার উপর কতকগুলি বাঁশের লাঠি লইয়া বসিয়াছিল। যাত্রীদের সুবিধার জন্ত এক পয়সা দিয়া লাঠি ভাড়া লইতে হয়। ভাড়া—অর্থাৎ ফিরিবার পথে লাঠি আবার ফেরং দিয়া যাইতে হয়। ওই পাহাড়েরই উপর একটা গাছের পাশে তাহার কুটির, দরজার

সম্মুখে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করিতেছিল, হয়ত তাহাদের দেখিযাই একটা অভিযানের আস্বাদন পাইয়া তাহারা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। এ পথ দিয়া তাহারা ফিরিবে না, তাই লাঠি ভাড়া লওয়া হইল না। তাহারা আবার আগাইয়া চলিল, ওইখানে বসিয়াই বুড়ি ছেলেমেয়েগুলিকে যে ইঙ্গিত করিল, তাহা দিলীপের দৃষ্টি এড়াইল না—সে মনে মনে হাসিল।—

একটা বাঁক পার হইতেই সেই ক্ষুদ্র দলটি পয়সার জন্য তাহাদের ঘিরিয়া ধরিল। মা'জীর দয়ায় পয়সা পাইতেও বিলম্ব হইল না।

দিলীপ হাসিয়া বলিল, সকলেই যদি তোমার মত হ'ত দিদি। অলকাও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তা'হলে তোমার খুব সুবিধা হ'ত না?

দিলীপ অন্যমনস্কের মত বলিল, আমার ত' এই একটাতেই যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে আমার কথা ভাবি না কিন্তু আরও অনেক ভাইই যে পথে-ঘাটে পড়ে আছে।

ঝর্ণার ধারে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া হাত মুখ ধুইয়া তাহারা আবার আগাইয়া চলিল। সম্মুখে এবং পিছনে পথ পড়িয়া রহিয়াছে, আগাইয়া যাইতে হইবে আবার ফিরিয়াও আসিতে হইবে। পুরাতন পথকে অগ্রাহ্য করিলে চলবে না, নূতন পথের সন্ধান ওই বলিয়া দিয়াছে—পৃথিবীর মাটিতে ওই আবার ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে পা ব্যথা হইয়া যায়, বিশ্রাম করিতে হয় সেই পথেরই জন্য, নীচের দিকে চাহিয়া বুকের জোর বাড়িয়া যায়। অস্পষ্টভাবে নীচের গাছগুলি নজরে পড়ে, অলকা বুঝিতে পারে যে, তাহারা মেঘের উপরে উঠিয়াছে। আকাশের মেঘ পায়ের তলায় স্থির হইয়া আছে মনে হইতেই তাহার মন আনন্দে ভরিয়া গেল, বিশ্ব জয় করিয়া দিগ্বিজয়ী বীরেরা হয়ত এমনি আনন্দই অনুভব করে।

তাদের মত আরও অনেকে আসিয়াছে। আর কোন বাঙালী তাহাদের চোখে পড়িল না, আমেদাবাদ, সুরাট হইতে ইহারা তীর্থ করিতে আসিয়াছে। যে তীর্থঙ্করেরা একদিন পৃথিবীরই বুকে বসিয়া শান্তির বাণী প্রচার করিয়া জনগণের কল্যাণ সাধিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদেরই কথা স্মরণ করিয়া ইহারা বহুদূর হইতে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসিয়াছে। কত বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ডুলিতে চাপিয়া, কত যুবক, যুবতী হাঁটিয়া, ডুলিতে চাপিয়া নামিতেছে, কেহ-বা উঠিতেছে। মেয়েদের স্বাস্থ্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়, রূপ দেখিয়া পরিচয়ের ইচ্ছা জাগে—অলকা বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

ডাক-বাংলো পার হইয়া মন্দিরে আসিয়া পৌছাইতে আর বেশী দেরী হইল না। সর্ব্বাপেক্ষা বড় মন্দির এইটা, অনেকগুলি সিঁড়ি পার হইয়া উঠিতে হয়।

সতীশ বলিল, কতদিন ধরে না জানি এসব তৈরী হয়েছে, নীচে থেকে সব কিছু বয়ে আনতে হয়েছে ওপরে, উঃ ভাবতেও পারা যায় না।

অলকা বিস্মিত দৃষ্টিতে মন্দিরের দিকে চাহিয়া রহিল, চোখে তাহার সম্ভ্রমের দৃষ্টি। মন্দিরের ঐশ্বর্য্য দেখিযা নহে, ঐশ্বর্য্য এমন কিছু নাইও, মহাপুরুষদের প্রতি এই যে ইহাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন তাহাই অলকার দৃষ্টিতে সম্ভ্রম আনিয়া দিযাছিল। ইহাদের ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব সে দেখিয়াছে, সমালোচনা করিতেও তাহার বাধে নাই, কিন্তু তাহারই পাশে যে শ্রদ্ধাটুকু এখন তাহার চোখে পড়িল তাহাকে সে অগ্রাহ্য করিতে পারিল না।

এ মন্দিরের মধ্যে কোন মূর্ত্তি নাই—পরেশনাথজীর পায়ের ছাপ রহিয়াছে। কোথাকার মহারাজা সেই পায়ের ছাপ ঢাকিয়া রাখিবার জন্ত মহামূল্য একটি ঢাকনী দিয়াছেন।

দিলীপ হাসিয়া বলিল, এদের সব কিছুই মূল্য দিয়ে আড়াল করা দিদি। মূল্য দিয়েই এদের ভক্তির যাচাই হয়। মহাপুরুষের পায়ের ছাপ নিয়েই এরা ব্যস্ত, কিন্তু তার কাজের কথা এদের মনে থাকে না; আশ্চর্য্য।

অলকা কোন কথাই বলিল না, তাহার মনের সম্ভ্রম কিন্তু ভাঙিয়া গেল না। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর দিলীপ বলিল, এবার নেমে যাবেন, না, দূরের ওই মন্দিরগুলোও দেখতে যাবেন?

বড় মন্দিরটির সম্মুখে আর একটা মন্দির প্রস্তুত হইতেছিল, দূরে আরও অনেকগুলি মন্দির ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া সতীশ বলিল, না এর মধ্যেই নেমে যাওয়া হবে না, এগুলো দেখতেই হবে।

দিলীপ বলিল, ওসবের মধ্যে কিন্তু কিছুই নেই, তবে জলমন্দিরে জল আর নীচের মন্দিরের মত কয়েকটা মূর্ত্তি আছে।

সতীশ বলিল, নাই-বা থাকল কিছু, ওখানে পৌছানটাই আসল, ঠিক ওর পাশে দাঁড়িয়ে ছুঁয়ে অনুভব করা আর এখানে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকা কি এক? তারপর একটু ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল, তোমরা এখান থেকে যেমনভাবে দেখতে পাচ্ছ আমি ত তেমনভাবে দেখতে পাচ্ছিনে ভাই, আমি দেখছি সাদা সাদা কতকগুলো কি বসান আছে ওখানে। আমার কি ভাল করে দেখতে ইচ্ছে করে না।

অলকা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল্, ওদিকে, আর দেরী করলে ফিরতেও দেরী হয়ে যাবে, অন্ধকার হলে বাঘের ভয়ের চেয়েও হোঁচট খাবার ভয় হবে বেশী।

জল-মন্দির প্রভৃতি দেখিয়া ফিরিতে বেলা দুইটা বাজিয়া গেল। আর দেরী করা যায় না, নামিতে নামিতে অন্ধকার হইয়া যাইবে। দুই পাশের

গাছের ছায়ায় সে অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিবে, ভীতি উৎপাদক জানোয়ারের কথা ছাড়িয়া দিলেও সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে যে সতীশের খুবই অসুবিধা হইবে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না।

গাইড বলিল, আপনারা ত ও পথ দিয়ে যাবেন বাবু, একটু তাড়াতাড়ি করুন, ও পথ দিয়ে বড় কেউ যায় না।

সতীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি থাকবে ত বাপু আমাদের সঙ্গে। সসম্ভ্রমে সেলাম জানাইয়া লোকটা বলিল, আমি থাকলে আর ভাবনা ছিল কি বাবু, কিন্তু আমার ত বাড়ী ওদিকে নয়। ও রাস্তায় গেলে আজ আর আমি বাড়ী ফিরিতে পারব না। পাহাড়টা ত কম নয় বাবু।

সকলে মিলিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিযা আবার নামিতে লাগিল। সতীশের মনে একটা ভয় খুবই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, গাইড থাকিবে না পথ ভুল করিয়া যদি সমস্ত রাতই ঘুরিয়া মরিতে হয়? এই পাহাড়ে বন্য জন্তুর ভয় যে যথেষ্ট তাহা তাহার জানা আছে বিশেষ করিযা এইমাত্র শুনিল যে, ওই রাস্তাটা নির্জ্জন, ভয় না করিয়া উপায় কি? দিলীপকেই যা একটু ভরসা, কিন্তু ও যে ধরণের তাহাতে এ অবস্থায তাহাকেই ভয় বেশী। আর অলকা? তাহার কথা মনে না আনাই ভাল। ভবিষ্যতের সম্ভব ও অসম্ভব সমস্ত রকম বিভীষিকাই তাহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিযা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু একথা প্রকাশ করিয়া অলকার মনে ভয়ের ছায়াপাত করিবার ইচ্ছা হইল না। সে স্তব্ধ হইয়া সকলের পশ্চাতে সতর্কভাবে চলিতে লাগিল. এতটুকু শব্দও তাহাকে এড়াইয়া যাইতে পারিল না।

চলিতে চলিতে একটা মোড়ের মাথায় আসিয়া থামিয়া পড়িয়া গাইড বলিল, এই বাঁ দিক দিয়ে আপনাদের যেতে হবে বাবু, আমি এখান থেকেই

বিদায় হব। কথা শেষ করিয়াই সে একটু নত হইয়া অভিবাদন করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

অলকা তাহার ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিল, এতটুকু ইতস্ততঃ না করিয়া সে তাহার হাতে দুইটা টাকা তুলিয়া দিল। লোকটা মুহূর্তের জন্য অতি বিস্ময়ে চক্ষু তুলিয়া চাহিল, কিন্তু অলকার চক্ষুর দিকে দৃষ্টি পড়া মাত্র অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা আসিয়া সেই বিস্ময়ের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। তাহার দৃষ্টিতে যে করুণা যে মমতা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, তাহা এই অশিক্ষিত লোকটার চক্ষুতে মুহূর্তের মধ্যে ধরা পড়িয়া গেল। তাহার চক্ষু বোধ করি তখন আর শুষ্ক ছিল না, নতমুখে সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন ভাষাও সে খুঁজিয়া পাইল না।

দিলীপ বলিল, আর দেরী নয়, দিদি সামনে যান, দাদা মাঝে আর আমি পেছনে। নামতে নামতেই অন্ধকার হয়ে যাবে একটু সাবধানে চলবেন।

সতীশ বলিল, রাস্তা হারিয়ে ফেলবে না ত!

হাসিয়া দিলীপ বলিল, একটাই রাস্তা কোন ভয় নাই, রাস্তাটা ঘুরে ঘুরে একেবারে নীচের দিকে নেমে গেছে, উঠবার আর হাঙ্গামা নেই, কিন্তু পিছনে যাবেন না যেন।

চলিতে চলিতে একটা বাঁকের মুখ ঘুরিয়া তাহারা সকলেই পিছন ফিরিয়া চাহিল, সেই লোকটা তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া ছিল, তাহাদের পিছনে চাহিতে দেখিয়া সে এইবার নত হইয়া অভিবাদন করিল—অলকা হাত তুলিয়া বোধ করি বা তাহাকে আশীর্ব্বাদই জানাইল।

পরমুহূর্ত্তেই আর তাহাকে দেখা গেল না। আবার পথ বাহিয়া নামিতে হইবে—গাড়ী তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে অনেক,

অনেক নীচে। ওই লোকটাও ফিরিয়া যাইবে সেই পুরাতন পথেই, হয়ত একাই যাইবে, কিন্তু মন তাহার তাহাকে ছাড়িয়া হয়ত ইহাদের সঙ্গেই ঘুরিয়া বেড়াইবে। পথ চলিতে চলিতে হয়ত কোন বন্ধুর দেখা মিলিতেও পারে কিন্তু তাহা তাহার পক্ষে হয়ত আজ আনন্দদায়ক হইবে না। বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া ফেলাও অস্বাভাবিক হইবে না। প্রত্যেক কাজের ফাঁকে ফাঁকে অলকার কথা মনে পড়িয়া শ্রদ্ধায় আনন্দে তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিবে। মানুষের মনের পটে এমনি যে সব ঘটনা সহসা ঘটিয়া যায় সে সব অগ্রাহ্য করিবার ত কোন উপায়ই নাই। আকাশের বুকে ধূমকেতু উঠিয়া মানুষের মনে কয়েকদিনের জন্যও ত একটা আলোড়ন তুলিয়া দেয়। সে কখন আসিবে কেমন করিয়া আসিবে তাহা কেহই জানে না, কিন্তু আসিয়া পড়িলে আর ত আসে নাই বলিয়া চক্ষু বুঁজিয়া থাকিলেই চলে না। এই যে ইহাদের স্নেহ, মমতা তাহার মনকে আজ আলোড়িত করিয়া দিয়া গেল সে কতদিন থাকিয়া তাহাকে ভাবাইয়া মারিবে তা কে বলিতে পারে? মানুষের জীবনের বহু ঘটনার মধ্যে ইহারা তুচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের দুই হাতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিবার সাধ্য ত কাহারও নাই।

ক্রমে তাহারা নামিয়া আসিল। বহুদূরের পথ অতিক্রম করিয়া মাটির পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া তাহারা শেষবারের মত পিছন ফিরিয়া চাহিল।

অলকা আস্তে আস্তে মাথা নাড়িয়া বলিল, আজ সত্যি নিজের ওপর একটু শ্রদ্ধা হচ্ছে। সতীশ আপন মনেই বলিয়া উঠিল, উঃ কতদূর।

* * * *

পরের দিন দেওঘরে ফিরিতে বৈকাল পার হইয়া গেল। গৃহে পৌঁছিয়াই বাহিরে চাকরটাকে দেখিতে পাইয়া অলকা জিজ্ঞাসা করিল, বুড়োবাবু কেমন আছে রে ?

চাকরটা মুখ বিকৃতি করিয়া বলিল, বাবুর বড় অসুখ মা।

অলকার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল, ঠিক এইরূপ একটা ভয়ই যেন তাহার ছিল। ব্যস্ত হইয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল।

খাটের উপর অরবিন্দ স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, হয়ত বা ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহার সেই শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে তিনি খুবই অসুস্থ।

অলকা ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তকের নিকটে গিয়া কপাল স্পর্শ করিল, হাত যেন তাহার পুড়িয়া গেল, সে চমকাইয়া উঠিল হাতটাও তাহার কাঁপিয়া গেল।

অরবিন্দ দৃষ্টিহীন চক্ষু মেলিলেন, হাসিয়া কি বলিতে গেলেন কিন্তু সে তাঁহার মুখে হাত চাপা দিয়া নিষেধ করিয়া তাঁহার পাশে শয্যার উপরে বসিয়া পড়িল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সতীশ ডাক্তার লইয়া আসিল।

কয়েকদিনের চেষ্টায়ও যখন বিশেষ কোন ফল হইল না তখন কলিকাতায় যাওয়াই স্থির হইল।

ট্রেনে উঠিয়া দিলীপ বলিল, কালকেই আমার যাবার কথা ছিল দিদি, প্রতুলদা বোধ হয় ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন না ?

অরবিন্দের মস্তকের নিকট স্থির হইয়া বসিয়া অলকা একটু মৃদু হাসিল, কিন্তু কোন কথাই বলিল না।

আস্তে আস্তে অরবিন্দ বলিলেন, তোমাকে বড়ড কষ্ট দিলুম মা। এ লজ্জা যে আমার কি করে যাবে !

একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া অলকা বলিল, শেষ হয়েছে ত আপনার কথা কাকাবাবু, না আরও কিছু বলবার আছে ?

অরবিন্দ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, একথার ত শেষ নেই মা—তোমার যত্নেরও যে শেষ নেই। আজ আমার কেবলি মনে হচ্ছে তোমাদের কষ্ট দেবার আগে কেন আমার মৃত্যু হল না।

অলকা তাহাকে কোন বাধা দিল না, সে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ বয়সে এ রোগ যে তাহাকে সহজে মুক্তি দিবে না, এ বিষয়ে তাহার যেন কোন সন্দেহই ছিল না। মনের ভিতরে যে কথা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে সে তাই বাধা দিয়া আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী ছিল না।

অরবিন্দ বলিয়া চলিলেন, সারা জীবনটাই মানুষকে জ্বালিয়ে গেলুম, অন্ধ যারা তারা পৃথিবীর একটা জঞ্জাল। অনেক দিন আগে থেকেই আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের কাঁধে চেপে বসেছি আজও তাদের ছাড়িয়ে যেতে পারলুম না। তোমাদের মধ্যেই পেলুম যত কিছু স্নেহ-মমতার সন্ধান, তাই বোধ করি তোমাদেরই সব চেয়ে কষ্ট দিয়ে গেলুম। তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিয়া চলিলেন, কিন্তু আর বেশীদিন কষ্ট দেব না মা, ঈশ্বর বোধ হয় মুখ তুলে চেয়েছেন, তোমাদের দুঃখের বোঝা এবার কমবে।

অলকা আর থাকিতে পারিল না, কয়েক ফোঁটা জল তাহার চক্ষু ছাপাইয়া গণ্ড বাহিয়া অরবিন্দের কপালের উপর টপ্ টপ্ করিয়া গড়াইয়া পড়িল—চক্ষে আঁচল চাপা দিয়া সে নিজেকে সংযত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

অরবিন্দ বুঝিলেন, হাত তুলিয়া অলকার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, কাঁদবে সে আমি জানি, কিন্তু আমিও বারণ করব না। তোমাকে দুঃখ

দিয়েছি ব'লে ব্যথা পাই সত্যি, কিন্তু তবু মনে হয় তোমরা যদি না আমাকে আশ্রয় দিতে ? আমার কি যে হ'ত তা আমি ভাবতেও পারি না মা। আমার মৃত্যুর পরেও আমার জন্যে ভাববার লোক থাকবে, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা।

অলকা নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, আর ওসব বলবেন না কাকাবাবু একটু চুপ করুন, দয়া করুন।

আরবিন্দ হাসিলেন, তাহায় হাতটা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিলেন যারা আমাকে এতটুকু দয়াও কোনদিন করে নি, তাদের আমি সহজেই ক্ষমা করতে পারি কিন্তু তোমাদের তা' পারি না মা। দয়া করার যে অশেষ দুঃখ।

ইহার উত্তরে অলকা কিছুই বলিতে পারিল না। সতীশ নিকটে আসিয়া বলিল, বেশ ত আমাদের সকলকে কষ্ট দিতে একটু তাড়াতাড়িই সেরে উঠুন না।

অরবিন্দের মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল, অলকার হাত দুইটি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

*　　　*

*

কলিকাতায় পৌঁছাইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গৃহে আসিয়াই সতীশ বড় ডাক্তার লইয়া আসিল। ডাক্তার দেখিলেন, মাথা নাড়িলেন, কিন্তু বিশেষ কিছুই বলিলেন না। বৃদ্ধ বয়সটাই একটা বড় রকম রোগ, তাহার উপর অন্য উপসর্গ আসিলে কোনদিন ভরসা করা যায় না— ডাক্তাররাও ভরসা দিতে পারেন না, হয়ত' বা লজ্জায়।

সেদিন অলকা অরবিন্দের শয্যায় বসিয়া তাঁহার মস্তক হাত বুলাইয়া দিতেছিল। অরবিন্দ আজ কতকটা সুস্থ বোধ করিতেছিলেন।

অলকা ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, আজ বেশ ভাল মনে হচ্ছে, না কাকাবাবু ?

অরবিন্দ ম্লানভাবে হাসিয়া বলিলেন নিভবার আগে বাতি ত একটু দপ ক'রে ওঠেই মা। বয়েসের হাতে প'ড়ে মন যাদের ভেঙ্গে গেছে, তাদের বেঁচে থাকাই যে অভিশাপ।

অলকা বলিল, আপনি অন্য সব কথা ভুলে গেছেন দেখছি। যে-সব ভাবতে নেই, যে-সব কথাই ভাবতে নেই সে সব কথাই সব সময়ে মনের মধ্যে জমিয়ে রাখা দুষ্টুমীর লক্ষণ, তা ভুলে গেছেন বুঝি ?

অরবিন্দ যেন তাহার কথা শোনেন নাই, এমনিভাবে বলিলেন, মানুষের দুঃখে সহানুভূতি জানান আর দুঃখ পাওয়া অনেক তফাৎ। নিজের সাক্ষী আমি নিজেই মা। পৃথিবীটা কেমন তা আমি দেখেছি, চোখ আমার চিরদিনই অন্ধ ছিল না। একটা আঘাত লেগে ক্ষীণদৃষ্টি কেমন করে চিরদিনের মত নিঃশেষে মিলিয়ে যায় তা আমি খুব ভাল ক'রেই জেনে নিয়েছি। তারপর গলার স্বর নামাইয়া কেবলমাত্র অলকাকে শুনাইবার জন্যই যেন ফিস্ ফিস্ করিয়া তিনি বলিলেন, সতীশের জন্যও তাই আমার ভয় হয় মা, জানি ওকে তুমি কোনদিনও অবহেলা করতে পারবে না, জানি স্নেহ-মমতায় তুমি ওকে ভরিয়ে দেবে আজীবন তবু না ব'লে ত পারি না। কোন কিছু থেকেই ও যেন হঠাৎ মনে আঘাত না পায়। সে আঘাত শুধু ওর মনেই থেকে যাবে না, ওর চোখ দুটোকেও শেষ ক'রে দেবে। সে দুঃখ আমি বুঝি, আজও আমি তোমাদের মুখ দেখতে পাই নি। অরবিন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন, কিন্তু ওদিকে তাঁহারই মমতাপূর্ণ কথার আঘাতে অলকার হৃদয়ে যে কি এক আবেগ ফুলিয়া

ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। কতকগুলি পুরাতন ঘটনা তাহার চক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। তাহার স্বামী, সতীশ, প্রতুল—সকলেই ছায়াবাজীর মত ভাসিয়া উঠিল, মিলাইয়া গেল। কিন্তু তথাপি সতীশের বিষাদ-মলিন চিন্তিত মুখ বার বার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিল। ওই অলসপ্রকৃতির সরল অক্ষম লোকটিকে না বলিয়া দিলে কিছুই করিতে জানে না, উহার জন্য ব্যস্ত না হইলেও উহার চলে না। মমতা দিয়া তাকে ভাবিতে হয়। এত বড় উদার মনকে আশ্রয় দিতে মন আকুল হইয়া উঠে।

'নিভিবার পূর্ব্বে বাতী দপ করিয়া উঠে'—কথাটা অতি সত্যরূপেই অরবিন্দের জীবনেও ফলিয়া গেল। দুই দিন পরেই তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল, মাঝে প্রলাপ বকিতেও লাগিলেন। এই শেষ সময়ে সতীশ, অলকা সকলকেই ছাপাইয়া মণি তাঁহার কাছে বড় হইয়া দেখা দিল। তিনি বার বার তাহাকেই ডাকিতে লাগিলেন। উপরে বসিয়া সে বোধ করি বা তাহারই অন্ধ পিতার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পরলোকে তাঁহার হাত ধরিয়া সে ছাড়া আর কেই বা লইয়া যাইবে! সন্ধ্যার কিছু পরে তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলিলেন, অলকা এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া ছিল, কিন্তু আর পারিল না, অরবিন্দের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই বয়সে দিলীপ বোধ হয় এমনি হাহাকার অনেক শুনিয়াছে, সে উঠিয়া গিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল। সতীশের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে সে-ঘর ছাড়িয়া নিজের ঘরে গিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল।

পৃথিবীর নিয়মের অতি অবধারিত রূঢ় সত্য। এমন কোন মানুষই নাই যে, ইহাকে অবহেলা করিতে পারে অথচ ইহাকে ঘিরিয়াই না কত দুঃখের সৃষ্টি। অতি সত্য বলিয়াই বোধ হয় ইহা অতি কঠোর।

অরবিন্দের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই সতীশ যেন সমস্ত কিছু ভুলিয়া গেল। অনেকদিন সে তাহার সাহিত্যকে অপমান করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। আজ যেন অকস্মাৎ সমস্ত কিছু মনে পড়িয়া যাওয়ায় সে নিজের কাছেই অত্যন্ত ছোট হইয়া গেল। যাহা সে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে তাহা যে কেমন করিয়া একটি নারী গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল তাহা সে ভাবিয়াও পাইল না। খাতা কলম লইয়া সে স্থির হইয়া বসিল। আর কোন কিছুই সে ভাবিবে না, ঠিক পূর্ব্বের মতই সে নিজের কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিবে। কিন্তু তথাপি সে সম্পূর্ণরূপে সব কিছু ভুলিতে পারিতেছিল না, অলকার মুখ মাঝে মাঝে তাহাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। উহার জন্য চিন্তার যেন অবধি নাই, উহাকে লইয়া কি সে করিবে তাহাও ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। যখন মন কতকটা স্থির হইত তখনই হয়ত' অলকা আসিয়া পড়িত, লেখা বন্ধ করিয়া তাহাকে স্নান করিতে যাইবার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিতে এতটুকু ইতস্ততও করিত না।

সেদিন দরজা বন্ধ করিয়া সতীশ লিখিতে বসিয়াছিল, অলকাকে বিরক্ত করিতে দিবে না বলিয়াই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইল না, রোজকার মতই ঠিক সময়ে আসিয়া দরজা বন্ধ দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া অলকা দরজায় করাঘাত করিল। সতীশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু অলকাও ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে দরজায় অনবরত ঘা দিয়াই চলিল।

সতীশ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, আমাকে বিরক্ত ক'র না অলকা, দরজা বন্ধ দেখেই কি বুঝতে পা'রনা। বিরক্ত করা একটা স্বভাব হ'য়ে গেছে, আশ্চর্য্য।

অলকার মুখে কে যেন সজোরে আঘাত করিল, হাসি মুখে সে আসিয়াছিল কিন্তু এখন লজ্জার আর অবধি রহিল না। তথাপি সে

একবার কি বলিতে গেল কিন্তু গলা দিয়া তাহার কোন শব্দই বাহির হইল না, ঠোঁট ছুইটা একবার মাত্র কাঁপিয়া উঠিল।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া আঘাত করিবার ইচ্ছা সতীশের আরও বাড়িয়া গেল। তেমনি রূঢ়ভাবেই সে বলিল, আমার জন্য ভাববার কোন কারণই তোমার নেই। আর আমি সময় নষ্ট ক'রতে চাইনা, তোমার জন্য আমার অনেক সময়ই গেছে, যাও। সতীশ পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া লিখিতে বসিল, কিন্তু আর লিখিতে পারিল না। সে যে কোন অন্যায়ই করে নাই তাহা বুঝাইবার জন্য নানাপ্রকার যুক্তি দিয়া নিজেকে বুঝাইতে লাগিল। চুপ করিয়া খাতার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে যেন লেখার কথাই ভাবিতে লাগিল কিন্তু মন তাহার সেখানে ছিল না, কোথায় যে ছিল তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার চক্ষের সম্মুখে খোলা খাতাটার লেখাগুলি যেন একাকার হইয়া গিয়াছিল, একটা বিরাট শূন্যতা যেন তাহার মনকে চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরিয়াছিল। কলম তেমনই খোলাই পড়িয়া রহিল, সে না পারিল লিখিতে না পারিল উঠিয়া যাইতে—স্তব্ধ হইয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াই রহিল।

দরজা বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অলকার চক্ষু ছাপাইয়া জল গড়াইয়া পড়িল—সে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে আসিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কোন কিছুই আর যেন তাহার নজরে পড়িতেছিল না, সমস্ত আশ্রয়ই যেন তাহার কাহার একটা আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আর কোন অবলম্বনই তাহার নাই। আবার চক্ষু বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। চক্ষু মুছিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর জগদীশ আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। অলকাকে অমনি করিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল।

আস্তে আস্তে তাহার সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া চোখে মুখে একটা মমতার ভাব ফুটাইয়া তুলিয়া সে ডাকিল, ঘুমচ্ছেন নাকি বৌদি ?

অলকা চমকাইয়া উঠিল, নিজেকে সংযত করিয়া সে সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, না ঘুমইনি, আপনি এরই মধ্যে যে ?

জগদীশ এতটুকু শব্দ না করিয়া হাসিয়া বলিল, ও ঘর ত' দেখলুম বন্ধ, তাই আপনাকে খুঁজে বার করলুম, আর দরকারটাও আপনার সঙ্গেই যে।

অলকা মৃদুস্বরে বলিল, কি বলুন ?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জগদীশ বলিল, আপনার স্বামীর সম্বন্ধেই কয়েকটা কথা আপনাকে ব'লতে চাই। কিন্তু তার আগে বলুন ত' কি হ'য়েছে আজ, আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রতে পারেন। অবিশ্বাস করবার কোন কিছুই ত' আমি কোনদিন করিনি বৌদি।

স্বামীর কথা শুনিয়া অলকার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, কতকটা ব্যস্ত হইয়াই সে বলিল, না অবিশ্বাস ক'রব কেন, সম্পূর্ণ বিশ্বাসই করি আপনাকে।

স্থির নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া জগদীশ বলিল, সতীশ আপনাকে কোন কিছু ব'লেছে কি ? আমাকে ভুল বুঝবেন না, আপনার চোখের জল শুকিয়ে গেলেও দাগ এখনও মিলায়নি।

অলকা কোন কথাই বলিতে পারিল না, আবার জল আসিয়া পড়িতে পারে এই ভয়েই সে তখন মনে মনে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া জগদীশ বলিল, বুঝেছি। আপনার স্বামীর খোজ আমি পেয়েছি, সেখানে এখন আপনি যখন খুসী যেতে পারেন। সে কথাই কাল ব'লেছিলুম সতীশকে, ও কিন্তু সেকথা আপনাকে জানাতে বারণ ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু আমিত' আর তা' পারি না। আপনাকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছে ওর না থাকতে পারে কিন্তু আপনার স্বামী সুধীরবাবুর

কথা না ভাবলেও ত' চলে না। সতীশের মত আমি কঠিন নই, ও আপনাকে ছাড়তে চায় না কি জন্যে সে আমি জানি না, হয়ত' আপনার ভালোর জন্যেই কিন্তু আপনার স্বামীই বা কি দোষ ক'রলেন ?

আজিকার অপমানের কারণ যেন অলকার কাছে জলের মত সহজ বোধগম্য হইয়া গেল। জগদীশ সত্য সত্যই সতীশকে কিছু জানাইয়াছে কি না সে প্রশ্নও তাহার মনের মধ্যে একবারের জন্যও উঠিল না। তাহার সমস্ত কথাই সে বিশ্বাস করিল। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আছেন তিনি, আমাকে নিয়ে যেতে পারেন এখনি সেখানে।

নিতান্ত অনাসক্ত ভাবে জগদীশ বলিল, সেত' কলকাতায় নয়, রেলে যেতে হয়। তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, আপনার সেখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাওয়া উচিত। আপনার স্বামী যে আমাদেরই মেসে কিছুদিন ছিলেন তা' জানতুম না। তিনি চলে যাবার পর তাঁর কাছে তাঁর কাকা এক চিঠি লেখেন। সে চিঠিটা কাল হঠাৎ ম্যানেজারের ঘরে পেয়েছি। অনেকদিন আগেকার চিঠি, আপনি হারিয়ে গেছেন ব'লে দুঃখ ক'রেছেন আবার বিয়ে করবার জন্য উপদেশ আর অনুরোধও ক'রেছেন। কি যে হয়েছে এতদিনে—। পকেট হইতে চিঠিটা বাহির করিয়া সে অলকার হাতে দিল।

আকুল আগ্রহে অলকা চিঠিটা পড়িয়া ফেলিল, তারপর হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আমাকে যেতে হবে, আজই এখুনি।

অতি সহজভাবেই জগদীশ বলিল, সতীশ কিন্তু কিছুতেই রাজী হবে না। আপনি সবকিছু জেনে ফেলেছেন বুঝতে পারলে ও আর আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখবে না।

অলকা আগ্রহ চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না; বিরক্তভাবেই বলিল, তার সঙ্গে ত' আমার কোনই সম্পর্ক নেই জগদীশবাবু। তার কথা আমার না ভাবলেও চ'লবে।

জগদীশ মৃদু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আপনাকে ছেড়ে দিতে রাজী হবে না।

অলকা বলিল, সে খবর জানবার আমার কোন দরকারই নেই। তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মাথা তুলিয়া জগদীশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনি কি আমায় একটুও সাহায্য ক'রতে পারেন না?

জগদীশ নিতান্ত শান্তভাবেই বলিল, তা' আমি খুব পারি আর সাহায্য যদি না-ই করব' ত' সতীশের কথা অগ্রাহ্য ক'রেও সমস্ত খবর আপনাকে দেব কেন? তারপর ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি যেন চিন্তা করিয়া সে বলিল, উপায় মাত্র একটিই আছে বৌদি, আপনার গাড়ীত' সন্ধ্যার আগে নেই, এ সময়টা যদি কোন পরিচিতের বাড়ীতে গিয়ে থাকতে পারেন ত ভাল হয়, নইলে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে আপনাকে পৌছে দিয়ে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব।

অলকা বলিল, এখানে আমার আর এক মুহূর্ত্তও থাকবার ইচ্ছে নেই, পরিচিতও আমার কেউ নেই, আপনার ওখানে এসময়টুকু আমাকে থাকতে দিতে পারেন না?

জগদীশ বলিল, তা খুবই পারি বৌদি, কিন্তু সেখানে হয়ত' আপনার অসুবিধা হবে, আমার বাড়ীতে মেয়েলোক ত' কেউ নেই।

অলকা এইবার হাসিয়া বলিল, এখানেই বা সে রকম কে আছে? চলুন, এখুনি আমি এ বাড়ী ছেড়ে যেতে চাই।

জগদীশ মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত হইয়া বলিল, আসুন, আপনাকে সাহায্য করতে পেরে আমি সত্যি খুব আনন্দিত আজ।

অলকা নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রয়োজন হইতে পারে জানিয়াও কোন কিছু স্পর্শও করিল না, সমস্ত কিছুই পড়িয়া রহিল। জগদীশের পিছনে পিছনে সে বাহির হইয়া গেল।

রামহরি বাড়ীতে ছিল না, সতীশও নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল, তাই কেহই কিছু জানিতে পারিল না। জগদীশ যে আসিয়াছিল তাহাও সকলের অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

বড় রাস্তায় আসিয়া জগদীশ অলকাকে লইয়া একটি ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। অলকা তখন নিজেকে হারাইয়া অল্প কয়েক ঘণ্টা পরের কথাই ভাবিতেছিল বোধ হয়,—তাহার স্বামী, একটি সুখী পরিবারের কথা স্পষ্ট হইয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া আসিতেছিল। সে অন্যমনস্ক ছিল বলিয়াই জগদীশের মুখের রেখার পরিবর্ত্তন, তাহার চক্ষের ক্রূর হাসি তাহার নজরে পড়ে নাই।

গৃহে পৌঁছিয়াই উপরের একটা ঘরে অলকাকে লইয়া গিয়া অদ্ভুত হাসি হাসিয়া জগদীশ বলিল, অনেক দিন পর আজ আমার জয় হ'ল, তাই সত্যি আমি নিজেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অলকা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তেমনি ভাবে হাসিয়াই জগদীশ বলিল, এই ঘরটাই অনেক দিন থেকে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম, ঘরটার সৌভাগ্য আছে বলতে হবে।

অলকার যেন ভাল লাগিতেছিল না, ওই লোকটা যাহা বলিতেছে তাহার মধ্যে কেমন যেন একটা অমঙ্গলের চিহ্নই তাহার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে একটু পিছাইয়া গেল।

জগদীশের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, নিজের মনের কথা সে আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। অলকার সম্মুখে আগাইয়া গিয়া সে বলিল, বুঝতে পারছ না, না? আমার কথায় একমুহূর্ত্তেই আশ্রয়দাতাকে

বিশ্বাস করে এসেছ, আমার বাকা কথাগুলোও বিশ্বাস করতে আপত্তি করলে কি চলে? বৌদির দিদিটুকু আজ থেকে খসে গেল অলকা।

জগদীশ তীব্রভাবে হাসিয়া উঠিল, সে হাসি শুনিয়া শয়তানও বোধ করি কাঁপিয়া ওঠে।

অলকা হাত দুইটা বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া ভীতভাবে পিছাইয়া গেল, কি যেন বলিবার জন্য ঠোঁট দুইটা তাহার বার বার কাঁপিকা উঠিল, কিন্তু সব কিছু অগ্রাহ্য করিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াই বোধ করি জগদীশ আবার তেমনি ভাবে হাসিয়া উঠিল।

পাকা শীকারীর মত শীকারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জগদীশ বলিয়া চলিল, এখানে চীৎকার করলেও কেউ সাড়া দেবে না, আসে পাশে শিক্ষিত ব'লতে কেউ নেই, প্রতিদিনই এ বাড়ীতে যাদের নিয়ে আসি তাদের খবর ওরা জানে, তাই তোমার ডাকে কেউ সাড়া দেবে না, কাঁচা ব'লে ওরা শুধু হাসবেই।

অলকা এইবার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চলে যাই, দয়া করুন জগদীশবাবু।

জগদীশ যেন তাহার কথা শোনেই নাই এমনি ভাবে বলিয়া চলিল, তোমার স্বামী আমাকে ভাল করেই চেনে, আমার কাছে তুমি ছিলে এ জানতে পারলেও সে আর তোমাকে নেবে না। আবার তোমাকে ফিরে আসতে হবে আমারই কাছে। ওসব ভুলে যাও অলকা। সতীশ ভীরু ভাল মানুষ তাই তোমায় স্পর্শও করেনি, কিন্তু আমি সে দলের নই।

অলকা যেন হঠাৎ চাবুকের ঘা খাইয়া সোজা হইয়া উঠিল, ক্রোধে দুই চক্ষু তাহার জ্বলিয়া উঠিল, অকস্মাৎ পাগলের মত জগদীশের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই হাতে তাহাকে সজোরে ঠেলিয়া দিল। জগদীশ নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল, তাহার মাথা কাটিয়া রক্ত

পড়িতে লাগিল, তথাপি অলকা তাহাকে ছাড়িল না। অকস্মিক আক্রমণে আঘাত পাইয়া জগদীশের মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, কোন কিছু করিবারই সামর্থ্য তাহার ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই অলকা হাঁপাইয়া পড়িল, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া পিছাইয়া আসিয়া সে উত্তেজনায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। সেই অবসরে জগদীশ বাহিরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিতে করিতে বলিল, আচ্ছা রাত্রেই দেখা যাবে। দু'দিন পরেই স্বীকার করতে হবে, তবু—।

এতক্ষণের সমস্ত উত্তেজনা ভাসিয়া গেল, নিতান্ত অসহায়ের মত চক্ষে অঞ্চল দিয়া অলকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরের দিন খুব ভোরে প্রতুল সতীশ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল। সেই রাত্রেই ফিরিয়া প্রতুল, সতীশ আর অলকার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু সতীশের নিকট অলকার গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার মুখের হাসি কে যেন হরণ করিয়া লইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি কেহই ঘুমাইতে পারে নাই, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া কোন একটা মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্ত তাহারা আলোচনা করিয়াছে, কিন্তু কোন কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। চুপ করিয়া ভাবিয়াও বিশেষ কোন কারণই তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই।

সতীশ প্রতুলের দিকে চাহিতে পারিতেছিল না, সমস্ত ঘটনার জন্ত নিজেকেই তাহার দোষী বলিয়া মনে হইতেছিল, কোনও মতে গলা পরিষ্কার করিয়া সে বলিল, আশ্চর্য্য প্রতুল, এতদিন তাকে কাছে রাখতে পারলুম আর আজ এই সময়ে সুধীরবাবুর খোঁজ পেয়েও তাকে পৌঁছে দেবার কোন সুবিধেই আমাদের হাতে নেই।

প্রতুল বলিল, আরও কিছুদিন আগে তোমাকে খবর দিতে পারতুম,

কিন্তু সেটা খুব দরকার মনে করিনি তখন, দেখ্ছি এসব কাজও ঠিক সময়ে করতে হয়।

সম্মুখের দিকে অন্যমনস্কের মত চাহিয়া থাকিয়া সতীশ বলিল, আমার দোষেই সব ঘটেছে সে আমি জানি, কিন্তু এতবড় শাস্তির কথাও যে ভাবতে পারি না। ক্ষমা চেয়ে নেবারও বোধ হয় আর আমার কোন পথই রইল না।

প্রতুল একথার কোন জবাবই দিল না, ঠিক এই কথা সতীশ বহুবার বলিয়াছে। তাহার মনে যে আঘাতটা অত্যন্ত গভীর ভাবেই কাটিয়া বসিয়াছে, সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহই ছিল না।

তাহাদের দুইজনকে বিস্মিত চমকিত করিয়া ঠিক সেই সময়ে ঝড়ের বেগে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল অলকা।

সতীশ বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, অলকা!

অলকা হাঁপাইতেছিল, কথা বলিবার মত মনের অবস্থা তখন তাহার ছিল না। প্রতুল যে কুশনটায় বসিয়াছিল, তাহারই একধারে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতের মধ্যে চক্ষু ঢাকিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রতুলের মুখের উপর দিয়া একটুকরা হাসি খেলিয়া গেল, অলকার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সে সস্নেহে বলিল, এই ত বেশ হয়েছে দিদি, শাস্তি দিতে গিয়ে নিজেই শাস্তি নিয়ে বসে আছেন, এদেশের মেয়েদের এ দুর্ব্বলতা আজও গেল না, বড়ই লজ্জার কথা নয়?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া নিজেকে সংযত করিয়া অলকা বলিল, শাস্তি দিতে গিয়েই শুধু নয় প্রতুলদা, অবিশ্বাস ক'রে। জগদীশবাবুর কথায় সতীশবাবুকে অবিশ্বাস করে তার সঙ্গে গিয়েছিলুম, আমার স্বামীর খোঁজ নাকি তিনি জানতেন, তাই শাস্তি পেয়েছি—আপনাদের বন্ধু বোধ হয় এখনও অজ্ঞান হয়েই প'ড়ে আছে। আশ্চর্য্য প্রতুলদা, ওর

মত নীচ লোক এ বাড়ীতে আসবার সুবিধে পেল কি করে ব'লতে পারেন।

অলকা ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা বলিযা গেল।

ক্রোধে সতীশের সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল।

প্রতুল অলকার মাথায ধীরে ধীরে হাত বুলাইযা দিতেছিল।

জোর করিযা তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইযা সে হাসিযা বলিল, সারা রাতই ত' বসে কাটিয়েছি দিদি, এবার একটু চা পেলে কি রকম হয় বুঝতেই পারছেন। পনের মিনিট সময দিলুম, এ কাজটা করা হয়ে গেলে আমরাও একটা আনন্দের সংবাদ দেব।

অলকাও ম্লান ভাবে হাসিল, যাইতে যাইতে বলিযা গেল, ভাগ্যে আপনি আজ এসেছিলেন প্রতুলদা, নইলে যে অপমান আমি আপনার বন্ধুকে করেছি, তারপর তাঁর মুখের দিকে চাইতেও আমি লজ্জায মরে যেতুম। তবু আশা হচ্ছে যে হযত তিনি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন।

সতীশকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিযাই অলকা চলিযা গেল।

রামহরি তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিযাছিল, কিন্তু কোন কথাই কহে নাই। গতকল্যকার অবসাদের পর আজ যেন তাহাকে পাইযা তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িযা গেল। তাহারই সাহায্যে দশ মিনিটের মধ্যেই চা আর খাবার লইয়া অলকা উপরে উঠিয়া গেল।

তাহার দিকে চাহিয়া সহাস্যে প্রতুল বলিল, মেয়েরা আমাদের আশ্চর্য্য করে দিলে দেখছি, গুছিযে চলবার কি যে অদ্ভুত একটা পথই আপনারা আবিষ্কার করেছেন ত' ভেবে আমরা শুধু অবাক হযেই যাই, অথচ আপনাদের পক্ষে এটা কতই না সহজ।

অলকা হাসিয়া বলিল, কি একটা সুখবর দেবেন ব'লছিলেন যে?

প্রতুল বলিল, আপনার স্বামীর খোঁজ আমরা পেয়ে গেছি। প্রস্তুত হয়ে থাকবেন, হয়ত আজই তিনি এসে পড়তে পারেন।

অলকার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। যে আশ্রয়কে ছাড়িতে গতকল্য সে অকূল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, সেই আশ্রয়কেই সে যেন আজ আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিল। তাহার একান্ত আপনার জন তাহাকে লইতে আসিতেছে, হয়তও বা আজিও আসিতে পারে, মনে করিয়াও সে এতটুকু আনন্দিত হইতে পারিতেছিল না। তথাপি ইহাদের সম্মুখে তাহা প্রকাশ করিবার লজ্জা হইতে সে বাঁচিতে চায়। কিন্তু বার বার চেষ্টা করিযাও সে নিজেকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে পারিল না। না, এগৃহ ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে!

রামহরি জানাইয়া গেল যে, দুইটি বাবু আসিতেছেন।

সতীশ অলকার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, অলকার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

প্রতুল আপন মনেই হাসিয়া বলিল, অক্ষয় ত'াহলে সঙ্গেই আছেন। এক একটা লোক ঠিক এমনি থাকে যাদের মতের দৃঢ়তা থাকা সত্ত্বেও সঙ্গে একজন না থকেলে পথ চল্‌তেই পারে না। অক্ষয় মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন ভাল। অলকার পা উঠিতেছিল না, তথাপি একবার সতীশের দিকে চাহিযা জোর করিয়া সে কম্পিত বক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রতুল বলিল, থেকেই যান না দিদি, এ তাঁরাই, আমি জানি।

অলকা তাহার কথা যেন শুনিতেই পায় নাই এমনি ভাবে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত ঘরটাই যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘরের দুইটি লোকই যেন কি এক চিন্তায় গভীরভাবে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহাদের নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাইতেছিল। দেয়ালে ঘড়ি নাই যে টিক টিক্

করিবে, আর কোন শব্দই এইবার কোন দিকে নাই, সমস্তই মরিয়া গেছে অথবা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া আছে।

আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, প্রতুল মাথা নাড়িয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, অদ্ভুত!—

সুধীর এবং অক্ষয় ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

প্রতুলকে দেখিবাই সুধীর বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল, এ কি হেমন্ত বাবু যে? তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বুঝেছি, আপনি এর মধ্যে আছেন বলেই আমরা আজ এখানে আসতে পেরেছি।

সতীশ সুধীরের এবং প্রতুলের মুখের দিকে বার কয়েক চাহিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, হেমন্ত? সে আবার কে?

হাসিয়া প্রতুল বলিল, ও কিছু নয়, নামটা শুধু ডাকবার সুবিধের জন্যই রাখা হয় ত'। একটা কিছু হলেই হ'ল। কোথাও বা হেমন্ত, কোথাও বা প্রতুল—আসলে লোক একই। যাক্‌গে শেষ পর্য্যন্ত আপনার কাজ ত' সফল হ'লই।

সুধীর সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এ শুধু আপনার জন্যেই সফল হ'ল হেমন্তবাবু, আপনি মাঝে এসে না পড়লে কি যে হ'ত।

প্রতুল বলিল, এখানে হেমন্ত নাম অচল, প্রতুল বলেই ডাকবেন।

সুধীর সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা' হয় না, আমার কাছে ও নামটাই মূল্যবান।

প্রতুল হাসিল, কোন কথাই বলিল না। মানুষের মনের ভিতরে যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম তার রহিয়াছে তাহা সে জানে, ইহাও যে তেমনি একটিতে মৃদু ঝঙ্কারের ফল তাহা বুঝিতে তাহার বিন্দুমাত্রও দেরী হইল না।

অক্ষয় কাজের লোক, সতীশের দিকে চাহিয়া বলিল, আর দেরী

ক'রে লাভ কি? বাড়ীতে সবাই ব্যস্ত হ'য়ে আছেন, আর ঘণ্টা ছু'য়েক পরেই একটা গাড়ী আছে।

সতীশ যেন চম্‌কাইয়া উঠিল, দেরীটা যে কিসের তাহা সে বুঝিল কিন্তু তথাপি কোন কথাই না বলিয়া সে অসহায়ের মত প্রতুলের দিকে চাহিয়া রহিল।

অক্ষয়ের দিকে চাহিয়া প্রতুল হাসিয়া বলিল, ব্যস্ত কি অক্ষয়বাবু, পাবামাত্রই যে লাফিয়ে উঠছেন। কিন্তু এদিকেরও একটা অধিকার আছে ভুলে যাচ্ছেন কেন? আপনার গাড়ীর সময় ব'য়ে যাচ্ছে অস্বীকার করি না কিন্তু আমরাও আজকে ছেড়ে দেব' কি না সেটাও ত' জানা দরকার।

সুধীর ব্যস্ত হইয়া বলিল, নিশ্চয়, অক্ষয়ের কথায় কিছু মনে ক'রবেন না, ও একটু অতি মাত্রায় ব্যস্ত, নিজেকে মস্ত কাজের লোক ব'লেই ও মনে করে।

প্রতুল বলিল, দিদির দেখা হয়ত' আর কোনদিনই মিলবে না, কালকের গাড়ীতে যেতে পাবেন আপনারা। তারপর সতীশের দিকে ফিরিয়া বলিল, আজ রাতে একটা বড় রকম ভোজ দিয়ে দাও হে, আমরা এই সুযোগে কিছু আনন্দ ক'রেনি।

সতীশ উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল, ঠিক ব'লেছ প্রতুল, এটা আমাদের ক'রতেই হবে, খুব ভাল ক'রে, এমন ক'রে করতে হবে—। আর কোন কথাই না বলিতে পারিয়া সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে যেন সব কিছুই বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে, প্রতুলের মুখ, উহাদের মুখ ভাল করিয়া চোখে পড়ে না। তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, তবে কি সে অন্ধ হইল বলিয়া? ডাক্তারদের কথা মনে হইল, মনের মধ্যে আকস্মিক ঘা খাইলেই নাকি তাহার চক্ষের শেষ জ্যোতিও

নিভিয়া যাইবে। মনকে সে বার বার বুঝাইবার চেষ্টা করিল, আকস্মিক আঘাতের কিই বা তাহার হইয়াছে ? অলকা তাহার কেহই নয়, কুড়াইয়া পাইয়াছিল, আবার আজ তাহাকেই ফিরাইয়া দিতেছে। ইহাতে তাহার কি ? কিন্তু তথাপি চক্ষুর সম্মুখে তাহার অন্ধকার নামিয়া আসিতেছিল। আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া সে কোনমতে বাহির হইয়া গেল।

* * *

অনেক রাত্রি পর্য্যন্তও প্রতুল আসিয়া উপস্থিত হইল না। ভোজের সমস্ত আয়োজনই যেন মিথ্যা হইয়া গেল। অলকা এবং সতীশের কাছে ইহার কোন অর্থই ছিল না, প্রতুলের অনুপস্থিতিতে সুধীরেরও মনটা যেন খারাপ হইয়া গেল।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় একটি ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, প্রতুলবাবু এসেছেন কি ?

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সে আসে নাই।

ভদ্রলোকটি বলিলেন, তাঁর ত' আসবার কথা ছিল আজ, আমরাও ত' ঘণ্টা তিন চার তাঁর অপেক্ষায় আছি।

বিস্মিত হইয়া সতীশ বলিল, ঘণ্টা তিন চার ? তা' ভেতরে এসে বসলেন না কেন ? কি দরকার তার কাছে ?

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, আপনি সাহিত্যিক, এসব অতটা বুঝবেন না। আমাদের দরকারগুলো একটু চুপে চুপেই সেরে নিতে হয়। তিনি আর আসবেন না এখানে; যতটা বুদ্ধিমান ব'লে তাঁকে জানতুম দেখছি তার চেয়েও ঢের বেশী বুদ্ধিমান তিনি। যাক্ যাবার সময় ব'লে যাই, এঁদের সঙ্গে বেশী না থাকাই ভাল। সাহিত্য নিয়ে থাকলেও কেবলমাত্র বন্ধু ব'লেও আপনি রেহাই পাবেন না।

ভদ্রলোক বাহির হইয়া গেলেন, সতীশ নিতান্ত বুদ্ধিহীনের মতই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সে রাত্রে সতীশ মুহূর্তের জন্যও ঘুমাইতে পারিল না। অস্থিরভাবে সমস্ত ঘরময় পায়চারী করিয়া বেড়াইল। প্রতুল আর কোনদিনই আসিবে না, অলকাও আর কয়েক ঘণ্টা পরে চলিয়া যাইবে। অনেক কথাই তাহার মনে হইতেছিল। থিয়েটার হইতে ফিরিয়া সে রাত্রে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহাও আজ কেবলই তাহার মনে হইতেছিল। অলকার চক্ষের সে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি এখনও যেন তাহাকে নিশেধ করিতেছিল। যাহা তাহার কোনদিনই ছিল না কাল তাহাই তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবে ইহাতে দুঃখ করিবার বা কি থাকিতে পারে? তাহার দুর্ভাগ্য যেন তাহাকে দলিয়া পিষিয়া মারিতে চায়। তাহার বন্ধু নাই, তাহার কেহ-ই নাই। তাহার সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনের মাঝখানে ধুমকেতুর মত ওই যে নারীটি আসিয়া সমস্ত চুরমার করিয়া দিয়া আবার চলিয়া যাইতেছে তাহাকে ত' কই সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না, পারিবেও না তাহা বুঝিতে পারিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। ঘরময় পায়চারী করিতে করিতে সে ঘরের মধ্যস্থলে রাখা টেবিলটার উপর দুই হাতের ভর রাখিয়া শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখস্থ দেওয়ালের দিকে চাহিয়া রহিল। দেওয়ালটা যেন সরিয়া গিয়াছে, যতদুর দেখা যায় শুধু অন্ধকার, চারিদিক হইতে অন্ধকার ঘিরিয়া আসিয়া যেন তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। আর চাহিয়া থাকিবার সাহস তাহার ছিল না, দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া স্তব্ধ হইয়া সে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

ঠিক পাশের ঘরে অলকাও তেমনি করিয়া নিঃশব্দে পায়চারী করিতে-ছিল। নিজের নিঃশ্বাস পতনের শব্দেও মাঝে মাঝে সে চমকাইয়া উঠিতেছিল। ঐ পাশের ঘরে যে লোকটি রহিয়াছে তাহার কথা সে

কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। প্রতুলদার কথাও তাহার মনে ছিল না। সুধীর, অক্ষয়, দিলীপ কেহই মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে অন্যমনস্ক করিতে পারিতেছিল না। ধীরে ধীরে সে আগাইয়া গিয়া ওই ঘরের শব্দ শুনিবার জন্য একবার দেওয়ালের ধার ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। কোন শব্দই নাই। হয়ত' সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কি নিঃশব্দেই না সে তাহার জন্য দুঃখ মাথায় পাতিয়া লইয়াছে। বন্ধু-বান্ধবের ছি ছি শুনিয়াও ত' সে টলে নাই। প্রতুলদা চলিয়া গিয়াছে আর আসিবে না, সেও চলিয়া যাইবে, শত সহস্রবার তাহার কথা মনে পড়িলেও মুহূর্ত্তের জন্যও ফিরিয়া আসিতে পারিবে না, আবার সেই রামহরি আর তার খোকাবাবু—সমস্ত থাকিযাও এতটুক্ ওলট-পালটও কি হইবে না? ওই লোকটাকে সে যে কত স্নেহ করে তাহা সে আজ যাইবার পূর্ব্বে স্পষ্ট করিযাই দেখিতে পাইল। উহাকে সেবা দিয়া, মমতা দিয়া, ঘিরিয়া রাখিবার জন্য সে নিজের জীবন ঢালিয়া দিতেও পারে।

তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার ইচ্ছা না হইলেও যাইতে হইবে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তিই নাই যাহার সাহায্যে সে থাকিয়া যাইতে পারে। ওই লোকটা তাহার দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াই ফেলুক আর যাহাই হউক না কেন তাহাকে যাইতেই হইবে। সে তাহার কেহই নহে, এতদিন উহারই আশ্রয়ে থাকিলেও উহার জন্য ভাবিয়া মরা তাহার চলিবে না আজ কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এখানে থাকিলেই বোধ হয় তাহার জীবন সার্থক হইতে পারিত।

অলকা শয্যায় লুটাইয়া পড়িল, বালিশটাকে বুকের কাছে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র!

* *

পরের দিন যাইবার সময় অলকা সতীশের সম্মুখে আসিতে সাহস করিল না, দরজার নিকট হইতেই বিদায় লইয়া গেল। তাহাদের পদশব্দ মিলাইয়া গেলে সতীশ সম্মুখে হাত বাড়াইয়া আকুল আগ্রহে বলিয়া উঠিল, ওরা গেছে, না রামহরি! কিন্তু আমার চোখে আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার কি হবে?

রামহরি নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া অলকা কি যেন কান পাতিয়া শুনিল' তারপর হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, আমি যাব না, ও'যে অন্ধ হয়ে যাবে।

অক্ষয় কঠিনভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, না গেলে চ'লবেই বা কেন বৌদি, সমাজ ত' আপনাকে ছেড়ে দেবে না। যে অন্ধের কথা মনে ক'রে দুঃখ পাচ্ছেন তার দিকেই আঙুল দেখিয়ে সবাই যে চরিত্রহীন ব'লে বিদ্রুপ ক'রবে?

মুখ হইতে হাত সরাইয়া অলকা স্তব্ধ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাসটা চাপিয়া ফেলিয়া শেষবারেব মত পিছন ফিরিয়া চাহিয়া সে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

শেষ

প্রকাশক—
শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়
ভারত বুক এজেন্সী
২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মুদ্রাকর—
শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।